প্রগতি ২০১৫

ঢাকা কমার্স কলেজ
DHAKA COMMERCE COLLEGE

(স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত)

ঢাকা কমার্স কলেজ রোড, মিরপুর, ঢাকা - ১২১৬।
ফোন: ৯০০৪৯৪২, ৯০০৭৯৪৫, ৯০২৩৩৩৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯০৩৭৭২২

প্রগতি

২০১৫

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী

প্রগতি ২০১৫

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ
অধ্যক্ষ

পৃষ্ঠপোষক
প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত)
প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল
উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

উপদেষ্টা পরিষদ
প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা
প্রফেসর মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি
জনাব শামীম আহ্সান
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ইংরেজি বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ
বেগম দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, মার্কেটিং বিভাগ
জনাব মোঃ কায়সার আলী, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
মুক্তি রায়, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
মুহাম্মদ আশরাফুল করিম, গ্রন্থাগারিক

সম্পাদক
যোসেফ গোমেজ
অনার্স পার্ট-৪, ইংরেজি বিভাগ, রোল: ৪১৬

সম্পাদনা সহকারী
কাজী মো: আজিজুর রহমান, রোল: বিবিএ ৪০৫
রাসলান হায়দার জামানী, রোল: ৩৩২৩৮

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
কলেজ পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

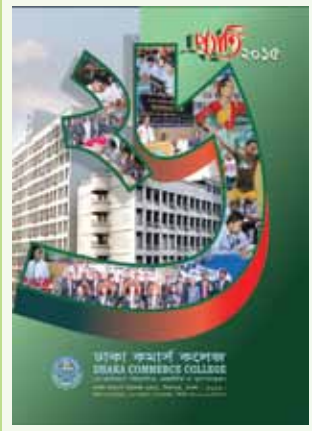

প্রচ্ছদ: হিরন্ময় চন্দ

গ্রাফিক্স ও ডিজাইন
মো. ফখরুল ইসলাম
মো. আলাউদ্দিন আল আজাদ

প্রিন্টিং
ডট প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
১৬৪ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বরনী
পুরাতন ৩/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
মোবা: ০১৭১১-৫৮১৬০১

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মত,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

কলেজ সংগীত

ঢাকা কমার্স কলেজ
আমরা একটি জাগ্রত পরিবার,
শিক্ষাঙ্গণে জ্বালবো প্রদীপ
এই আমাদের অঙ্গীকার ॥
শিক্ষাঙ্গণে ভরে গেছে পশ্চাদপদ বিশ্বাস
মুক্ত করে হব একদিন প্রদীপ্ত ইতিহাস
দেশের জন্যে
জাতির জন্যে
গড়বো নতুন অহংকার ॥
শিক্ষার মাঝে ছাত্র-ছাত্রী জীবন গড়তে পারে
জ্বলতে পারে সূর্যের মত নিগূঢ় অন্ধকারে
এই বিশ্বাসে
এই উচ্ছ্বাসে
চলবো সামনে দুর্নিবার ॥

গীতিকার : মো: হাসানুর রশীদ
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সুরকার : সাইদ হোসেন সেন্টু

আমাদের আদর্শ

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজের মৌলিক আদর্শ হলো শিক্ষা, কর্ম ও ধর্ম। অর্থাৎ প্রথমে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, অতঃপর অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের জন্য কাজ করতে হবে এবং এটাই হবে ধর্ম। কারণ, আমরা মনে করি, জ্ঞানহীন কাজ এবং কর্মবিমুখ ধর্ম প্রতারণারই নামান্তর।

শপথ

আমি সৃষ্টিকর্তার নামে অঙ্গীকার করছি যে, কলেজ ও দেশের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি ঐকান্তিক থাকবো এবং আন্তরিকভাবে মেনে চলবো। উত্তম ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলবো। উন্নত চরিত্র গঠনে সচেষ্ট হবো। কলেজের সুনাম বৃদ্ধির জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাব। আমি এ সব কিছুই করবো আমার নিজের জন্য, আমার পরিবারের জন্য, আমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, সর্বোপরি সমগ্র মানব জাতির জন্য। মহান স্রষ্টা আমার সহায় হোন। আমিন।

পরিচালনা পরিষদ

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
চেয়ারম্যান
অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব এ.এফ.এম. সরওয়ার কামাল
সদস্য
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রফেসর মোঃ আলী আজম
সদস্য
উপ-উপাচার্য, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)

প্রফেসর আবু সালেহ
সদস্য
উপাচার্য, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)

প্রফেসর মোঃ শামছুল হুদা এফ সি এ
সদস্য
ট্রেজারার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)

জনাব আহমেদ হোসেন
সদস্য
এম, ডি, নবাব আব্দুল মালেক জুট মিলস্ লিঃ

প্রফেসর ডাঃ এম.এ. রশীদ
সদস্য
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সিনিয়র কনসালটেন্ট
ইব্রাহীম কার্ডিয়াক হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
সদস্য
উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও অনারারি প্রফেসর
ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
সদস্য
সাবেক পরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

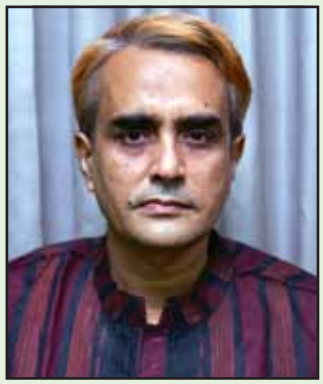

জনাব শহীদুল হক খান
অভিভাবক প্রতিনিধি

বেগম মোসাঃ হাফিজুন নাহার
অভিভাবক প্রতিনিধি

জনাব আবু ইয়াহিয়া দুলাল
অভিভাবক প্রতিনিধি

মোঃ নূরুল আলম ভূঁইয়া
শিক্ষক প্রতিনিধি
সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ড. মোঃ মিরাজ আলী
শিক্ষক প্রতিনিধি
সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ

বেগম হাফিজা শারমিন
শিক্ষক প্রতিনিধি
সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ
সদস্য সচিব/ অধ্যক্ষ

একনজরে ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রতিষ্ঠা	১ জুলাই, ১৯৮৯
উদ্দেশ্য	বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা।
আদর্শ	রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং স্ব-অর্থায়ন
পরিচালনা পরিষদ	১৬ সদস্য বিশিষ্ট
শিক্ষক সংখ্যা	১৩৫ জন
কর্মকর্তা-কর্মচারী সংখ্যা	১১২ জন

কোর্সসমূহ

উচ্চ মাধ্যমিক	ব্যবসায় শিক্ষা
স্নাতক (সম্মান)	ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি, অর্থনীতি ও বিবিএ প্রফেশনাল
স্নাতকোত্তর	ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি ও অর্থনীতি।

বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা

কোর্সসমূহ	শ্রেণি	সংখ্যা
উচ্চ মাধ্যমিক	একাদশ শিক্ষাবর্ষ ২০১৫-২০১৬	২০০৪
	দ্বাদশ শিক্ষাবর্ষ ২০১৪-২০১৫	২৫৭০
স্নাতক (সম্মান)	শিক্ষাবর্ষ ২০১৫-২০১৬	৪২০
	শিক্ষাবর্ষ ২০১৪-২০১৫	৩৪৭
	শিক্ষাবর্ষ ২০১৩-২০১৪	২০৭
	শিক্ষাবর্ষ ২০১২-২০১৩	১৭৯
	শিক্ষাবর্ষ ২০১১-২০১২	২৪২
	শিক্ষাবর্ষ ২০১০-২০১১	১৫৭
বিবিএ প্রফেশনাল		২০৭
স্নাতকোত্তর		২৬৯
সর্বমোট		৬,৬০২ জন

শিক্ষা কার্যক্রম :

(ক) পরীক্ষা : সাপ্তাহিক, মাসিক এবং তিন মাস পরপর পর্ব পরীক্ষা।

(খ) উপস্থিতি : কমপক্ষে ৯০% (বাধ্যতামূলক)।

(গ) আসন বিন্যাস : নির্ধারিত।

(ঘ) সেকশন/গ্রেড পরিবর্তন : টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে।

(ঙ) ফলাফল :

- উচ্চ মাধ্যমিক : ১৯৯১-২০০২ মেধাতালিকায় স্থান লাভ ৭৮ জন, স্টার নম্বর ৪৫৩ জন, ১ম বিভাগ ৪১৯১ জন পাশের হার ৯৫.২৯%।
  ২০০৩-২০১৫ সাল পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিকে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫৯৩২ জন, জিপিএ ৪-৫ পেয়েছে ১৪২৭৫ জন, জিপিএ ৩-৪ পেয়েছে ১৭৭৪ জন জিপিএ ২-৩ পেয়েছে ৫৮ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৭৭%।
- স্নাতক সম্মান/স্নাতকোত্তর : প্রায় বছরই পাসের হার শতভাগ থাকে।

(চ) কলেজ ইউনিফরম : নির্ধারিত।

শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম :

শিক্ষা সফর, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ক্লাব কার্যক্রম, মাসিক পত্রিকা ও বার্ষিকী প্রকাশ, মিলাদ, বার্ষিক ভোজ ইত্যাদি।

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ

১৯৯৬-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে সনদ ও ক্রেস্ট নিচ্ছেন অনারারি প্রফেসর, প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে বিবেচিত

ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা-কে

এই সনদপত্র প্রদান করা হল।

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ

মাননীয় সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক-এর নিকট থেকে ২০০২-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে দ্বিতীয়বার ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট নিচ্ছেন অনারারি প্রফেসর, প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেচিত হওয়ায়

ঢাকা কমার্স কলেজ

চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা-কে

এ সনদপত্র প্রদান করা হল।

(মোহাম্মদ শহীদুল আলম)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক : প্রফেসর কাজী ফারুকী

ঢাকা কমার্স কলেজের অনারারি প্রফেসর, প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী ১৯৯৩-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট থেকে শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষকের স্বর্ণপদক ও সনদ নিচ্ছেন।

ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ও সাবেক অধ্যক্ষবৃন্দ

প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ
০৫.০৩.২০১২ থেকে অদ্যাবধি

প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম
(ভারপ্রাপ্ত)
১৯.০৯.২০১০-০৪.০৩.২০১২

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
০১.০৮.১৯৯০ - ১২.০৪.১৯৯৮
২৭.১২.১৯৯৮ - ১৮.০৯.২০১০

প্রফেসর মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ
০১.০৮.১৯৮৯ - ৩১.০৭.১৯৯০
১২.০৪.১৯৯৮ - ২৬.১২.১৯৯৮

ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ও সাবেক উপাধ্যক্ষবৃন্দ

প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম
(ভারপ্রাপ্ত)
১.২.২০১৫ থেকে অদ্যাবধি

প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল
০১.০১.২০০৭ - ২৪.১২.২০১৪
২৫.১২.২০১৪ থেকে অদ্যাবধি (উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক)

প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম
০১.০৮.২০০৫-১৮.০৯.২০১০
০৫.০৩.২০১২-১৯.০৭.২০১৩

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
০১.০৬.১৯৯৯ - ৩১.১২.২০০৬

প্রফেসর আবু আহমেদ আব্দুল্লাহ
১৪.০৭.১৯৯৭ - ১৩.০৭.১৯৯৯

প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান
০১.০৯.১৯৯২ - ১৩.০৭.১৯৯৭
১৪.০৭.১৯৯৯ - ৩১.০৫.২০০২

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বাণী

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশে 'ব্যবসা শিক্ষা ক্ষেত্রে' এক অনুকরণীয় আদর্শ। রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত এ প্রতিষ্ঠানটির ধারাবাহিক সাফল্য ঈর্ষণীয়। ঢাকা বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করে প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয় পর্যায়ে খ্যাতির শীর্ষস্থানে নিয়ে গেছে যা আমাকে অনুপ্রাণিত ও মুগ্ধ করেছে। একাডেমিক পড়াশুনার পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তাদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনার বহি: প্রকাশ ঘটিয়ে চলেছে। আর এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছরের ন্যায় এ বারেও 'বার্ষিক প্রগতি-২০১৫' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

ঢাকা কমার্স কলেজের ঊষালগ্ন থেকেই এ প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার সম্পৃক্ততা থাকার সুযোগ হওয়ায় নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। ভবিষ্যতেও এ কলেজের সকল কার্যক্রমের প্রতি আমার অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

'বার্ষিক প্রগতি-২০১৫' এর প্রকাশনাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। 'প্রগতি'র সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীসহ সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

আমি এ প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

(আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বাণী

নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিবছরের মতো এবারও বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। এ উপলক্ষে কলেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ বিগত দু'যুগেরও বেশি সময় ধরে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। লেখাপড়ার মান, সুন্দর পরিবেশ সর্বোপরি পাবলিক পরীক্ষায় সাফল্যজনক ফলাফল-সবদিক থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সবার প্রশংসা অর্জন করেছে। আমি আশা করি এ সুনাম অক্ষুণ্ন রেখে কলেজটি সামনে এগিয়ে যাবে।

আমি ঢাকা কমার্স কলেজের এবারের বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রগতির'র সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। আমি আশা করি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি এ ধরণের সহশিক্ষা কার্যক্রম বিশ্বমানের মেধাসম্পন্ন নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে।

(নুরুল ইসলাম নাহিদ এম. পি)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বাণী

সংসদ সদস্য
১৮৭ ঢাকা-১৪
ও-সদস্য, সংসদীয় কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়াঙ্গনে একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ। দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বাণিজ্য শিক্ষা প্রসারের মহান লক্ষ্য নিয়ে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা কমার্স কলেজ। শুধু দেশ গঠন নয়, সুশীল ও মেধাবী সমাজ গঠনেও এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশ ও জাতিকে উপহার দিয়েছে অসংখ্য মেধাবী সন্তান, যারা জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে।

মেধা ও মননের বিকাশের মাধ্যমে সৎ ও আদর্শবান নাগরিক গঠনে অত্যন্ত সুনামের সাথে সুদীর্ঘ ২৫ বছর ধরে গৌরবময় ভূমিকা পালন করছে ঢাকা কমার্স কলেজ। যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিতেও এই কলেজটি একটি মডেলস্বরূপ।

শুধু শিক্ষা নয়, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায়ও ঢাকা কমার্স কলেজ অর্জন করেছে গৌরবময় কৃতিত্ব। কলেজের নিয়মিত বার্ষিকী 'প্রগতি'-র ধারাবাহিক প্রকাশনা তারই প্রমাণ বহন করে। কলেজের এই প্রকাশনা শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনশীলতার পরিচয় বহন করে। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভ কামনা।

(মোঃ আসলামুল হক)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বাণী

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

মানবজীবনকে সার্থক করার জন্য শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষা রথের সারথিই পারে জাতিকে ঠিক পথে চালিত করে একটি আলোকিত প্রান্তরে পৌঁছে দিতে। আর একটি জাতিকে যদি আলোকিত দিগন্তে পৌঁছে দেয়া যায়, তবে ধরে নিতে হবে সেই জাতির উত্তর প্রজন্মের সুপ্ত প্রতিভা অঙ্কুরিত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ভূমিকাকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজের ভূমিকা অনবদ্য।

শিল্প-সাহিত্য একটি মানুষের মনের বন্ধ জানালা খুলে দেয়। সেই খোলা জানালা দিয়ে মানুষ সীমার মাঝে অসীমের সন্ধান পায়। আর অসীমের মাঝেই একজন মানুষ নিজেকে বিকশিত করতে পারে। তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও মেধাকে স্বত:স্ফূর্তভাবে বিকশিত করার জন্য ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিকী 'প্রগতি'-র বহি:প্রকাশ। এটি একটি বার্ষিকী মাত্র নয়, এটি ঢাকা কমার্স কলেজের এগিয়ে যাওয়ার পথে সময়ের বুকে রেখে যাওয়া পদচিহ্ন।

আমি 'প্রগিত'-র সাথে সম্পৃক্ত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এর সাফল্য কামনা করছি।

সোহরাব ০৮.০৩.২০১৬.

(মোঃ সোহরাব হোসাইন)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বাণী

উপাচার্য
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর

ঢাকা কমার্স কলেজ ব্যবসা শিক্ষায় দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ও ধূমপানমুক্ত এ কলেজ প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সাফল্যের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও এ কলেজের নিয়মিত বার্ষিকী 'প্রগতি' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। আশা করি শিক্ষার্থীদের মেধা ও মনন বিকাশে এ উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রাখবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আমি ঢাকা কমার্স কলেজের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বাণী

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
ঢাকা, বাংলাদেশ।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ বাণিজ্য বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অনন্য ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে এ কলেজটি অর্জন করেছে অসামান্য সুনাম ও খ্যাতি।

সুশৃঙ্খল শ্রেণি-ব্যবস্থাপনা, কঠোর নিয়মকানুন, নিবিড় পরিচর্চা ও সুষ্ঠু লেখাপড়ার পরিবেশের পাশাপাশি এখানে রয়েছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শৈল্পিক ভাবনা ও মুক্তচিন্তা বিকাশের ব্যবস্থা। সৃজনশীল লেখা প্রকাশের একটি প্লাটফর্ম হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিবছর 'প্রগতি' নামক একটি বার্ষিকী প্রকাশ করে থাকে। কারণ একটি মননশীল জাতি গঠনে শিল্প ও সাহিত্যচর্চার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও 'প্রগতি' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি ঢাকা কমার্স কলেজের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(প্রফেসর ফাহিমা খাতুন)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বাণী

প্রফেসর মোঃ আবু বক্কর ছিদ্দিক
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
ঢাকা, বাংলাদেশ

শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা যখন দেশপ্রেম ও তারুণ্যদিপ্ত মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যায় তখন তারা সত্যিকার অর্থেই দেশের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং তারা মানবিকভাবে আরো বিকশিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মননশীলতা গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ। ঢাকা কমার্স কলেজ দেশের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ব্যবসায় শিক্ষার সাফল্য অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভাগুলোকে সু-লেখনির মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রয়াসে প্রতি বছর তাদের বার্ষিক প্রকাশনা 'প্রগতি' প্রকাশ করে যাচ্ছে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম নয়।

কলেজের সংস্কৃতি ও মননশীলতার এই চলমান ধারাবাহিকতায় অটুট থাকুক 'প্রগতি'র অগ্রগতি। যাদের মেধা মনন ও শ্রমে প্রগতি প্রকাশিত হচ্ছে তাদের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভ কামনা রইলো।

প্রফেসর মোঃ আবু বক্কর ছিদ্দিক

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বাণী

চেয়ারম্যান
ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদ

একটি জাতি তথা দেশের সাফল্য-সমৃদ্ধির প্রাপ্তি ও তার স্থায়িত্ব নির্ভর করে ঐ দেশের শিক্ষার উপর। কর্মমুখী আধুনিক শিক্ষা জাতিকে নিতে পারে সফলতার স্বর্ণশিখরে। শিক্ষার্থীদের বাস্তবধর্মী যুগোপযোগী ব্যবসায় শিক্ষা প্রদানে ঢাকা কমার্স কলেজ বিগত বছরগুলোতে সৃষ্টি করেছে অনন্য দৃষ্টান্ত। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শিক্ষাদান ছাড়াও সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাতেও কলেজটি প্রদর্শন করে আসছে ঈর্ষণীয় সাফল্য। সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত ঢাকা কমার্স কলেজ মানসম্মত শিক্ষা প্রসারেও পরিণত হয়েছে এক আদর্শ বিদ্যাপীঠ হিসেবে।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি ও সুস্থ বিকাশে সহশিক্ষা কার্যক্রমের ভূমিকা অসামান্য। ঢাকা কমার্স কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিকী ‘প্রগতি’ শিক্ষার্থীদের জন্য এমন একটি আকর্ষণীয় বিষয় যাতে কিশোর লেখক-লেখিকারা তাদের লেখনীর মাধ্যমে মুক্তচিন্তা প্রকাশ করতে পারে। তাদের চিন্তা-চেতনা ও স্বপ্নকে শৈল্পিক আঙ্গিকে নিজস্ব ভঙ্গিতে উপস্থাপনের একটি আদর্শ বিচরণ ক্ষেত্র-এই প্রগতি।

প্রগতি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

(প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বাণী

উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

আলহামদুলিল্লাহ। ১৯৮৯ সালে স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত স্লোগানে আমরা যে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম তা পঁচিশ বছর পার করেছে। পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, সুশৃঙ্খল নিয়ম পদ্ধতি এবং নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ঈর্ষণীয় ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই দেশে একটি অনন্য মডেল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ। আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, আত্মবিশ্বাস ও সুদৃঢ় মনোবলই এই সাফল্যের মূল কারণ।

এ কলেজে রয়েছে এক ঝাঁক নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী আর সুশিক্ষিত, দক্ষ ও বিচক্ষণ শিক্ষানুরাগী পরিচালনা পর্ষদ, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ কলেজ আজ সাফল্যের চরম শিখরে। এ কলেজের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় এগার তলা ও ষোল তলা বিশিষ্ট দুইটি ভবনে। এর প্রত্যেকটা কক্ষই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, প্রশস্ত এবং যথেষ্ট আলোবাতাস পূর্ণ। প্রত্যেক বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরিসহ এ কলেজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞান চর্চার জন্য রয়েছে প্রায় ৪০,০০০ বই সমৃদ্ধ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশাল কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। এ ছাড়াও রয়েছে শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের দুইটি আবাসিক ভবন, ছাত্রীদের জন্য আবাসিক হোস্টেল, প্রায় ২৫০০ দর্শক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম এবং নিজস্ব শহিদ মিনার।

পরিকল্পিত, সুশৃঙ্খল ও মনোরম পরিবেশে নিয়মিত পাঠদান, সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সর্বোচ্চ ভাল ফলাফল অর্জন করে আসছে শুরু থেকেই। এরই স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সম্মাননা পেয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ঢাকা কমার্স কলেজ নানা অনুষ্ঠানে রজত জয়ন্তী পালন করে ২০১৫ সালে।

শুধু ভাল ফলাফলই নয়, শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমেও ঢাকা কমার্স কলেজ এগিয়ে অনেক দূর। প্রতি বছরই ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল ও কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি' প্রকাশিত হয়ে আসছে। শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ প্রতি বছরের মত এ বছরও প্রকাশিত হতে যাচ্ছে 'প্রগতি'।

প্রকাশনার মত জটিল এ কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই আর কামনা করি ঢাকা কমার্স কলেজের উত্তরোত্তর সাফল্য।

(প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বাণী

অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও প্রতিভার স্ফূরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সেরা হতে হলে ভালো ফলাফলের পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা বা শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমসমূহের উপরও গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। ঢাকা কমার্স কলেজ তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই শিক্ষার্থীদের লেখার অভ্যাস সৃষ্টির লক্ষ্যে কলেজের নিয়মিত বার্ষিক প্রকাশনা 'প্রগতি' প্রকাশ করে আসছে। সময়োপযোগী চেতনাবোধের সার্থক রূপায়নই হলো স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ধূমপান ও রাজনীতি মুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার প্রায়োগিক ও আদর্শিক দিক।

সাংবাৎসরিক কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি প্রকাশের পাশাপাশি এ প্রকাশনা নবীণ লেখকদের যোগাচ্ছে অনুপ্রেরণা। 'প্রগতি' ২০১৫' সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন।

(প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বাণী

উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত)
ঢাকা কমার্স কলেজ

দেশ ও জাতীয় জীবনে অর্থনীতির প্রভাব সুদূরপ্রসারী। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পরিসরেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গভীর প্রভাব বিদ্যমান। যুগের এ চাহিদাকে স্বীকার করে নিয়েই জাতীয় কল্যাণের নিমিত্তে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত একটি বাণিজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ঢাকা কমার্স কলেজ'।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশের অগণন খ্যাতিম্যান ও সৃজনপিয়াসী ব্যক্তিগণ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও দিক নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করে আসছেন। খ্যাতিমান ও মনীষা সম্পন্ন এসকল ব্যক্তিত্বের আলোকিত দিক নির্দেশনায় অসংখ্য মেধাবী ও পরিশ্রমী শিক্ষকবৃন্দ ঢাকা কমার্স কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকীর নেতৃত্বে ও পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক-এর দিক নির্দেশনায় অনলস শ্রম সাধনা চালিয়ে গেছেন বাণিজ্য শিক্ষার এক আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য। পরিচালনা পরিষদের সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ, আলোকিত দিক নির্দেশনা, ছাত্র-শিক্ষক এবং অভিভাবক- সবার সহযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ আজ বাণিজ্য শিক্ষায় দেশে বিদেশে এক স্মরণীয় নাম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ধারাবাহিক সাফল্যের মধ্য দিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ ইতোমধ্যেই প্রায় ২৭ বছর পার করেছে এবং জাতিকে উপহার দিয়েছে অসংখ্য মেধাবী ও আলোকিত মানুষ যারা দেশ ও জাতি গঠনে অবদান রেখে চলছে।

ব্যবসায় শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মেধায় ও মননে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে খেলাধুলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও শিল্প-সাহিত্য এবং সংস্কৃতির চর্চা করে যাচ্ছে কলেজ।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা এবং অন্যান্য সহশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীর মন ও দেহের পুন:গঠনের জন্য অত্যন্ত জরুরী। কলেজের বার্ষিক প্রকাশনা এমনি একটি সহশিক্ষা কার্যক্রম। আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে মানুষ জন্মে একটি প্রাণি হয়ে আর সে সংস্কৃতির মাধ্যমে হয় পরিপক্ক মানুষ। সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সাহিত্য। কলেজের বার্ষিক প্রকাশনা 'প্রগতি' তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য সূচির বাইরেও সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চার সুযোগ করে দিয়ে তাদের সৃজনশীলতায় উদ্বুদ্ধ করে। শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সৃজনশীল ও সৌন্দর্য পিয়াসী মনের ছবিও দেখা যায় প্রগতির এ আয়নায়।

কলেজের সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ অব্যাহত রাখার ধারাবাহিকতায় সংযোজিত হলো ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিক প্রকাশনা 'প্রগতি'র আরো এক সংখ্যা। এর প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

(প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বাণী

উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)
ঢাকা কমার্স কলেজ

শিক্ষা মানুষকে করে আলোকিত, সমৃদ্ধ। জাতিকে আলোকিত করার এই মহান দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ১৯৮৯ সালে কিছু নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ। আজ কলেজটি জ্ঞানের মশাল ছড়িয়ে দিয়েছে সারা দেশে। বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ঢাকা কমার্স কলেজ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কলেজটি দক্ষ পরিচালনা পরিষদ, মেধাবী শিক্ষকমন্ডলী, নিরলস কর্মকর্তা-কর্মচারী, সচেতন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের পরিশ্রমে স্বল্প সময়ের মধ্যে ব্যবসায় শিক্ষার জগতে লাভ করেছে অভাবনীয় সাফল্য। আমি কলেজের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি।

ঢাকা কমার্স কলেজ যুগের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী করে তোলার জন্য শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষা-সম্পূরক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ব্যতিক্রমধর্মী আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও কলেজের নিয়মিত প্রকাশনা 'প্রগতি' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে 'প্রগতি' পূর্ণতা পেয়েছে এবং যাদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের সবার প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

(প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

পূর্বকথন

‘প্রগতি’ ২০১৫ প্রকাশ পেতে যাচ্ছে।

পরিচালনা পরিষদের প্রদত্ত রূপরেখার আলোকে সম্পাদনা পরিষদ প্রগতি-র আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু বিন্যস্ত করার চেষ্টা করেছে।

‘প্রগতি’র বিষয়বস্তুর বহুমাত্রিকতার কারণে কলেজের সকল বিভাগ, শাখা ও শিক্ষার্থীর সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে। সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

যে কোন প্রকাশনা মানুষকে আনন্দ দেয়। আর যদি তা নিজের বা নিজেদের প্রকাশনা হয় তাহলে আনন্দের মাত্রা নিশ্চিতভাবে বেড়ে যায়। এই প্রকাশনার কাজটি সম্পন্ন করতে আমরা কলেজের পরিচালনা পরিষদ ও কলেজ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা পেয়েছি। সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশনার শুভ কামনা করে যাঁরা শুভেচ্ছা বাণী দিয়েছেন তাঁদের প্রতি বিনয়াবনত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

আমরা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। তারপরেও ত্রুটি থেকে যেতে পারে। আমাদের যেমন থাকবে অতৃপ্তি। ‘প্রগতি’-র ত্রুটি এবং আমাদের অতৃপ্তিকে সমান্তরালে এনে বিচার করলে ত্রুটিগুলোকে হয়তো মার্জনার চোখে দেখা সম্ভব হবে।

সবার প্রতি শ্রদ্ধা। সবার জন্য শুভ কামনা।

শামীম আহ্‌সান
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ ও
সভাপতি, ‘প্রগতি’ ২০১৫ সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদকীয়

আমরা ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিকী ‘প্রগতি’ এর ২৬ তম সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছি। আমাদের কলেজের পরিচালনা পরিষদ, ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এক বছরের যাপিত জীবনের শব্দ ও ছবির বয়ান আমাদের বার্ষিকী ‘প্রগতি’। ২০১৫ সালের কর্ম ব্যস্ত দিন পঞ্জিকার ফ্রেমবদ্ধ উপস্থাপন বার্ষিক প্রতিবেদন। আমরা শিক্ষার্থীরা আমাদের প্রিয় বার্ষিকীর জন্য গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া-কবিতা, তথ্য বিচিত্রা, ধাঁধা, কৌতুক ও রম্য রচনা লিখেছি। যারা লিখেছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। যাদের লেখা ছাপা হয়নি তাদের হতাশ হবার কিছু নেই। বার্ষিকীর আকৃতি ও মান নিয়ন্ত্রণের নীতিমালার ফাঁদে পড়েছে না ছাপা লেখাগুলো।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আলাদা আলাদা ছবি আমাদের বার্ষিকীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমরা শিক্ষার্থীরা এই ছবিগুলোর মধ্য দিয়ে কলেজের ইতিহাসের অংশ হয়ে গেলাম।

আমাদের ছবির ভান্ডার বিশাল। কিন্তু সূচিভিত্তিক অ্যালবাম তৈরি করতে গিয়ে অসংখ্য ছবির মাঝ থেকে সবচেয়ে গুরুত্ববহ ছবিগুলো বাছাই করতে হয়েছে। অ্যালবাম ২০১৫ সালের চিত্রিত প্রতিবেদনের কাজ করবে বলে আশা রাখি।

প্রতিটি শুভেচ্ছা বাণী আমাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

‘প্রগতি’ প্রকাশ করতে গিয়ে পরিচালনা পরিষদের ‘প্রগতি’ প্রকাশ সংক্রান্ত রূপরেখা প্রাথমিকভাবে আমাদের যাত্রাপথ নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেই পথ পরিক্রমায় যাদের সহযোগিতা পেয়েছি তাদের প্রতি আমরা বিনম্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

যোসেফ গোমেজ
ইংরেজি বিভাগ
রোল: ৪১৬

বাংলা বিভাগ

মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী
অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

আবু নাঈম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ হাসানুর রশীদ
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ সাহজাহান আলী
সহকারী অধ্যাপক

এস. এম. মেহেদী হাসান এম.ফিল
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ মশিউর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

রেজাউল আহমেদ
সহকারী অধ্যাপক

ইসরাত মেরিন
সহকারী অধ্যাপক

মীর মোঃ জহিরুল ইসলাম এম.ফিল
সহকারী অধ্যাপক

পার্থ বাড়ৈ
প্রভাষক

মুক্তি রায়
প্রভাষক

তাহমিনা তাহের
প্রভাষক

এরিন সুলতানা
প্রভাষক

সোলায়মান আলম
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

ইংরেজি বিভাগ

শামীম আহ্সান
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম
অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

সাদিক মোঃ সেলিম
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মঈনউদ্দিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক

মাকসুদা শিরীন
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মনসুর আলম
সহকারী অধ্যাপক

উৎপল কুমার ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক

খোন্দকার মোঃ হাদিউজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক

খায়রুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ জাহিদুল কবির
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ শফিকুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

সমীরন পোদ্দার
প্রভাষক

মোঃ কায়সার আলী
প্রভাষক

মোঃ রেজাউল করিম
প্রভাষক

রেহানা আখতার রিংকু
প্রভাষক

মোঃ তারেকুর রহমান
প্রভাষক

মোঃ রাশেদুল ইসলাম
প্রভাষক

মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রভাষক

অনুপম বিশ্বাস
প্রভাষক

মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল
প্রভাষক

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বদিউল আলম
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

মোঃ নূরুল আলম ভূঁইয়া
সহযোগী অধ্যাপক

সৈয়দ আবদুর রব
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ শরিফুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

এস. এম. আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক

কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকী
সহযোগী অধ্যাপক

শামসাদ শাহ্‌জাহান
সহযোগী অধ্যাপক

ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ
সহযোগী অধ্যাপক

ড. এ. এম. সওকত ওসমান
সহযোগী অধ্যাপক

শামা আহমাদ
সহযোগী অধ্যাপক

ফারহানা আরজুমান
সহকারী অধ্যাপক

তানবীর আহমদ
সহকারী অধ্যাপক

তন্ময় সরকার
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ হযরত আলী
সহকারী অধ্যাপক

সিগমা রহমান
প্রভাষক

ফারজানা রহমান
প্রভাষক

উম্মে সালমা
প্রভাষক

মোঃ সোহেল রানা
প্রভাষক

মাছুম আলম
প্রভাষক (খণ্ডখালীন)

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মঈন উদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মোশতাক আহমেদ
সহযোগী অধ্যাপক

সাজনিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ তৌহিদুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক

মাসুদা খানম
সহযোগী অধ্যাপক

কামরুন নাহার
সহযোগী অধ্যাপক

মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক

মোহাম্মদ আবদুস সালাম
সহকারী অধ্যাপক

নূর মোহাম্মদ শিপন
সহকারী অধ্যাপক

আবু বক্কর সিদ্দিক
সহকারী অধ্যাপক

ফারহানা হাসমত
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ মাহমুদ হাসান
প্রভাষক

মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ
প্রভাষক

শিমুল চন্দ্র দেবনাথ
প্রভাষক

সালমা আক্তার
প্রভাষক

আহসান উদ্দিন খান
প্রভাষক

মোঃ সাহেদ হোসেন
প্রভাষক

মার্কেটিং বিভাগ

দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার
অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

শনজিত সাহা
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মঞ্জুরুল আলম এম.ফিল
সহযোগী অধ্যাপক

ফারহানা আক্তার সাদিয়া
সহকারী অধ্যাপক

তাসমিনা নাহিদ
প্রভাষক

সাবিহা আফসারী
প্রভাষক

রিফ্‌ফাত শবনম
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

নূর নাহার
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

মোহাম্মদ আক্‌তার হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল
সহযোগী অধ্যাপক

ফারহানা সাত্তার
সহকারী অধ্যাপক

শারমীন সুলতানা
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম
সহকারী অধ্যাপক

ফাহমিদা ইসরাত জাহান
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ হাসান আলী
প্রভাষক

মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান
প্রভাষক

ফরিদা ইয়াছমিন
প্রভাষক

মোঃ আহসান তারেক
প্রভাষক

শিরিন আক্তার
প্রভাষক

ফারহানা ফেরদৌস
প্রভাষক

শাহিদা শারমীন
প্রভাষক

মেহেরুন নাহার
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

অর্থনীতি বিভাগ

মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

সুরাইয়া পারভীন
সহযোগী অধ্যাপক

হাফিজা শারমিন
সহকারী অধ্যাপক

সুরাইয়া খাতুন
সহকারী অধ্যাপক

আহমেদ আহসান হাবিব
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ্
প্রভাষক

পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ

মোঃ আবদুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান (কম্পি.)

প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ
অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক (পরি.)

ড. মোঃ মিরাজ আলী
সহযোগী অধ্যাপক (গণিত)

মোঃ আব্দুল খালেক
সহযোগী অধ্যাপক (পরি.)

বিষ্ণুপদ বণিক
সহযোগী অধ্যাপক

এ. এইচ. এম. সাইদুল হাসান
সহযোগী অধ্যাপক (পরি.)

আলেয়া পারভীন
সহযোগী অধ্যাপক (গণিত)

মোহাম্মদ রাশিদুজ্জামান খান
সহকারী অধ্যাপক (পরি.)

অনুপম দেবনাথ
সহকারী অধ্যাপক (পরি.)

নার্পিস হায়দার
প্রভাষক (কম্পি.)

মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান
প্রভাষক (কম্পি.)

নাজমা আক্তার
প্রভাষক

সুয়াইবা হক তুরাবি
প্রভাষক (খন্ডকালীন)

ফারজানা আকতার রিপা
প্রভাষক (খন্ডকালীন)

সমাজবিদ্যা বিভাগ

মাওসুফা ফেরদৌসী এম.ফিল
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া
প্রফেসর ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

শবনম নাহিদ স্বাতী
সহযোগী অধ্যাপক

মারুফা সুলতানা
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

মোঃ শফিকুর রহমান
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ

মোঃ ইউনুছ হাওলাদার
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ আবু তালেব এম.ফিল
প্রফেসর ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

মোঃ নজরুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ এ. বি. এম. মিজানুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ মাহফুজুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ শহীদুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ
সহযোগী অধ্যাপক ও পরিচালক, বিবিএ প্রোগ্রাম

শারীরিক শিক্ষা

ফয়েজ আহমদ
শরীরচর্চা শিক্ষক

লাইব্রেরি

মুহাম্মদ আশরাফুল করিম
লাইব্রেরিয়ান

লাইব্রেরি শাখা

দিলওয়ারা বেগম
সিনিয়র ক্যাটালগার

মোহাম্মদ ছালাহ্ উদ্দিন
লাইব্রেরি সহকারী

শ্যামলী আক্তার
লাইব্রেরি সহকারী

মোঃ শহিদুল ইসলাম
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ আব্দুর রহমান
ক্লিনার

অফিস

মোঃ নূরুল আলম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

জাফরিয়া পারভীন
উপ- প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মোহাম্মদ আবদুর রহিম
এস্টেট অফিসার

মোহাম্মদ ইউনুছ
সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা

আলী আহাম্মদ
অফিস সহকারী

মোঃ লুৎফর রহমান
অভ্যর্থনাকারী

মোঃ মনসুর রহমান সিদ্দিকী
অফিস সহকারী

মোঃ শাহ্ আলম
অফিস সহকারী (চলতি দায়িত্ব)

মোঃ ফরিদ
ড্রাইভার

মোঃ বিল্লাল হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ বেল্লাল হোসেন ভূঁইয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ সিরাজ উল্লা
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ ইয়াছিন মিয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

লীনু বাড়ৈ
জ্যেষ্ঠ আয়া

মোঃ হারুন-অর-রশীদ
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ কামরুল ইসলাম
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোছাঃ সেলিনা পারভীন
জ্যেষ্ঠ আয়া

ওমর আহম্মদ ভূঁইয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ মনির হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোছাঃ সেলিনা খাতুন
জ্যেষ্ঠ আয়া

মোঃ শাহীন হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

সোহেল হোসেন
পিয়ন

নিজাম উদ্দীন
পিয়ন

মোঃ জাকির হোসেন
পিয়ন

মোঃ ইমরান হোসেন
পিয়ন

রাজু আহমেদ
পিয়ন

মোঃ মামুন শেখ
পিয়ন (মাষ্টাররোল)

মোঃ কাউসার মিয়া
পিয়ন (মাষ্টাররোল)

মোঃ আল-আমিন
পিয়ন (মাষ্টাররোল)

কুলসুম বিবি
ক্লিনার

মাহমুদা খাতুন
ক্লিনার

শ্রী লিটন চন্দ্র দাস
ক্লিনার

আবদুল আজিজ
ক্লিনার

মোঃ সবুজ হোসেন
ক্লিনার

মিঃ জেকুব
ক্লিনার

মোঃ আলমগীর হোসেন
ক্লিনার (মাস্টাররোল)

মোঃ কেফায়েতুল্লাহ
ক্লিনার (মাস্টাররোল)

হিসাব শাখা

মোঃ আশরাফ আলী
উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ আবুল কালাম
উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ ফারুক হোসেন
হিসাব সহকারী

মোঃ জাফর উল্যা চৌধুরী
হিসাব সহকারী

মোহাম্মদ শাহীনুল ইসলাম
হিসাব সহকারী

নুরুল আমিন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা

মোঃ এনায়েত হোসেন
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

মোঃ দুলাল
পরীক্ষা সহকারী

মোঃ রাশেদুল কবির
পরীক্ষা সহকারী

তপন কান্তি দাশ
পরীক্ষা সহকারী

মোঃ বোরহান উদ্দিন
পিয়ন

মোঃ রাসেল আলী
পিয়ন

প্রকৌশল শাখা

মোঃ সেলিম রেজা
সহকারী প্রকৌশলী

মোঃ লিয়াকত আলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

মোঃ মজিবুর রহমান
বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার

মোঃ আব্দুল মালেক
স্টোর কিপার

মোঃ ফখরুল আলম
সুপারভাইজার

অমল বাড়ৈ
টেকনিশিয়ান

মোঃ মুন্তাজ আলী
ইলেকট্রিশিয়ান

মোঃ আনিছুর রহমান
টেকনিশিয়ান (এসি)

মোঃ কবির হোসেন
ইলেকট্রিশিয়ান-কাম পিয়ন

মোঃ শহিদুল ইসলাম
লিফট অপারেটর

মোঃ নাসির উদ্দিন
লিফট অপারেটর

মোঃ জাকির হোসেন
লিফট অপারেটর

মোঃ নুরুল হক
লিফট অপারেটর

বাবুল হাসান খলিফা
লিফট অপারেটর

মোঃ রফিকুল ইসলাম
প্লাম্বার

মোনায়েম সিকদার
লিফট অপারেটর

মুহাম্মদ রেজাউল করিম
লিফট অপারেটর

নিরাপত্তা শাখা

মোঃ হোসেন শাহ আলম
নিরাপত্তা কর্মকর্তা

মোঃ আলমগীর হোসেন
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ আব্বাছ আলী
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ খোরশেদ আলম
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ সেলিম
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ সোলায়মান (বাবুল)
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ ছোলেমান (খোকন)
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ রুহুল আমীন
জ্যেষ্ঠ গার্ড

নান্টু বালা
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ আবু বকর শেখ
জ্যেষ্ঠ গার্ড

রিপন চাকমা
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন
জ্যেষ্ঠ গার্ড

রাসেল মাহমুদ
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মনির হোসেন
গার্ড

স্বপন মিয়া
গার্ড

মোঃ মোশারফ হোসেন
গার্ড

মোঃ দাউদ আলী
গার্ড

মোঃ আমিনুল ইসলাম
গার্ড

মোঃ মাসুদ ইমরান
গার্ড

মোঃ সবুজ ফকির
গার্ড (মাস্টাররোল)

মোঃ মিলন মিয়া
গার্ড (মাস্টাররোল)

জাহিদ হাসান
গার্ড (মাস্টাররোল)

মোঃ গফ্‌ফার
গার্ড (মাস্টাররোল)

মোঃ সাইদুর রহমান
গার্ড (মাস্টাররোল)

মোঃ রমজান আলী
মালী

মেডিকেল শাখা

ডাঃ এ.কে.এম. আনিসুল হক
মেডিকেল অফিসার

কানিজ ফাতেমা
সিনিয়র স্টাফ নার্স

বিভাগীয় কর্মচারী

মোঃ শরীফ উল্যাহ
পিয়ন (বাংলা)

রোকেয়া পারভীন
লাইব্রেরি সহকারী (ইংরেজি)

মোঃ রফিকুল ইসলাম
জেষ্ঠ্য পিয়ন (ইংরেজি)

আম্বিয়া খাতুন
লাইব্রেরি সহকারী (ব্যবস্থাপনা)

নূর মোহাম্মদ
জেষ্ঠ্য পিয়ন (ব্যবস্থাপনা)

মোঃ আবু নোমান শাকিল
লাইব্রেরি সহকারী (হিবি)

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
জেষ্ঠ্য পিয়ন (হিসাববিজ্ঞান)

নাহিদ সুলতানা
লাইব্রেরি সহকারী (ফিন্যান্স)

মোঃ ইসমাইল হোসেন
পিয়ন (ফিন্যান্স)

আফরীনা আকবর
লাইব্রেরি সহকারী (মার্কেটিং)

মোঃ গোলাম মোস্তফা
জেষ্ঠ্য পিয়ন (মার্কেটিং)

মোহাম্মদ মীর হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (অর্থনীতি)

মোঃ বিপ্লব হোসেন (সাইফুল)
পিয়ন (পরিসংখ্যান)

নুর হোসেন
পিয়ন (সাচিবিক বিদ্যা)

একনজরে বিগত বছরের পরীক্ষার ফলাফল

HSC

পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	মোট পাস	পাসের হার	মেধা তালিকায় স্থান	স্টার মার্কস
১৯৯১	৬১	৪৩	১৬	০২	৬১	১০০%	২য় ও ১৫তম = ২জন	০৪
১৯৯২	৫৬	৪০	১৩	০৩	৫৬	১০০%	১ম ও ১৬তম= ২জন	০২
১৯৯৩	২৪৭	১৬৯	৬২	০৭	২৩৮	৯৬%	২,৮,১১,১৪ ও ১৬তম= ৫জন	১৪
১৯৯৪	৫০৮	৩৬৬	১০৮	-	৪৭৪	৯৩%	১,৫,১৪ ও ১৬তম=৪ জন	২৭
১৯৯৫	৫০৮	৪৪৫	৫৭	-	৫০২	৯৯%	১,৩,১০(২),১২,১৩(২),১৪ ১৬,১৯ =১০জন	৪৭
১৯৯৬	৬৯৪	৪৭০	১৫১	-	৬২১	৯০%	১,৭,৮,১০,১১,১৪,১৫,১৭ ১৮ (২) ১৯তমএবং মেয়েদের মধ্যে ৯ম ও ১০ম= ১৩জন	২৮
১৯৯৭	৪৯০	৩৮৮	৬৮	-	৪৫৬	৯৩%	১০,১৩,১৫ ও ২০ তম =৪জন	২৫
১৯৯৮	৪৯২	২৬২	১৮১	০৩	৪৪৬	৯০.৬৫%	৫,৮,১৩,১৯ ও ২০তম এবং মেয়েদের মধ্যেঃ ৮ম ও ৯ম = ৭জন	১২
১৯৯৯	৬২৬	৪৩২	১৬৫	৯	৬০৬	৯৬.৮০%	৪,৫,১১,১৩,১৫,১৬,১৭,১০ম (মেয়েদের মধ্যে)=৮জন	২৯
২০০০	৬৬৮	৪৮০	১৪৫	০১	৬২৬	৯৩.৭২%	১,২,৩,৬,৮,১১,১২,১৩,১৪,১৫ ১৯ (যুগ্ম) ও ২০তম = ১৩ জন	৫৬
২০০১	৬৮৪	৫০৩	১৪৪	০২	৬৪৯	৯৬.২০%	১,১০,১৪,১৫,১৬,৯ম (মেয়েদের) মধ্যে=৬জন	৭১
২০০২	৭২৮	৫৯৩	১১২	-	৭০৫	৯৫.১৪%	১ম, ৩য়, ১৩ তম ও ১৯ তম = ৪জন	১৩৮

সন	মোট পরীক্ষার্থী	জিপিএ ৫	জিপিএ ৪ - ৫	জিপিএ ৩ - ৪	জিপিএ ২ - ৩	মোট পাস	পাসের হার
২০০৩*	৮৪৭	-	২২২	৫৭৯	৪১	৮৪২	৯৯.৪১%
২০০৪	৮৯৭	৫৩	৭১৩	১২৬	৩	৮৯৫	৯৯.৭৮%
২০০৫	৯০৪	৭১	৭৪৫	৮৭	১	৯০৪	১০০%
২০০৬	১৪৩৭	২২৭	১১০৪	১০৫	০	১৪৩৬	৯৯.৯৩%
২০০৭	১৫০৫	২২৪	১০৭২	২০০	০৪	১৫০০	৯৯.৬৭%
২০০৮	১৯২৪	৫১৮	১৩১৬	৮২	০৭	১৯২৩	৯৯.৯৫%
২০০৯	১৮১৫	৪০৯	১৩৪৫	৬০	০	১৮১৪	৯৯.৯৫%
২০১০	২০২৬	৪২৩	১৪৪২	১৫৫	০২	২০২২	৯৯.৮০%
২০১১	২০৪৩	৮৩১	১১৭৩	৩৮	০	২০৪২	৯৯.৯৫%
২০১২	২৪৪৬	১১৫৬	১২৪২	৪৬	০	২৪৪৩	৯৯.৮৮%
২০১৩	১৯৪০	৮৭১	৯৯৪	৬৫	০	১৯৩০	৯৯.৪৯%
২০১৪	২১৮৫	৮১৯	১২৮১	৭৯	০	২১৭৯	৯৯.৭৩%
২০১৫	২১২০	৩৩০	১৬২৬	১৫২	০	২১০৮	৯৯.৪৩%

* ২০০৩ সালে জিপিএ ৪.৬ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ৭ জন। উল্লেখ্য এবছর কোন বোর্ড থেকে ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় কেউ জিপিএ ৫ পায়নি।

একনজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

অনার্স

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধা তালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ব্যবস্থাপনা	১৯৯৭	৪৩	৩	৩৬	৩	-	৪২	৯৮%	১ম, ২য় ও ৩য়
	১৯৯৮	৪৩	২	৪১	-	-	৪৩	১০০%	২য় ও ৪র্থ
	১৯৯৯	৪২	১	৪০	১	-	৪২	১০০%	১ম
	২০০০	৪১	-	৩৫	২	-	৩৭	৯০.২৪%	-
	২০০১	৪৩	-	৩৯	২	-	৪১	৯৫.৩৪%	-
	২০০২	৩৮	-	২৯	৪	-	৩৩	৮৭%	-
	২০০৩	৪৯	১	৪৬	২	-	৪৯	১০০%	১ম
	২০০৫	৪২	১	৩৯	-	-	৪০	৯৫.২৩%	-
	২০০৬	৩৫	-	৩৫	-	-	৩৫	১০০%	-
	২০০৭	৪৪	১	৪১	২	-	৪৪	১০০%	-
	২০০৮	৪১	১১	২৯	১	-	৪১	১০০%	-
	২০০৯	৪১	৯	২৭	১	-	৩৭	৯০.২৫%	-
	২০১০	৪৫	৩	৩৯	-	১	৪৩	৯৫.৫৬%	-
	২০১১	৩৭	১২	২৪	-	১	৩৭	১০০%	-
	২০১২	৩৮	৭	২৯	-	১	৩৭	৯৮%	-
হিসাববিজ্ঞান	১৯৯৭	৩২	৩	২৯	-	-	৩২	১০০%	৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ১৫তম
	১৯৯৮	৪৭	৩	৪০	৩	-	৪৬	৯৭.৮৭%	২য়, ৪র্থ ও ১৪তম
	১৯৯৯	৪৫	১	৩৪	৪	-	৩৯	৮৬.৬৬%	২৬তম
	২০০০	৪৪	-	২৬	১১	-	৩৭	৮৪.০৯%	-
	২০০১	৪৯	-	৪৩	৩	১	৪৭	৯৬%	-
	২০০২	৪৬	-	৩৭	৮	-	৪৫	৯৮%	-
	২০০৩	৬৩	৭	৫৪	২	-	৬৩	১০০%	৪র্থ, ৫ম, ১০ম, ৩০তম, ৩২তম, ৩৩তম ও ৩৪তম
	২০০৫	৪৪	৭	৩৬	-	-	৪৩	৯৭.৭২%	-
	২০০৬	৪৬	১৭	২৯	-	-	৪৬	১০০%	-
	২০০৭	৫১	১৩	৩৮	-	-	৫১	১০০%	-
	২০০৮	৪৮	২১	২৬	-	-	৪৭	৯৮%	-
	২০০৯	৪০	১৫	২৫	-	-	৪০	১০০%	-
	২০১০	৫২	১৮	৩৪	-	-	৫২	১০০%	-
	২০১১	৪৬	২৬	১৮	-	১	৪৫	৯৮%	-
	২০১২	৪৮	৩৭	১০	-	-	৪৭	৯৮%	-
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	১৯৯৮	৩৯	৫	৩৪	-	-	৩৯	১০০%	১ম থেকে ৫ম পর্যন্ত
	১৯৯৯	৫৬	৭	৪৬	১	-	৫৪	৯৬.৪২%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম
	২০০০	৫৩	৬	৪৪	-	-	৫০	৯৪.৩৩%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৫১	৯	৩৯	২	-	৫০	৯৮.০৩%	১ম থেকে ৯ম।
	২০০২	৪৯	১৪	৩৫	-	-	৪৯	১০০%	১ম থেকে ৭ম, ৮ম (২), ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম
	২০০৩	৫৩	১৮	৩৫	-	-	৫৩	১০০%	১ম থেকে ৫ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম,(২), ১৩তম, ১৫তম ১৬তম(৩) ও ১৮তম(২)
	২০০৫	৪৪	১৯	২৫	-	-	৪৪	১০০%	
	২০০৬	৪৫	৩১	১৩	-	-	৪৪	৯৭.৭৮%	
	২০০৭	৪৬	২৯	১৭	-	-	৪৬	১০০%	
	২০০৮	৫১	৪৩	৮	-	-	৫১	১০০%	
	২০০৯	৪৯	৩৯	১০	-	-	৪৯	১০০%	
	২০১০	৫৫	৪৩	১২	-	-	৫৫	১০০%	
	২০১১	৫৫	৪৮	৭	-	-	৫৫	১০০%	
	২০১২	৫২	৩৮	১৩	-	-	৫১	৯৮%	

একনজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

অনার্স

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধা তালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
মার্কেটিং	১৯৯৮	৩৩	৩	২৯	-	-	৩২	৯৬.৯৬%	১ম ও ২য়(যুগ্ম)
	১৯৯৯	৫৩	-	৪৬	২	-	৪৮	৯০.৫৬%	-
	২০০০	৪৭	২	৩৬	২	-	৪০	৯৮%	৩য় ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৪৮	-	৪২	২	-	৪৪	৯২%	-
	২০০২	৫০	-	৪৬	-	-	৪৬	৯২%	-
	২০০৩	৫১	-	৪৯	২	-	৫১	১০০%	-
	২০০৫	৫০	১৩	৩৭	-	-	৫০	১০০%	
	২০০৬	৪৫	১৭	২৮	-	-	৪৫	১০০%	
	২০০৭	৫৪	১৪	৪০	-	-	৫৪	১০০%	
	২০০৮	৫১	১৪	৩৭	-	-	৫১	১০০%	
	২০০৯	৪৫	১৪	২৯	১	-	৪৪	৯৮%	
	২০১০	৫০	২১	২৮	-	-	৪৯	৯৮%	
	২০১১	৪৫	১৭	২৭	-	-	৪৪	৯৮%	
	২০১২	৫২	৬	৪৫	-	-	৫১	৯৮%	
পরিসংখ্যান	১৯৯৯	৩০	১৭	১২	-	-	২৯	৯৬.৬৬%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৭ম, ৮ম, ১০ম(যুগ্ম),১২,১৩,১৪,১৭ ও ১৮তম
	২০০০	৮	৪	৩	-	-	৭	৮৮%	৩য়
	২০০১	৫	২	৩	-	-	৫	১০০%	১০ম ও ১৬তম।
	২০০২	৫	-	৫	-	-	৫	১০০%	-
	২০০৩	৯	৭	২	-	-	৯	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ১০ম, ১৭ ও ১৮তম।
	২০০৫	১৪	৩	১০	-	১	১৪	১০০%	
	২০০৬	৬	-	৬	-	-	৬	১০০%	
	২০০৭	৫	১	৪	-	-	৫	১০০%	
	২০০৯	২	-	২	-	-	২	১০০%	
ইংরেজি	২০০০	৩২	-	১২	১৭	-	২৯	৯০.৬২%	-
	২০০১	৩৮	-	৬	২১	৮	৩৫	৯২.১৮%	-
	২০০২	৪২	-	৯	২৮	-	৩৭	৮৮.০৯%	-
	২০০৩	৪৮	-	২৩	২০	-	৪৩	৮৯.৫৮%	-
	২০০৫	২৬	-	২৩	২	১	২৬	১০০%	
	২০০৬	১২	-	১০	২	-	১২	১০০%	
	২০০৭	৩১	-	২৬	৫	-	৩১	১০০%	
	২০০৮	১৮	-	১৪	৪	-	১৮	১০০%	
	২০০৯	১৮	-	১৩	৪	-	১৭	৯৪.৪৫%	
	২০১০	২২	-	১৪	৫	১	২০	৯১%	
	২০১১	২১	-	১৪	৩	১	১৮	৮৬%	
	২০১২	২০	-	১৬	২	১	১৯	৯৫%	
অর্থনীতি	২০০০	১৪	৪	১০	-	-	১৪	১০০%	১ম, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৩৩	১	২২	৫	২	৩০	৯১%	২য়।
	২০০২	৯	২	৫	১	১	৯	১০০%	২য় ও ৮ম
	২০০৩	১৬	-	১১	৪	-	১৫	৯৩.৭৫%	-
	২০০৫	১৯	-	১৬	৩	-	১৯	১০০%	
	২০০৬	২১	-	২০	১	-	২১	১০০%	
	২০০৭	১৬	১	১১	২	১	১৫	৯৩%	
	২০০৮	৮	-	৬	২	-	৮	১০০%	
	২০০৯	৭	২	৫	-	-	৭	১০০%	
	২০১০	৮	২	৬	-	-	৮	১০০%	
	২০১১	১১	২	৯	-	-	১১	১০০%	
	২০১২	৮	-	৭	-	১	৮	১০০%	

একনজরে বিগত বছরের পরীক্ষার ফলাফল

মাস্টার্স

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধা তালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ব্যবস্থাপনা	১৯৯৬	৩২	৪	২৮	-	৩২	১০০%	২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৯ম।
	১৯৯৭	২৩	-	২৩	-	২৩	১০০%	-
	১৯৯৮	১৪	১	১২	১	১৪	১০০%	৫ম।
	১৯৯৯	১৯	-	১৬	৩	১৯	১০০%	-
	২০০০	১১	-	১০	১	১১	১০০%	-
	২০০১	১২	-	১২	-	১২	১০০%	-
	২০০২	২১	১	২০	-	২১	১০০%	৩য়।
	২০০৩	১২	-	১২	-	১২	১০০%	-
	২০০৪	১৭	৩	১৪	-	১৭	১০০%	৪র্থ, ৮ম ও ১৩তম।
	২০০৭	৫	৪	১	-	৫	১০০%	-
	২০০৮	২৬	২৫	১	-	২৬	১০০%	-
	২০০৯	১৯	১১	৮	-	১৯	১০০%	-
	২০১০	২৮	২২	৬	-	২৮	১০০%	৯ম, ১৫তম ও ২০তম।
	২০১১	২৫	১৯	৬	-	২৫	১০০%	
	২০১২	২২	১৮	৪	-	২২	১০০%	
হিসাববিজ্ঞান	১৯৯৬	২৩	১	২২	-	২৩	১০০%	৪র্থ।
	১৯৯৭	১৭	-	১৭	-	১৭	১০০%	-
	১৯৯৮	২	-	২	-	২	১০০%	-
	১৯৯৯	১৩	৩	৯	১	১৩	১০০%	২য়(২জন), ৮ম।
	২০০০	১৬	১	১৩	২	১৬	১০০%	-
	২০০১	১৪	১	১৩	-	১৪	১০০%	৬ষ্ঠ।
	২০০২	৭	-	৭	-	৭	১০০%	-
	২০০৩	২১	৪	১৭	-	২১	১০০%	১৪তম, ২৬তম(২জন) ও ৩৩তম
	২০০৪	২১	৭	১৪	-	২১	১০০%	১৩তম, ২৬তম, ২৮তম, ৩২তম, ৩৫তম, ৩৭তম ও ৪০তম
	২০০৬	২৫	১৫	১০	-	২৫	১০০%	৭ম, ১০ম, ১১তম, ১৭তম, ১৮তম, ২০তম, ২১তম, ২৩তম, ২৫তম, ২৭তম
	২০০৭	১৫	১৫	-	-	১৫	১০০%	-
	২০০৮	৩৪	২৭	৭	-	৩৪	১০০%	-
	২০০৯	৪০	৩৩	৭	-	৪০	১০০%	-
	২০১০	৩০	১৯	১০	-	২৯	৯৭%	-
	২০১১	৩০	২০	৯	-	২৯	৯৭%	
	২০১২	২৬	২৬	০	-	২৬	১০০%	
মার্কেটিং	১৯৯৭	৭	-	৬	১	৭	১০০%	-
	১৯৯৯	২০	৫	১৫	-	২০	১০০%	২য়, ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম।
	২০০১	২১	৫	১৬	-	২১	১০০%	৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ(২জন)।
	২০০২	২২	৩	১৯	-	২২	১০০%	১ম, ২য়(২জন)।
	২০০৩	১৬	-	১৪	১	১৫	১০০%	-
	২০০৪	১৪	৫	৯	-	১৪	১০০%	১ম, ৪র্থ, ১৩তম(৩জন)
	২০০৬	২৮	২৩	৫	-	২৮	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়(৩), ৪র্থ, ৫ম(২), ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৯ম, ১১তম, ১২তম, ১৪তম(২),
	২০০৭	২৬	২০	৬	-	২৬	১০০%	-
	২০০৮	২৬	১৪	১২	-	২৬	১০০%	-
	২০০৯	২৪	১৩	১১	-	২৪	১০০%	-
	২০১০	২৪	১৩	১১	-	২৪	১০০%	
	২০১১	৩৯	৩০	৯	-	৩৯	১০০%	
	২০১২	৩০	২৫	৫	-	৩০	১০০%	
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	১৯৯৯	১৩	৫	৮	-	১৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম।
	২০০০	৩৩	১২	২০	১	৩৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম(৩জন), ৮ম ও ৯ম(২জন)।
	২০০১	৩১	২	২৯	-	৩১	১০০%	১ম, ২য়।
	২০০২	১৩	৮	৪	১	১৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম(২জন), ১০ম।
	২০০৩	৩৪	৩	৩১	-	৩৪	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়
	২০০৪	৩৬	২৫	১১	-	৩৬	১০০%	১ম, ২য়(২জন), ৩য় থেকে ৭ম, ৮(২জন), ৯ম, ১০ম, ১২তম(২জন), ১৩তম থেকে
	২০০৬	২৫	২৪	১	-	২৫	১০০%	৩য়, ৪র্থ১ ৭ম(২), ৮ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম, ১৪তম(২জন) ১৫তম, ১৬তম(২)।
	২০০৭	২২	১৪	৬	-	২০	৯২%	-
	২০০৮	৫৩	৪২	১১	-	৫৩	১০০%	-
	২০০৯	৪৬	৩৫	৮	-	৪৩	৯৩.৪৭%	-
	২০১০	৪৩	৩৪	৯	-	৪৩	১০০%	১ম, ৩য়, ৯ম, ১৫তম, ১৬তম, ১৭তম।
	২০১১	৫০	৪৭	২	-	৪৯	৯৮%	
	২০১২	৫৫	৫৩	২	-	৫৫	১০০%	
পরিসংখ্যান	২০০০	২৪	৩	১১	-	১৪	৫৮.৩৩%	১ম, ২য় ও ৩য়।
	২০০১	৯	-	৪	১	৫	৫৬%	-
	২০০২	২	-	২	-	২	১০০%	-
	২০০৩	২	-	২	-	২	১০০%	-
	২০০৪	৯	৭	-	-	৭	৭৭.৭৮%	৪র্থ, ১৫তম, ১৯তম(২জন), ২০তম, ৩০তম ও ৩৩তম।
	২০০৬	৮	৭	১	-	৮	১০০%	২য়, ৮ম, ১০ম, ১১তম, ১৮তম(২) ও ২১তম।
	২০০৭	৪	-	৩	-	৩	৭৫%	
	২০০৮	৬	৪	২	-	৬	১০০%	
অর্থনীতি	২০০২	১১	১	৮	১	১০	৯১%	৪র্থ।
	২০০৩	৩	২	-	-	২	৬৬.৬৭%	১০ম ও ১২তম
	২০০৮	৯	১	৮	-	৯	১০০%	-
	২০০৯	৪	২	২	-	৪	১০০%	-
	২০১১	১	১	-	-	১	১০০%	
	২০১২	২	২	-	-	২	১০০%	-
ইংরেজি	২০০৮	১১	-	১১	-	১১	১০০%	-
	২০১০	৯	-	৭	-	৭	৭৮%	-
	২০১১	৫	-	২	-	২	৪০%	-
	২০১২	৮	-	৬	-	৬	৮০%	-

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫

ঢাকা কমার্স কলেজ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫

স্বঅর্থায়নে পরিচালনা, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত পরিবেশ রক্ষার প্রত্যয় নিয়ে ১৯৮৯ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৪ সালে কলেজটি ২৫ বছর পূর্ণ করেছে। সম্প্রতি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে কলেজের 'রজত জয়ন্তী' উৎসব। প্রশাসনের সময়োচিত নির্দেশনা এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিষ্ঠাপূর্ণ অংশগ্রহণে ২০১৫ সালের শিক্ষা ও শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রম শেষ হয়েছে। ২০১৫ সালের বাৎসরিক কার্যক্রম, সংশ্লিষ্ট কমিটি ও বিভাগসমূহের সামগ্রীক বিষয়াদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে এ প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছেন ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বেগম মাকসুদা শিরীন। প্রতিবেদন প্রণয়নে সহযোগিতা করেছেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ নূরুল আলম।

পরিচালনা পরিষদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক -এর সভাপতিত্বে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ ঢাকা কমার্স কলেজ প্রশাসনকে দিক নির্দেশনা প্রদান করছে। পরিচালনা পরিষদ অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, ডেভলপমেন্ট কমিটি ও ফিন্যান্স কমিটির মাধ্যমে কলেজের শিক্ষা, উন্নয়ন ও তহবিল ব্যবস্থাপনার গতিপথটি নির্ণয় করে দেয়।

জুন ১৩ ❑ কলেজ পরিচালনা পরিষদ-এর সদস্যবৃন্দের সাথে কলেজের শিক্ষকমণ্ডলীর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন পরিচালনা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

শিক্ষক পরিষদ

ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকদের সাধারণ সভা ও প্রয়োজনমাফিক বিশেষ কার্যক্রম পরিচালিত হয় শিক্ষক পরিষদের মাধ্যমে। ২০১৫ সালে শিক্ষক পরিষদের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব সাদিক মোঃ সেলিম। অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ পদাধিকার বলে শিক্ষক পরিষদের সভাপতি।

উপাধ্যক্ষ নিয়োগ

ফেব্রুয়ারি ১ ❑ উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম যোগদান করেন। উল্লেখ্য তিনি কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও জ্যেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক। ০১-০৭-১৯৮৯ তারিখে তিনি ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ০১-০১-১৯৯৫ তারিখে সহকারী অধ্যাপক, ০১-০৭-২০০৩ তারিখে সহযোগী অধ্যাপক এবং ০১-০১-২০১৩ তারিখে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন।

একাডেমিক উপদেষ্টা নিয়োগ

ডিসেম্বর ২৫ ❑ একাডেমিক উপদেষ্টা হিসেবে প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল যোগদান করেন। তিনি ০১-০১-২০০৭ তারিখ থেকে ২৪-১২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত কলেজের উপাধ্যক্ষ (একাডেমিক) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

নিয়োগ ও পদোন্নতি

কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার জন্য বিভিন্ন বিভাগে নিয়মিত শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি হয়ে থাকে। কলেজে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দের সঙ্গে ২০১৫ সালে যুক্ত হয়েছেন ১৯ জন নবীন শিক্ষক। আর ২০১৫ সালে ৪ জন শিক্ষক সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

নিয়োগ

ক্রম	নাম	পদ	বিভাগ
১	বেগম তাহমিনা তাহের	প্রভাষক	বাংলা
২	বেগম এরিন সুলতানা	প্রভাষক	বাংলা
৩	জনাব অনুপম বিশ্বাস	প্রভাষক	ইংরেজি
৪	জনাব মোঃ জাকারিয়া ফয়সাল	প্রভাষক	ইংরেজি
৫	জনাব মোঃ সোহেল রানা	প্রভাষক	ব্যবস্থাপনা
৬	বেগম সালমা আক্তার	প্রভাষক	হিসাব বিজ্ঞান
৭	জনাব আহসান উদ্দিন খান	প্রভাষক	হিসাব বিজ্ঞান
৮	বেগম সাবিহা আফসারী	প্রভাষক	মার্কেটিং
৯	বেগম নাজমা আক্তার	প্রভাষক	আইসিটি
১০	বেগম ফারহানা ফেরদৌস	প্রভাষক	ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং
১১	বেগম শাহিদা শারমিন	প্রভাষক	ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং
১২	জনাব মোঃ শাহেদ হোসেন	প্রভাষক	হিসাববিজ্ঞান
১৩	জনাব সোলায়মান আলম	প্রভাষক (খণ্ডকালীন)	বাংলা
১৪	জনাব মাসুম আলম	প্রভাষক (খণ্ডকালীন)	ব্যবস্থাপনা
১৫	বেগম রিফাত শবনম	প্রভাষক (খণ্ডকালীন)	মার্কেটিং
১৬	বেগম নুর নাহার	প্রভাষক (খণ্ডকালীন)	মাকেটিং
১৭	বেগম শোয়াইবা হক তুরাবী	প্রভাষক (খণ্ডকালীন)	আইসিটি
১৮	জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	প্রভাষক (খণ্ডকালীন)	ইতিহাস
১৯	বেগম ফারজানা আক্তার রিপা	প্রভাষক (খণ্ডকালীন)	আইসিটি

পদোন্নতি

ক্রম	নাম	পূর্বেরপদ	বর্তমান পদ
১	জনাব মোঃ জাহেদুল কবির, ইংরেজি বিভাগ	প্রভাষক	সহকারী অধ্যাপক
২	বেগম ফাহমিদা ইসরাত জাহান, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ	প্রভাষক	সহকারী অধ্যাপক
৩	বেগম ফারহানা আক্তার সাদিয়া, মার্কেটিং বিভাগ	প্রভাষক	সহকারী অধ্যাপক
৪	জনাব মোঃ শফিকুর রহমান, ইংরেজি বিভাগ	প্রভাষক	সহকারী অধ্যাপক

কমিটি ২০১৫: কলেজের শিক্ষা ও শিক্ষাসম্পুরক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে গঠিত কমিটি বাৎসরিক কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করে।

কমিটি	আহ্বায়ক
ভর্তি কমিটি-উচ্চ মাধ্যমিক	জনাব মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম
ভর্তি কমিটি-অনার্স ও মাস্টার্স	জনাব সাদিক মোঃ সেলিম

কমিটি	আহ্বায়ক
পরীক্ষা কমিটি	জনাব এ.এইচ.এম. সাইদুল হাসান
ভ্রমণ কমিটি	জনাব মোহাম্মদ আক্তার হোসেন
বার্ষিক ভোজ ও আপ্যায়ন কমিটি	জনাব আবু নাঈম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন
আভ্যন্তরীণ আপ্যায়ন কমিটি	জনাব মোঃ নুরুল আলম ভূঁইয়া
শান্তি-শৃঙ্খলা ও বিএনসিসি কমিটি	জনাব মোহাম্মদ আক্তার হোসেন
ক্রীড়া কমিটি	ড. মোঃ মিরাজ আলী
প্রচার ও আলোকচিত্র কমিটি	জনাব এস এম আলী আজম
ধর্মীয় কমিটি	জনাব মোঃ আব্দুল খালেক
শিক্ষার্থী ও সমাজকল্যাণ কমিটি	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম
ছাত্রী বিষয়ক কমিটি	বেগম মাকসুদা শিরীন
রুটিন কমিটি	জনাব মোহাম্মদ আবদুস সালাম
শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম ও সংস্কৃতি বিষয়ক ক্লাবসমূহ	জনাব মোঃ সাহজাহান আলী
নির্মাণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কমিটি	জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন
ক্রয় কমিটি	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম
আভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা কমিটি	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ
প্রকাশনা কমিটি	জনাব শামীম আহ্সান

প্রশিক্ষণ

ফেব্রুয়ারি ১৬ ❑ কলেজে সদ্য যোগদানকারী প্রভাষকদের সৃজনশীল বিষয়ে পাঠদানের ধারণা প্রদানকল্পে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ-এর আয়োজন করা হয়।

- ❑ সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক হিসেবে পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগের প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির ম্যানুয়েল উপস্থাপন করেন এবং কলেজের সকল শিক্ষক ট্রেনিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

- ❑ শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত মাস্টার ট্রেইনার ও কারিকুলাম স্পেশালিস্ট ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ আক্তার হোসেন ও প্রভাষক জনাব মো. হাসান আলী।

- ❑ সৃজনশীল বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মো. ইব্রাহিম খলিল ও প্রভাষক বেগম মেহেরুন নাহার।

- ❑ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেকেণ্ডারী সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট (সেসিপ) আয়োজিত সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরিশোধন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন মার্কেটিং বিভাগের প্রফেসর মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার এবং সহযোগী অধ্যাপক বেগম দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন।

- ❑ ২ এপ্রিল ২০১৫ তারিখ থেকে ৭ এপ্রিল ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ বিতরণ ও বাস্তবায়ন মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ' গ্রহণ করেন মার্কেটিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম।

- ❑ পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মো. শফিকুল ইসলাম "Master Trainer Training on National Curriculum 2012 Dissemination" বিষয়ে ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন, তিনি ডিসেম্বর ৫-১০ এবং ডিসেম্বর ২৬-৩১ তারিখে অনুষ্ঠিত "Master Trainer Training on Creative Question Setting, Moderating and Making in Statistics at HSC level" বিষয়ে ট্রেনিং প্রোগ্রামেও অংশগ্রহণ করেন।

- ❑ ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৫ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সহায়তায় কলেজে আয়োজিত 'সাইবার নিরাপত্তা' বিষয়ক সেমিনারে কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

- ❑ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ৯২তম শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ আবদুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষা কার্যক্রম

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর মধ্য দিয়ে ২০১৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমের সূচনা ঘটে। শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন, অভিভাবক সভা ও ২০১৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া কলেজের সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব পরীক্ষাসমূহ পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়।

জুলাই ১ ❑ ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হয়।

আগস্ট ৬ ❑ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী পরিচিতি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ।

আগস্ট ৮ ❑ নবীন শিক্ষার্থীদের অভিভাবকবৃন্দের সাথে কলেজ কর্তৃপক্ষের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মার্চ ২৮ ❑ ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

আগস্ট ৯ ❑ ২০১৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। ২১২০ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পাসের হার ৯৯.৪৩%।

মার্চ ৩১ ❑ ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে সম্মান ১ম বর্ষ ও বিবিএ (প্রফেশনাল) শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়।

ডিসেম্বর ৫ ❑ ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের এইচ এস সি পরীক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য বিশেষ ক্লাশ প্রোগ্রাম ২০১৬ আরম্ভ হয়।

উল্লেখ্য যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ডের অধীনে সকল পরীক্ষা শুরুর দিনে ধর্মীয় কমিটি ২০১৫ -এর উদ্যোগে কলেজ মসজিদে শিক্ষার্থীদের সাফল্য কামনা করে কোরানখানি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

- ❑ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির সেশন শুরু থেকে পর্ব পরীক্ষার পর সেকশন পরিবর্তন এবং সম্মান ও মাস্টার্স শ্রেণির বর্ষ পরিবর্তনের সাথে সমন্বয় রেখে কলেজের রুটিন কমিটি বৎসরব্যাপী ১৩টি কেন্দ্রীয় রুটিন প্রস্তুতের মাধ্যমে অন্যান্য বছরের মতো ২০১৫ সালেও শ্রেণি কার্যক্রম গতিময় রেখেছে।

- ❑ পরীক্ষা কমিটি ২০১৫ সালে অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারে উল্লিখিত সকল পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করে।

- ❑ শতভাগ উপস্থিতি: প্রতিকূলতাকে জয় করে প্রতিদিন শ্রেণি কার্যক্রমে উপস্থিত থাকা এক অসাধারণ অর্জন। ২০১৫ সালে কলেজের শৃঙ্খলার প্রতি কঠোর আনুগত্যের এ বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ১৩৮ জন শিক্ষার্থী। তাদের ১০৯ জন উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ও ২৯ জন বিভিন্ন বিভাগের সম্মান শ্রেণির শিক্ষার্থী।

শিক্ষাসম্পূরক কার্যক্রম

শিক্ষা সপ্তাহ: অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সমন্বয়ে উদ্‌যাপিত হয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৫। সংস্কৃতির ১৭টি শাখায় ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়ার ৮টি শাখায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

জুন ১১-১৭ ❑ শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৫ উদ্‌যাপিত হয়। শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধন করেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ।

পুরস্কার বিতরণ ২০১৫: ডিসেম্বর ২২ ❑ শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৫-এ অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ। সভাপতিত্ব করেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

পুরস্কার বিতরণ ২০১৪: মার্চ ২১ ❑ শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৪ -এ অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি ড. মুনাজ আহমেদ নূর। সভাপতিত্ব করেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

বার্ষিক ক্রীড়া: এপ্রিল ১১ ❑ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের নিজস্ব খেলার মাঠ না থাকা সত্ত্বেও বিকল্প ব্যবস্থাপনায় মিরপুরস্থ পল্লবী সিটি ক্লাব মাঠে কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় সর্বমোট ২৬টি ইভেন্টে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ক্রীড়া দিবসের সূচনা করা হয়। বিএনসিসি ক্যাডেটদের মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ, নৃত্য ও সংগীত ক্লাবের সমন্বিত পরিবেশনায় ডিসপ্লের পরে শুরু হয়ে দিনব্যাপী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন ঢাকা-১৬ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মো. ইলিয়াছ উদ্দিন মোল্লাহ। সভাপতিত্ব করেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

শিক্ষাসফর: সেপ্টেম্বর ৭ ❑ কলেজের ঐতিহ্য অনুযায়ী নৌভ্রমণ (শিক্ষাসফর) ২০১৫ আয়োজন করা হয়। ৯৩৫ জন শিক্ষার্থী দিনব্যাপী ঢাকা থেকে চাঁদপুর নৌভ্রমণে অংশগ্রহণ করে। কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে সফলভাবে নদী ভ্রমণে যাপিত হয় দিনটি।

ক্লাব কার্যক্রম: কলেজের শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমকে গতিশীল রাখার জন্য কলেজে নিম্নবর্ণিত ক্লাবসমূহ কার্যকর আছে। প্রতিটি ক্লাব-এর কার্যক্রম কলেজ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

ক্রম	ক্লাবের নাম	মডারেটর ও যুগ্ম মডারেটর
১	নাট্য ক্লাব	জনাব মীর মোঃ জহিরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
		জনাব অনুপম বিশ্বাস, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
২	নৃত্য ক্লাব	জনাব মীর মোঃ জহিরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
		বেগম মুক্তি রায়, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
৩	সংগীত ক্লাব	বেগম ফারহানা আরজুমান, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
		জনাব মোঃ তারেকুর রহমান, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
৪	আবৃত্তি ক্লাব	জনাব রেজাউল আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
		বেগম এরিন সুলতানা, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
৫	বিতর্ক ক্লাব	জনাব আবু নাঈম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
		জনাব উৎপল কুমার ঘোষ, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
৬	রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাব	জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ
		জনাব মুহাম্মদ আশরাফুল করিম, লাইব্রেরিয়ান

৭	সাধারণ জ্ঞান ক্লাব	জনাব পার্থ বাড়ৈ, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
		জনাব আহসান উদ্দিন খান, প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
৮	আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব	বেগম শামা আহমাদ, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
		জনাব সোলায়মান আলম, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
৯	রোটার‍্যাক্ট ক্লাব	জনাব এস. এম.আলী আজম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
		বেগম শিরিন আক্তার, প্রভাষক, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ
১০	ল্যাংগুয়েজ ক্লাব	জনাব খায়রুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
		জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
১১	নেচার স্টাডি ক্লাব	বেগম মাওসুফা ফেরদৌসী, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিদ্যা বিভাগ
		বেগম ফাহমিদা ইসরাত জাহান, সহকারী অধ্যাপক, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ
১২	বিজনেস ক্লাব	জনাব তন্ময় সরকার, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
		জনাব মোঃ আহসান তারেক, প্রভাষক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

'সুর ও সংগীতের মূর্ছনায় প্রাণবন্ত জীবন' স্লোগান নিয়ে সংগীত ক্লাব নিয়মিত সংগীত আসর আয়োজন করে। কলেজের সকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত ক্লাবের প্রাণবন্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ২০১৫ সালে এ ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩০। সংগীত ক্লাবের পাশাপাশি নৃত্য ও নাট্য ক্লাবও কলেজের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। ২০১৫ সালে এ দুই ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ছিল ৭৯ ও ১০১। লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে বিনোদনের মধ্য দিয়ে চিত্রাঙ্কন ও আলোকচিত্র শেখানোর প্রত্যয় নিয়ে ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত আর্ট-এণ্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি প্রতি মাসে নিয়মিত ক্লাস কার্যক্রম পরিচালনা করে। নিয়মিত ফটোওয়ার্ক এবং আলোকচিত্র ও চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনীর মাধ্যমে এ সোসাইটি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশে সহায়তা করছে। ৬৮ জন সদস্য নিয়ে গঠিত রিডার্স এন্ড রাইটার্স ক্লাব শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ২০১৫ সালে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আয়োজিত দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের আওতায় এ ক্লাবের সদস্যরা অংশগ্রহণ করে স্বাগত পুরস্কার ও শুভেচ্ছা পুরস্কার অর্জন করে। "সেবার মাধ্যমে বন্ধুত্ব"- এ আন্তর্জাতিক শ্লোগানকে ধারণ করে "জ্ঞান অর্জন করো, বন্ধুত্ব গড়ো ও স্বাবলম্বী হও"- এ থিম নিয়ে ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত রোটার‍্যাক্ট ক্লাব- এর ২০১৫ সালের মূল কার্যক্রম বিজয় র‍্যালি, মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা, স্বাক্ষর প্রতিযোগিতা, আলোচনা অনুষ্ঠান, ফ্রি-ব্লাড গ্রুপিং প্রোগ্রাম, ফ্রি ডায়াবেটিস টেস্ট প্রোগ্রাম, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ও যুব নেতৃত্ব প্রোগ্রাম। 'জ্ঞানই শক্তি, যুক্তিতেই মুক্তি' শ্লোগান নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ডিবেটিং সোসাইটি মেধা ও যুক্তির চর্চা উৎসাহিত করে। সিলেবাসের নির্ধারিত সূচির বাইরে কলেজের শিক্ষার্থীদের সময়োপযোগি নানা বিষয়ে যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ করে দেয়া এ সোসাইটির উদ্দেশ্য। ২০১৫ সালে ডিবেটিং সোসাইটির সদস্যরা বিভিন্ন আন্তঃকলেজ, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতাসহ আঞ্চলিক ও স্মারক বিতর্ক প্রতিযোগিতাসমূহে সাফল্য অর্জন করে। ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত নেচার স্টাডি ক্লাবের শ্লোগান-'প্রকৃতি ও পরিবেশ করলে সংরক্ষণ/ভবিষ্যৎ কর্ম উদ্দীপনা হবে বর্ধন।' প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত বিভিন্ন স্থান, মেলা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রকৃতি ও পরিবেশের দূষণ ও এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন শিক্ষার্থী গড়ে তোলা এ ক্লাবের মূল কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত।

বৃত্তি

মেধাবী, শৃঙ্খলানিষ্ঠ অথচ আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের ২০১৫ সালে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। অর্ধ বা পূর্ণ বেতন মওকুফ করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থীকে কলেজে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়।

ডরমেটরি: শিক্ষার্থী কল্যাণের অংশ হিসেবে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে অধ্যয়নরত মেধাবী অথচ আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেবার জন্য কলেজ ভবন-২ এর নীচতলায় স্থাপিত ডরমেটরিতে এবছর ১৬ জন শিক্ষার্থী বসবাসের জন্য সুযোগ পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, এসকল শিক্ষার্থীর সার্বিক তত্ত্বাবধান কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক

দায়িত্বপ্রাপ্ত তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটির অধীনে হয়ে থাকে। ডরমেটরিতে বসবাসকারী সকল শিক্ষার্থী বিনাবেতনে অধ্যয়নের সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

ফিন্যানসিয়াল ওয়েভার: ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাশ করে কলেজের বিবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা ১০% ফিন্যানসিয়াল ওয়েভার প্রাপ্ত হয়। পাশাপাশি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফলে প্রাপ্ত SGPA এর উচ্চ থেকে নিম্ন ক্রমানুসারে প্রথম তিন জন শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ সেশন ফি-এর এবং পরবর্তী দু জনকে ৫০% সেশন ফি এর উপর ফিন্যানসিয়াল ওয়েভার প্রদান করা হয়।

ছাত্রী হোস্টেল

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে আসা ছাত্রীদের ঢাকা কমার্স কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ৭২ আসনবিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেল ইতিমধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে পরিণত হয়েছে। দূরবর্তী স্থান থেকে আসা ছাত্রীদের নিরাপদে পাঠ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির এরূপ উদ্যোগ ইতিমধ্যেই সুধীসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

ছাত্রী নির্দেশনা সভা

সেপ্টেম্বর ৫ ❑ ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের নবীন ছাত্রীদের প্রাতিষ্ঠানিক আচরণবিধি অবহিতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রযুক্তি

২০১৫ সালে কলেজের সকল বিভাগ ও শাখা ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় এসেছে। পাশাপাশি অটোমেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের সাথে কলেজের একটি সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা তৈরি হয়েছে। কলেজের ওয়েবসাইট কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট একটি নিয়মিত প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।

ভোজ

কলেজের জন্য বার্ষিক ভোজ এক মিলনমেলার অবতারণা করে। কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাঁদের পরিবার, শিক্ষার্থী এবং কলেজের শুভাকাঙ্ক্ষীদের বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে সমবেত হবার সুযোগ করে দেয় 'বার্ষিক ভোজ' অনুষ্ঠান।

ডিসেম্বর ২৩ ❑ ২০১৫ সালের নির্ধারিত বার্ষিক ভোজ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. মো. আসলাম ভূঁইয়া, প্রোভিসি (প্রশাসন), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

ফলাহার ও ইফতার

কলেজের রেওয়াজ অনুযায়ী ২০১৫ সালে বার্ষিক ফলাহার ও ইফতার অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। জুন ১৩ ❑ ঢাকা কমার্স কলেজ কল্যাণ সংঘ বার্ষিক ফলাহার ২০১৫ আয়োজন করে। কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন। পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে এ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

জুলাই ১১ ❑ কলেজের অভ্যন্তরীণ আপ্যায়ন কমিটি শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে ইফতার পার্টির আয়োজন করে।

দিবস উদ্‌যাপন

জাতীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সকল দিবস ২০১৫ সালে যথাযোগ্য মর্যাদায় কলেজ ক্যাম্পাসে উদ্‌যাপিত হয়।

ফেব্রুয়ারি ২১ ❑ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কলেজ শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এছাড়া ভাষা শহীদদের মাগফেরাত কামনা করে কলেজ মসজিদে কোরানখানি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মার্চ ১৭ ❑ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৯৫তম জন্মবার্ষিকীতে কলেজ মসজিদে কোরানখানি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মার্চ ২৬ ❑ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কলেজ মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

আগস্ট ১৫ ❑ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে কলেজ মসজিদে কোরানখানি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আগস্ট ২৬ ❑ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান -এর শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন কথাসাহিত্যিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

ডিসেম্বর ১৬ ❑ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে শিক্ষার্থী-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম।

ডিসেম্বর ১৭ ❑ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কলেজ মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেজর জেনারেল (অব.) মো. আজিজুর রহমান বীর উত্তম। মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে কলেজের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে ঢাকা কমার্স কলেজ তাঁদের উভয়কে সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রদান করে। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

মানববন্ধন

মার্চ ১২ ❑ শঙ্কামুক্ত জীবন প্রাপ্তি, নিরাপদে ক্লাস করা ও পরীক্ষা দেয়া এবং শিক্ষা ধ্বংসকারী সহিংসতা বন্ধ করার দাবিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্য হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা মানববন্ধনে সমবেত হয়।

উৎসবঃ রজত জয়ন্তী

নভেম্বর ৭ ❑ ঢাকা কমার্স কলেজের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তিন পর্বে বিভক্ত অনুষ্ঠানমালায় র‍্যালি, রক্তদান, গুণীজন ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা, স্মৃতিচারণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অন্তর্ভূক্ত ছিল। র‍্যালি উদ্বোধন করেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্য ডা. এম এ রশীদ। গুণীজন ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনায় প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল এফসিএ; মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। স্মৃতিচারণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ও উপস্থিতি ছিল।

রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপনের বিভিন্ন কমিটি ২০১৪

ক্রম	কমিটি	আহ্বায়ক
১	উদ্‌যাপন কমিটি	প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী, বাংলা বিভাগ
২	সাংস্কৃতিক কমিটি	জনাব মোঃ সাহজাহান আলী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
৩	অভ্যন্তরীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ কমিটি	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৪	র‍্যালি কমিটি	প্রফেসর মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া, সমাজবিদ্যা বিভাগ
৫	গুণীজন এবং কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা কমিটি	প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, ইংরেজি বিভাগ
৬	স্মরণিকা ও অ্যালবাম কমিটি	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ক্রম	কমিটি	আহ্বায়ক
৭	শৃঙ্খলা কমিটি	জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
৮	রক্তদান কমিটি	প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ, পরি. কম্পি ও গণিত বিভাগ
৯	সাজসজ্জা, মঞ্চ তৈরি ও ফুল ক্রয় কমিটি	প্রফেসর মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার, মার্কেটিং বিভাগ
১০	প্রচার, ছবি ও ভিডিও কমিটি	জনাব সাদিক মোঃ সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
১১	ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপহার ক্রয় ও বিতরণ কমিটি	জনাব বদিউল আলম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
১২	গিফ্‌ট ক্রয় (ব্লেজার) কমিটি	জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
১৩	ক্রেস্ট ও মেডেল তৈরি কমিটি	জনাব মোঃ মঈন উদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
১৪	ব্যানার ও দাওয়াত কার্ড তৈরি এবং আমন্ত্রণ কমিটি	জনাব মোঃ ইউনুছ হাওলাদার, সহযোগী অধ্যাপক সাবি. ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ
১৫	অর্থ ও হিসাব কমিটি	প্রফেসর মোঃ আবু তালেব, সাবি. ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ
১৬	আপ্যায়ন কমিটি	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

প্রকাশনা

নিয়মিতভাবে বার্ষিকী, ক্যালেণ্ডার, ডায়েরি ও জার্নাল প্রকাশ কলেজের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

জার্নাল: ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল, ভলিউম-৬, নং-১ প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর-এ। ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রবন্ধ এই সংখ্যায় স্থান পায়।

প্রগতি ২০১৪: মার্চ ২৮ ❑ ২০১৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ২০১৪ এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

প্রদীপ্তি: নভেম্বর ৭ ❑ কলেজের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশ করা হয় রজত জয়ন্তী স্মরণিকা ও অ্যালবাম ২০১৪-'প্রদীপ্তি'।

সাফল্য

খেলাধুলার বিভিন্ন অঙ্গনে ২০১৫ সালে কলেজের শিক্ষার্থীরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে।

সেপ্টেম্বর ২-৫ ❑ বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত আন্তঃকলেজ রাগবি প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ ৩য় স্থান অর্জন করে।

ফেব্রুয়ারি ২২-২৪ ❑ শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জাতীয় র‍্যাংকিং ফেন্সিং প্রতিযোগিতায় ইপি ও সেভার বিভাগে ঢাকা কমার্স কলেজ ২য় স্থান অর্জন করে। বিজয়ী শিক্ষার্থীরা সাউথ এশিয়ান ফেন্সিং প্রতিযোগিতায় জাতীয় দলে স্থান পায়।

নভেম্বর ২-ডিসেম্বর ৩ ❑ ঢাকা শিক্ষাবোর্ড আয়োজিত আন্তঃকলেজ (উচ্চ মাধ্যমিক) খেলাধুলা ও ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন ও অ্যাথলেটিক্স এ কলেজের শিক্ষার্থীরা সাফল্য অর্জন করে।

ক্রিকেট ❑ পুরুষ বিভাগে ঢাকা কমার্স কলেজ দল মহানগর চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে। মহিলা ক্রিকেট দল সেমিফাইনাল পর্যায়ে খেলায় অংশগ্রহণ করে।

ব্যাডমিন্টন ❑ মহিলা বিভাগে ব্যাডমিন্টন এককে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থী অর্পা চাকমা চ্যাম্পিয়ন ও পুরুষ বিভাগে ব্যাডমিন্টন দ্বৈতে রিয়াজ ও শাকিল রানার আপ হবার গৌরব অর্জন করে।

অ্যাথলেটিক্স ❑ ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র কামরান ২০০ মি. ও ৪০০ মি. দৌড়ে যথাক্রমে ১ম ও ২য় স্থান; ৪০০ মি. দৌড়ে চঞ্চল ১ম স্থান ও ১০০×৪ রিলে দৌড়ে পুরুষ বিভাগে কলেজের প্রতিযোগী ৩য় স্থান অর্জন করে।

নির্মাণ ও সংস্কার

ঢাকা কমার্স কলেজ একটি ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রতিষ্ঠান। প্রতিবছর প্রয়োজন অনুযায়ী কলেজের ব্যাপক সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। ২০১৫ সালের উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ নিম্নরূপ-

❑ **সিসি ক্যামেরা স্থাপন:** কলেজের অভ্যন্তরে পূর্বে স্থাপিত সিসি ক্যামেরাসমূহের সাথে ২০১৫ সালে অতিরিক্ত চারটি এনবিআর ক্যামেরা স্থাপন করা হয়।

❑ **এয়ারকুলার স্থাপন:** অ্যাকাডেমিক ভবন ১ ও ২ -এ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত), অ্যাকাডেমিক উপদেষ্টা -এর কক্ষ, সভাকক্ষ, সকল বিভাগ, বিভাগীয় সেমিনার, শিক্ষকবৃন্দের বসার কক্ষসমূহ, শ্রেণিকক্ষ, হিসাবশাখা, প্রকৌশল শাখা, চিকিৎসা কেন্দ্র, শিক্ষক কমনরুম, অভ্যর্থনাকক্ষসহ নতুন ৫০টি এসি সংযোজন করা হয়।

❑ **নামাজ ঘর:** কলেজের অ্যাকাডেমিক ভবন-২ এর নীচে পুরুষদের ও অ্যাকাডেমিক ভবন-১ এর নবম তলায় মহিলাদের জন্য পৃথক নামাজ ঘর স্থাপন, সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়।

❑ **জিমনেশিয়াম:** কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থিত ছাত্রী হোস্টেল ভবনের ২য় তলায় জিমনেশিয়াম স্থাপন ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়।

❑ **শিক্ষক লাউঞ্জ:** অ্যাকাডেমিক ভবন-১ এর হলরুমে অবস্থিত ক্যান্টিন আধুনিকায়ন এবং সেখানে শিক্ষকদের বসার জন্য পৃথক শিক্ষক লাউঞ্জ তৈরি করা হয়।

❑ **ইন্টারকম সিস্টেম উন্নতিকরণ:** কলেজের বিভিন্ন শাখার মধ্যে আন্তঃযোগাযোগের সুবিধার্থে ইন্টারকম সিস্টেম প্রচলিত আছে। ২০১৫ সালে পূর্বোক্ত ইন্টারকম-এর সাথে ৯৬টি এক্সটেনশন যুক্ত হয়।

❑ **লিফট:** ছাত্রী হোস্টেল ও অ্যাকাডেমিক ভবন-২ এর লিফটকোরের নির্মাণ কাজ শেষ হয়।

❑ **সৌন্দর্য বর্ধণ:** কলেজ ভবন ও কলেজ মিলনায়তন রং করা ও প্রয়োজনীয় শৌচাগার নির্মাণ করা হয়। এছাড়া কলেজের ভিতরের রাস্তায় পার্কিং টাইলস সংযোজন করা হয়।

❑ **মাঠ তৈরি:** কলেজের পূর্ব পাশের মাঠের অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয় ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়।

❑ **জমি ক্রয় ও উন্নয়ন:** মিরপুরে নবাবের বাগ এলাকায় ২৪ শতাংশের প্লট ক্রয় ও এর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। এছাড়া রূপনগরে কলেজের প্লটে অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজ কল্যাণ সংঘ

কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীর কল্যাণে এই প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত। কম্পিউটার ল্যাব পরিচালনার মাধ্যমে কলেজের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমে সহায়তা করার পাশাপাশি এ সংঘ শিক্ষার্থীদের পোশাক সরবরাহ এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের টিফিন তৈরি ও সরবরাহ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে আসছে। এ বছর ক্যান্টিনের সার্বিক পরিচ্ছন্নতা উন্নত করা হয়। বার্ষিক ফলাহার আয়োজন সংঘের একটি নিয়মিত কর্মসূচি। ২০১৫ সালে কল্যাণসংঘ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ৬০জন শিক্ষার্থীর কম্পিউটার ল্যাব ব্যবহারিক বিল মওকুফ করে।

নিরাপত্তা

বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তা ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে কলেজের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এর পাশাপাশি একজন নিরাপত্তা সুপারভাইজারের তত্ত্বাবধানে ২৩ জন গার্ড পালাক্রমে কলেজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। প্রয়োজন অনুযায়ী কলেজের বিএনসিসি ক্যাডেটদেরকেও নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত করা হয়।

আর্থিক লেনদেন

শিক্ষার্থীদের সাথে কলেজের সকল আর্থিক লেনদেন সম্পূর্ণভাবে ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এ উদ্দেশ্যে কলেজ প্রাঙ্গনে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের একটি বুথ স্থাপিত আছে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

কলেজের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ রক্ষার জন্য ৯জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োজিত আছে। কলেজ এর অ্যাকাডেমিক ভবন, অভ্যন্তরীণ যাতায়াত পথসমূহ এবং উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ দুটি পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন রাখে। কলেজের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বাগানসমূহ নিয়মিত পরিচর্যা করে কলেজের মালি।

নিরীক্ষা

স্বঅর্থায়নে পরিচালিত ঢাকা কমার্স কলেজের তহবিল অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে ব্যবস্থাপনা করা হয়। এ লক্ষ্যে ২০১৫ সালে প্রতি চারমাস অন্তর অভ্যন্তরীণ হিসাব ও নিরীক্ষা কমিটি হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক অধ্যক্ষের নিকট রিপোর্ট পেশ করে।

কম্পিউটার ল্যাব

পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের পাঠদানের জন্য ঢাকা কমার্স কলেজে চারটি আন্তর্জাতিক মানের কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে। এ ল্যাবগুলোতে ১২৪টি কম্পিউটার আছে এবং প্রতি দুজন শিক্ষার্থীর জন্য একটি কম্পিউটার বরাদ্দ। প্রতিটি ল্যাবই নেটওয়ার্ক এর আওতাধীন। ইন্টারনেট সংযোগসহ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করে ল্যাবে ক্লাস নেয়া হয়। নিয়মিত ব্যবহারিক ক্লাস ছাড়াও বোর্ড পরীক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা এখানে বিশদ ধারণা লাভ করে।

চিকিৎসা সেবা

কলেজ চলাকালীন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য কলেজের চিকিৎসা কেন্দ্রের সেবা সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়।

বিভাগীয় কার্যক্রম

বাংলা বিভাগ

❑ **ডিগ্রী অর্জন:** বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মীর মোঃ জহিরুল ইসলাম বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এণ্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি) থেকে English Language Teaching বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন।

❑ **সম্মাননা:** কলেজের সার্বিক উন্নয়নে অবদান- এর স্বীকৃতি হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান জনাব মো. সাইদুর রহমান মিঞা ও সহযোগী অধ্যাপক জনাব হাসানুর রশীদ - কে সম্মাননা ও স্বর্ণপদক দেয়া হয়।

❑ **প্রকাশনা:** ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল ভলি-৬, নং ১-২০১৪-এ সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা-এর প্রবন্ধ 'বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারা ও প্রবণতা' এবং সহকারী অধ্যাপক মীর মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম-এর প্রবন্ধ শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা': পুরানের আধুনিয়কায়ন প্রকাশিত হয়।

ইংরেজি বিভাগ

❑ **দায়িত্ব গ্রহণ:** ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে সহযোগী অধ্যাপক জনাব শামীম আহ্সান বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৯ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে সহযোগী অধ্যাপক জনাব সাদিক মোঃ সেলিম একাদশ শ্রেণির (শিক্ষাবর্ষ ২০১৫-২০১৬) শিক্ষার্থীদের মেধালালন প্রকল্পে সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

❑ **ফলাফল:** ২০১৫ সালে সম্মান চতুর্থ বর্ষের ১৩তম ব্যাচের ও মাস্টার্স-এর ফলাফল প্রকাশিত হয়।

সম্মান: ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীরা সর্বোচ্চ সি.জি.পি.এ. ৩.১৮/৪.০০ পেয়ে শতভাগ সাফল্য অর্জন করে।

মাস্টার্স: মাস্টার্স শেষ পর্বে সর্বোচ্চ ২৯৬/৫০০ নম্বর পেয়ে শতভাগ শিক্ষার্থী ২য় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়।

❑ **প্রকাশনা:** নভেম্বর ২০১৫-এ ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ মঈনউদ্দীন আহমেদ-এর বই Master your Punctuation; প্রভাষক জনাব সমীরণ পোদ্দার ও প্রভাষক জনাব মোঃ জাকারিয়া ফয়সাল-এর বই An Easy Book of HSC English Grammer; এবং ডিসেম্বর ২০১৫-এ সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ মনসুর আলম এর বই Useful Synonyms and Antonyms প্রকাশিত হয়।

❑ **উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ গমন:** ৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে সহকারী অধ্যাপক জনাব খায়রুল ইসলাম যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বৃত্তিতে International Leaders in Education Program-শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র গমন করেন।

❑ **সম্মাননা:** কলেজের সার্বিক উন্নয়নে অবদান-এর স্বীকৃতি হিসেবে সহযোগী অধ্যাপক জনাব সাদিক মোঃ সেলিম কে কলেজের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সম্মাননা ও স্বর্ণপদক দেয়া হয়।

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

❑ **দায়িত্ব গ্রহণ:** ১ আগস্ট ২০১৫ তারিখে বিভাগীয় চেয়ারম্যান পদে যোগদান করেন সহযোগী অধ্যাপক জনাব বদিউল আলম।

❑ **ক্লাস সমাপনী:**

ক. মাস্টার্স শেষ পর্ব: ১৯ জানুয়ারি ২০১৫ মাস্টার্স শেষ বর্ষের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

খ. অনার্স ১ম বর্ষ: ২৮ নভেম্বর ২০১৫ অনার্স ১ম বর্ষের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়।

❑ **সম্মাননা:** কলেজের সার্বিক উন্নয়নে অবদান-এর স্বীকৃতি হিসেবে সহযোগী অধ্যাপক জনাব বদিউল আলম ও জনাব মোঃ নূরুল আলম ভূঁইয়াকে এবং পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের জন্য সহযোগী অধ্যাপক ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ ও ড. এ. এম. সওকত ওসমানকে কলেজের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সম্মাননা ও স্বর্ণপদক দেয়া হয়।

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

❑ **দায়িত্ব গ্রহণ:** ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে বিভাগীয় চেয়ারম্যান পদে যোগদান করেন সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ।

❑ **ফলাফল:** উচ্চ মাধ্যমিক : ২০১৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৮২ জন শিক্ষার্থী হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে A+ নম্বর পায়।

সম্মান: ২০১৫-এ প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ সম্মান পরীক্ষা-২০১৩ এ সর্বমোট ৪৭ জন শিক্ষার্থীর সকলেই ভাল জিপিএ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়।

মাস্টার্স: ২০১২ সালের মাস্টার্স পরীক্ষার ফলাফল ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়। ২৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থানসহ সকলেই ১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়।

❑ **প্রকাশনা:** সহযোগী অধ্যাপক জনাব কামরুন নাহার ও সহকারী অধ্যাপক জনাব ফারহানা হাসমত-এর যৌথ প্রবন্ধ The Effect of Capital Structure on Performance of Square Pharmaceuticals Limited of Banladesh ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নালে; সহকারী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সালাম এবং সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ মাহমুদ হাসান এর যৌথ প্রবন্ধ Factors Affecting the Stock Price Movement : A case study of Dhaka

Stock exchange ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব বিজনেস অ্যাণ্ড ম্যানেজমেন্ট-এ এবং সহকারী অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ এর প্রবন্ধ ইউরোপিয়ান জার্নাল অব বিজনেস এন্ড ম্যানেজমেন্ট-এ প্রকাশিত হয়।

❑ **বিদায়:** বিভাগীয় শিক্ষক জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম শাহীন-এর যুক্তরাষ্ট্রে গমন উপলক্ষে বিভাগের পক্ষ থেকে বিদায় সংবর্ধনা আয়োজন করা হয়।

❑ **সম্মাননা:** ২১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাণ্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)-এর দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এমবিএ পরীক্ষায় উত্তম ফলাফলের জন্য সহযোগী অধ্যাপক ও বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ মহমান্য রাষ্ট্রপতি চ্যান্সেলরস্ গোল্ড মেডেল লাভ করেন।

কলেজের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ এবং প্রয়াত শিক্ষক জনাব মোঃ নূর হোসেন সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

❑ **ক্লাস সমাপনী:** প্রতিবছরের মতো ২০১৫ সালে সম্মান ১ম, ২য়, ও ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীরা ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

মার্কেটিং বিভাগ

❑ **দায়িত্ব গ্রহণ:** ১ আগস্ট ২০১৫ তারিখে সহযোগী অধ্যাপক বেগম দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

❑ **ক্লাস সমাপনী:** ২৪ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে সম্মান ৩য় বর্ষ এর এবং ২৭ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে সম্মান ১ম বর্ষ এর ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

❑ **সম্মাননা:** কলেজের সার্বিক উন্নয়নে অবদান-এর স্বীকৃতি হিসেবে রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সম্মাননা ও স্বর্ণপদক লাভ করেন প্রফেসর মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার।

❑ **প্রকাশনা:** ২০১৫ সালে প্রফেসর মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার, সহযোগী অধ্যাপক বেগম দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন ও সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ মঞ্জুরুল আলম-এর বই 'বিজ্ঞাপন ও প্রমোশন' এবং সহকারী অধ্যপক বেগম ফারহানা আক্তার সাদিয়া ও প্রভাষক বেগম তাসমিনা নাহিদ-এর বই 'সেবা বাজারজাতকরণ' প্রকাশিত হয়।

ফিন্যান্স অ্যাণ্ড ব্যাংকিং বিভাগ

❑ **ফলাফল:**

সম্মান: ২০১৫ সালের সম্মান ১ম বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পরীক্ষায় বিভাগীয় শিক্ষার্থীরা ঈর্ষনীয় ফলাফল অর্জন করে।

মাস্টার্স: ২০১২ সালের মাস্টার্স (সেশন ২০১১-২০১২) ফাইনাল পরীক্ষায় ৫৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৩ জন ১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়।

❑ **ক্লাস সমাপনী:** ২০১৫ সালের সম্মান ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

❑ **শিক্ষা সফর:** বিভাগীয় শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে অনার্স ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীরা কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিনে শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণ করে।

পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ

❑ **সম্মাননা:** কলেজের সার্বিক উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ সম্মাননা ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জনের জন্য সম্মাননা ও স্বর্ণপদক লাভ করেন সহযোগী অধ্যাপক ড. মিরাজ আলী আকন্দ।

❑ **ফলাফল:** উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৫-এ পরিসংখ্যান বিষয়ে ৭৮.৭৭% শিক্ষার্থী ও আইসিটি বিষয়ে ৪৭.০৪% শিক্ষার্থী A+ অর্জন করে।

❑ **বিদায় :** বিভাগীয় শিক্ষক জনাব মোঃ হোসাইন শুভ-র উচ্চ শিক্ষার্থে যুক্তরাষ্ট্র গমন ও তারিকুজ্জামান খানের ক্যাডেট কলেজে গমন উপলক্ষে বিভাগের পক্ষ থেকে বিদায় সংবর্ধনা আয়োজন করা হয়।

❑ **অর্জন :** সহযোগী অধ্যাপক জনাব আলেয়া পারভীন স্ট্যাম্পফোর্ড- বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রী অর্জন করেন।

অর্থনীতি বিভাগ

❑ **দায়িত্ব গ্রহণ:** ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্ বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

❑ **ফলাফল:** উচ্চ মাধ্যমিক- ২০১৫ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয় এবং ৩৮.১৫% শিক্ষার্থী A+ অর্জন করে।

সম্মান- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সম্মান ১ম বর্ষ, ২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পরীক্ষায় শতভাগ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে।

মাস্টার্স- ২০১১ সালের মাস্টার্স পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করে বিভাগের শিক্ষার্থী সাইদা খানম। ২০১২ সালের মাস্টার্স পরীক্ষায় বিভাগের শতভাগ শিক্ষার্থ ১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়।

❑ **প্রকাশনা:** ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল ভলি-৬, নং ১- ২০১৪-এ সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্ এর প্রবন্ধ 'CSR Program of Banks Can be the Imiteble Model for Proverty Alleviation' প্রকাশিত হয়।

সহযোগী অধ্যাপক বেগম সুরাইয়া পারভীন, সহকারী অধ্যাপক বেগম হাফিজা শারমিন ও সহকারী অধ্যাপক বেগম সুরাইয়া খাতুন রচিত বই অর্থনীতি দ্বিতীয়পত্র (উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির জন্য) প্রকাশিত হয়।

❑ **ক্লাস সমাপনী:** ২৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে সম্মান ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীরা ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

❑ **সম্মাননা:** উত্তম ফলাফলের জন্য বিভাগের তিনজন শিক্ষার্থী রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে পদক লাভ করে। কলেজের সার্বিক উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারমান জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্ সম্মাননা ও স্বর্ণপদক লাভ করেন।

সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ

❑ **দায়িত্ব গ্রহণ:** ১ আগস্ট ২০১৫ তারিখে বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ ইউনুছ হাওলাদার। বিভাগীয় শিক্ষক প্রফেসর মোঃ আবু তালেব উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থী উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১ আগস্ট ২০১৫ তারিখে।

❑ **ফলাফল:** ২০১৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ের ১৫৪৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৫০৩ জন A+ নম্বর পায়।

❑ **পরিদর্শন:** অফিস পরিদর্শন সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থা বিষয়ের একটি নিয়মিত কার্যক্রম। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এণ্ড রিচার্স একাডেমি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ও বি এস বি ফাউণ্ডেশন পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিদর্শন শেষে শিক্ষার্থীরা পরিদর্শনভিত্তিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে।

সমাজবিদ্যা বিভাগ

❑ **প্রতিষ্ঠা:** ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে কলেজ পরিচালনা পরিষদের ২১৭ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভূগোল (উচ্চ মাধ্যমিক ১ম ও ২য় পত্র), সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সম্মান শ্রেণি) বিষয়কে একীভূত করে সমাজবিদ্যা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

❑ **দায়িত্ব গ্রহণ:** সেপ্টেম্বর ৭, ২০১৫ তারিখে পূর্ববর্তী ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক জনাব মাওসুফা ফেরদৌসী- কে সমাজবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়।

❑ **শিক্ষা সফর:** উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ভূগোল বিষয়ে ব্যবহারিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৭৬ জন শিক্ষার্থী ১৮ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে গাজীপুরে শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করে।

❑ **কার্যক্রম:** বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৫ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ আয়োজিত জাতীয় পরিবেশ অলিম্পিয়াডে ভূগোল বিষয়ে অধ্যয়নরত উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

❑ **সম্মাননা:** কলেজের সার্বিক উন্নয়নে অবদান- এর স্বীকৃতি হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সহযোগী অধ্যাপক জনাব মাওসুফা ফেরদৌসী সম্মাননা ও স্বর্ণপদক লাভ করেন।

❑ **প্রকাশনা:** উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য কাজী ফারুকী ও বাহার উল্যা ভূঁইয়া রচিত বই ভূগোল- ২য় পত্র প্রকাশিত হয়।

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (বিবিএ)

❑ **শিক্ষক শিক্ষার্থী পরিচিতি ও রিসেপশন:** ৩১ মার্চ ২০১৫ তারিখে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের শিক্ষক-শিক্ষার্থী পরিচিতি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ১৬ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের রিসেপশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। ৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখে ২০১৩ ২০১৪ শিক্ষাবর্ষের নিম্নোক্ত শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিকভাবে ফিন্যানসিয়াল ওয়েভার প্রদান করা হয়।

ক্রম	শিক্ষার্থীর নাম	শ্রেণি রোল নং	প্রাপ্ত SGPA* (৪.০০-এর মধ্যে)	প্রাপ্ত ফিন্যানসিয়াল ওয়েভার -এর হার
১	সোহেল মিয়া	বিবিএ-৩০৯	৩.৭৫	১০০%
২	শাহিদা আক্তার তামান্না	বিবিএ-২৬৮	৩.৬০	
৩	রাবেয়া আক্তার স্বর্ণা	বিবিএ-২৭০	৩.৬০	
৪	মাহফুজা আক্তার	বিবিএ-২৭৮	৩.৫০	৫০%
৫	মিজানুর রহমান	বিবিএ-২৮৩	৩.৫০	
৬	শরিফুল ইসলাম	বিবিএ-২৮৫	৩.৫০	

❑ **অভিভাবক সভা:** ২২ জুলাই ২০১৫ তারিখে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

❑ **শিক্ষা সফর:** ১৬ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে মুন্সিগঞ্জ ও নারায়নগঞ্জ এশিয়ান টেক্সটাইল মিলস লিঃ, সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর ও ঐতিহাসিক পানামনগর পরিদর্শন করে।

❑ **বিভাগ পরিদর্শন:** ২১ মার্চ ২০১৫ তারিখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. সুব্রত কুমার আদিত্য ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ পরিদর্শন করেন।

১৩ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে বিভাগ পরিদর্শন করেন ঢাকা কমার্স কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক ও কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মুতিয়ূর রহমান।

২০১৫ সালের কলেজ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গঠিত কমিটি ও ক্লাব, বিভাগ ও শাখার প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

শতভাগ উপস্থিতি

শত প্রতিকূলতা জয় করে প্রতিদিন শ্রেণি কার্যক্রমে উপস্থিত থাকা এক অসাধারণ অর্জন। নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি কঠোর আনুগত্য না থাকলে এ অর্জন সম্ভব নয়। শুধু কলেজ নয়, জাতির অগ্রযাত্রায় এদের ভূমিকা সহজে অনুমেয়। এ বছর উচ্চমাধ্যমিক ও অনার্স শ্রেণিতে শতভাগ উপস্থিত শিক্ষার্থীদের নাম প্রদত্ত হলো:

উচ্চ মাধ্যমিক (শিক্ষাবর্ষ ২০১৪-২০১৫)

রোল	নাম
২৯৯০৬	নাফিয়া আকতার হনুফা
২৯৯০৭	আয়শা আকতার ডানা
২৯৯১৩	আফরোজা আকতার শ্রাবনী
২৯৯১৫	রাবেয়া আকতার বিথী
২৯৯৪৬	তাহমিন আনজুম মিতু
২৯৯৫০	ফাতেমা আকতার পিংকি
২৯৯৯৮	ইসরাত জাহান
২৯৯৯৯	আসমা-উল হুসনা
৩০০০৪	নুসরাত জাহান
৩০০৩৭	নিশাত নায়লা মুনিয়া
৩০০৪৭	মেহতাজ মেহজাবিন মারুফা
৩০০৫৪	তাকিয়া তাবাসুম
৩০০৫৫	প্রমিতা মুগ্ধ প্রমিতি
৩০০৫৮	নুজহাত তাহিয়াত
৩০০৭৯	লুবনা তাবাসসুম মনির
৩০০৯৬	কানিজ ফাতেমা তুলি
৩০০৯৯	জান্নাতুল নাহার
৩০১০৭	সাদিয়া আফরিন
৩০১০৯	ইফাত আরা
৩০১১২	ফারজানা আক্তার রিহা
৩০১১৩	সাবরিনা সুলতানা প্রিয়া
৩০১১৯	রিয়াজমিন আকতার
৩০১২০	মেহনাজ ফেরদাউস নিজুম
৩০১৬৪	শাম্মী আকতার মীম
৩০১৭০	সুলতানা জাহান
৩০১৭৩	আয়সা সিদ্দিকা আশা
৩০২১৫	সুমাইয়া আক্তার মৌ
৩০২৫৭	আবিদা তাসনীম মোহনা
৩০২৭৮	আয়েসা তাসলিমা স্মৃতি
৩০২৮৪	জান্নাতি বেগম হেমা
৩০২৯১	শাহিনুর আকতার
৩০৩০৬	নুসরাত জাহান সাথী
৩০৩৭০	কানিজ পারভীন অর্থি
৩০৩৯২	মোসাম্মৎ নুরজাহান ইসলাম সুচি
৩০৩৯৯	কানিজ ফাতেমা আনিকা
৩০৪২৩	বুশরা ইসলাম
৩০৪৩৪	রহিমা আকতার
৩০৪৫০	আনিসা আফরিন
৩০৪৬৪	সুমাইয়া সিদ্দিকা
৩০৪৭৯	আলিসা নাহার ঐশি
৩০৪৮১	ফাতেমাতুজ জোহরা সাদিয়া
৩০৪৮৬	আফসানা আকতার
৩০৫১২	সঞ্চারী তালকুদার
৩০৫১৬	ইয়াসমিন আকতার ইমু
৩০৫১৯	তানজিলা মাহবুব
৩০৫২৬	সেরূপা ইয়াসমিন
৩০৫৩৫	সুমাইয়া ইসলাম মাহি
৩০৬০০	নুরজাহান সুলতানা মিতু
৩০৬১৫	দুরদানা এহসান
৩০৬১৬	নুসরাত জাহান মীম
৩০৬১৯	ইসমত আরা আঁখি
৩০৬৬৪	জান্নাতুল ফেরদৌস ইমা
৩০৬৬৯	নুজহাত তাবাসসুম
৩০৬৮৫	সাইদা তাসমিয়া প্রিয়া
৩০৭৩৬	শায়কা কুরাইশী
৩০৭৩৭	হেনা কুরাইশী

রোল	নাম
৩০৮০৮	সাব্বির আহমেদ
৩০৮১৯	এস.কে. সামির আহমেদ ফাহাদ
৩০৮২০	মোঃ রায়হান হাওলাদার
৩০৮৪২	শামছুল আলম পলাশ
৩০৮৬১	মোঃ ফেরদৌস কবির
৩০৮৬২	এস.এম. নাহিদ হোসাইন পলাশ
৩০৮৭৮	মোঃ ফারিহীন ইসলাম
৩০৮৮৮	আশিস পোদ্দার
৩০৯০৩	তানভীর মাহতাব রূপম
৩০৯০৯	আসিকুর ইসলাম রকিম
৩০৯১৬	রবিন আহমেদ
৩০৯২২	আসফাকুল ইসলাম তানজীল
৩০৯৮২	মোঃ মাহবুবুল আলম
৩০৯৯২	মোঃ রাকিবুল আমিন
৩০৯৯৪	মোঃ রেজাউল ইসলাম
৩১০১১	মোঃ ফাইজুল ইসলাম মজুমদার
৩১০১৬	নাভিদ ফারাবি
৩১০২৯	মোঃ রাসেল
৩১০৩৫	সৈয়দ শামীম হোসেন
৩১০৩৬	মজুমদার হিয়াম হাবিব
৩১০৬৪	মোঃ সাজ্জাদুর রহমান
৩১১০৫	আশিকুর রহমান
৩১১২৭	আবুল কাসেম উজ্জ্বল
৩১১৪২	গোলাম রাব্বানী তালকুদার
৩১১৯৩	রাজন কুন্ডু
৩১৩০৮	মোঃ শিথিল ইসলাম
৩১৩২৮	রায়হান খাঁন
৩১৩৩৯	আল ইসলাম শান্ত
৩১৩৮৬	তাওহীদ হোসেন
৩১৫১২	মোঃ রুহুল আমীন
৩১৫৩৭	মোঃ জিসান আহমেদ
৩১৫৮৭	মোঃ রিয়াজ
৩১৬১০	মোঃ সায়েদুল মোরসালিন
৩১৬৮০	মোঃ ইয়াছিন আরাফাত
৩১৭৫৩	মোঃ জুয়েল মিয়া
৩১৮১৩	আদিব আহামেদ
৩১৮২৩	এ কে এম মেহেদী হাসান (মৃদুল)
৩১৮৩৪	সাইদুর হাসান মোঃ ইফতেখার ভূঁইয়া
৩১৮৭১	মোঃ কাইয়ুম মিয়া
৩১৯৪৪	মোঃ আনিসুর রহমান বিপ্লব
৩১৯৬৩	তারেকুল ইসলাম
৩১৯৯৬	মোঃ ইমাম হোসেন
৩২১৫১	মোঃ এহসানুল হক বাধন
৩২১৬৫	মোঃ সাইদুল ইসলাম
৩২১৯০	মোঃ মিজান উদ্দিন
৩২২৩৪	এম.এম. তানজিমুল হক
৩২২৫০	রিয়াদ মিয়া
৩২২৯২	জামসেদ আহমেদ
৩২৩০২	ফজলে আলি খন্দকার
৩২৩৩৬	মোঃ সোহেল
৩২৩৪৬	মোঃ তানবীর মাহতাব মন্ডল
৩২৫৫৩	মেহেদী হাসান
৩২৫৬৯	তৌকির ইসলাম জয়

অনার্স

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

রোল	নাম
এ-১২৬৮	শিরিন সাদেক
এ-১১৮৮	আফিয়া জাহান
এ-১০৩০	জলি মজুমদার
এ-১০৩১	সালমা আক্তার
এ-১০৫৩	মো. মাহবুব আলম
এ-১০৫৭	মো. শরিফুল ইসলাম
এ-১১০৮	মো. নূর আলী
এ-৯৬৪	রিফাত সুমাইয়া
এ-৯৭৭	উম্মে সালমা
এ-৯৮২	আসমা আক্তার
এ-১০০৫	রিকো খান

মার্কেটিং বিভাগ

রোল	নাম
এমকেটি-১১৭০	এস.এম.ফয়সাল
এমকেটি-৯২৮	মোঃ জাকিরুল ইসলাম

অর্থনীতি বিভাগ

রোল	নাম
অ-৩৬১	রোকসানা আক্তার
অ-৩৪৮	আবু তাহের মুহাম্মদ মছিহ
অ-৩২৫	মো. মিজানুর রহমান
অ-৩২৮	হোসনে আরা আক্তার হিরা

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (ডিবিএ)

রোল	নাম
বিবিএ-২৬৬	মারজানাতুল জান্নাত চৈতি
বিবিএ-৩২২	মো. আরিফুজ্জামান
বিবিএ-৩৩৪	শিরিন আক্তার সুমি
বিবিএ-২৭৯	হাবিবা তাবাসসুম কান্তা
বিবিএ-৩৩৮	আনিকা আমির
বিবিএ-৩৩৯	সায়মা ইয়াসমিন
বিবিএ-৩৪৩	ফাহমিদা আজিজ
বিবিএ-৩৪৪	নিশাত জাহান
বিবিএ-৩৪৮	আরমিতা মুন
বিবিএ-৩৫৮	নুসরাত জাহান দোলা
বিবিএ-৩৬১	তাজনিন ইসলাম
বিবিএ-৩৬৩	কামরুন নাহার ইভা

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: কাজী মো. আজিজুর রহমান, বিভাগ: ডিবিএ, রোল: বিবিএ ৪০৫

প্রতিবেদন >

আলোচনা অনুষ্ঠান

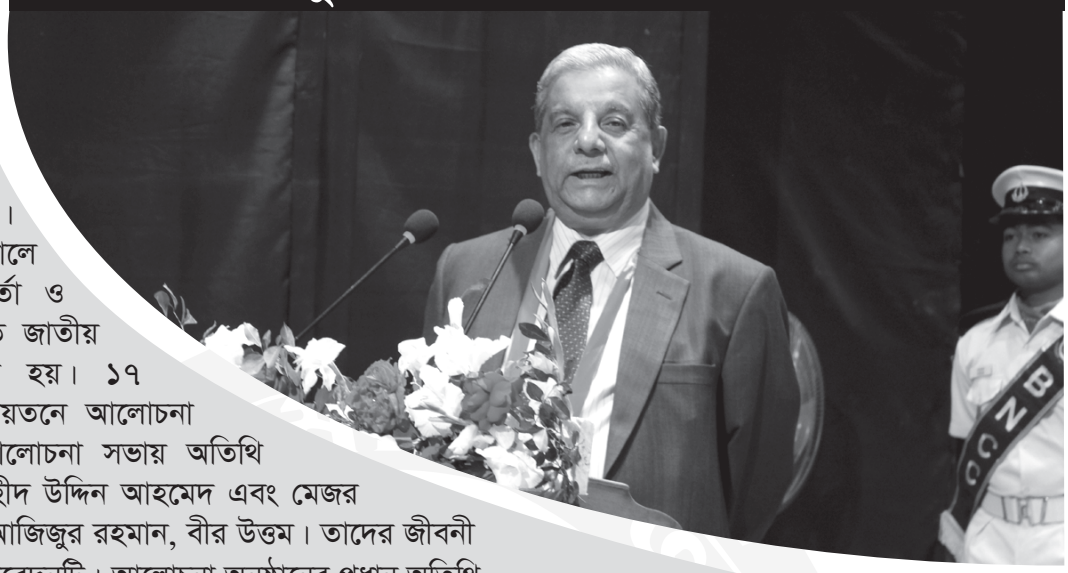

প্রতি বৎসরের মত ২০১৫ সালেও ঢাকা কমার্স কলেজ যথাযথ মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করে। ১৬ ডিসেম্বর সকালে শিক্ষার্থী-শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ১৭ ডিসেম্বর কলেজ মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ এবং মেজর জেনারেল (অব.) এম. আজিজুর রহমান, বীর উত্তম। তাদের জীবনী নিয়ে তৈরি হলো এ প্রতিবেদনটি। আলোচনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি

প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ ১৯৪৭ সালের ৩১শে জানুয়ারি ফেনীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। শৈশবে তিনি ফেনী গভ:পাইলট হাইস্কুলে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু করে কৃতিত্বের সাথে একই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন সম্পন্ন করেন। এর পর তিনি ফেনী সরকারী কলেজ ও এ উপমহাদেশের বিখ্যাত কলেজ চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজে অধ্যয়ন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে বিকম অনার্স ও এমকম ডিগ্রী লাভ করে ১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে লেকচারার হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স বিভাগে যোগদান করেন। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার অব্যবহিত পরই শুরু হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং তিনি মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি যোগদান করেন। এরপর তিনি যুক্তরাজ্যের লন্ডনে ব্রুন্যাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। স্বীয় মেধা বলে তিনি কালক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, প্রো: উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ ও সূর্যসেন হলের প্রভোষ্ট ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব অতি সফলতার সাথে পালন করে সুনাম অর্জন করেন।

তিনি একজন স্বনামধন্য গবেষক, পাঠ্য পুস্তক ও রেফারেন্স বই ও মনোগ্রাফ-এর প্রণেতা। অতি উচ্চমানের পুস্তক প্রণয়নের জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কর্তৃক পুরস্কার লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসাবে পুরস্কার লাভ করেন।

তিনি সমাজ জীবনে অনেক শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ছিলেন। তিনি ফেনী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রোগামের উপদেষ্টা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অবদান ও গবেষণা কর্মের স্বীকৃতি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্প্রতি এল.আর. সরকার প্রফেসর পদে অধিষ্ঠিত করে।

তিনি এদেশের বিখ্যাত উচ্চ মানের ডিগ্রী কলেজ ঢাকা কমার্স কলেজ-এর প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যার জন্য ঢাকা কমার্স কলেজ তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে স্বর্ণপদক প্রদান করেন। তিনি ঢাকা কমার্স কলেজের ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হওয়ার পর ১ম চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন এবং কলেজের প্রাথমিক উন্নয়নের সময়ে চেয়ারম্যান হিসাবে অতি নিষ্ঠার সাথে সফলতার দায়িত্ব পালন করেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ঢাকা কমার্স কলেজ অধ্যাপক ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদকে গুণীজন সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রদান করে।

আলোচনা অনুষ্ঠান

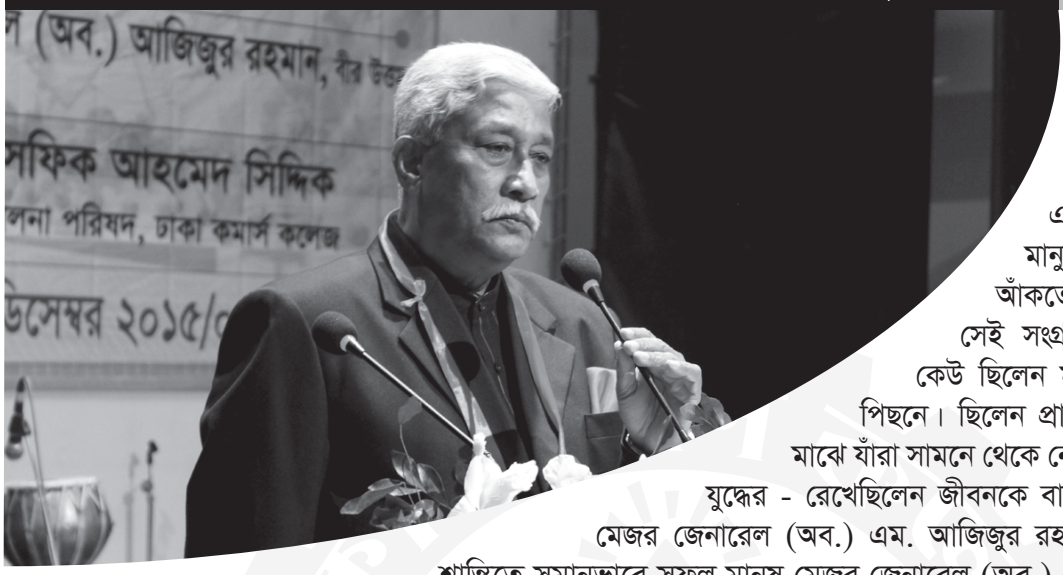

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। পৃথিবীর মানচিত্রে অংকিত হলো একটি দেশ। **বাংলাদেশ**। নয় মাসের একটি অসম যুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষের রক্তের বিনিময়ে আঁকতে হয়েছিল দেশটিকে। মহান সেই সংগ্রামে কেউ ছিলেন সামনে, কেউ ছিলেন মাঝে, আবার কেউ ছিলেন পিছনে। ছিলেন প্রায় সবাই। সেই সবাই-এর মাঝে যাঁরা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সংগ্রামের, যুদ্ধের - রেখেছিলেন জীবনকে বাজির তলে, তাঁদের একজন মেজর জেনারেল (অব.) এম. আজিজুর রহমান, বীর উত্তম। সমর ও শান্তিতে সমানভাবে সফল মানুষ মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ আজিজুর রহমান ১৯৪৫ সালের ১লা জানুয়ারি বিয়ানী বাজারে জন্ম গ্রহণ করেন, যদিও গোলাপগঞ্জ থানা রানাপিং এ তাঁর স্থায়ী বাসস্থান। পিতার কর্মস্থল হিসাবে তাঁকে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সিলেটে পড়াশুনা করতে হয়। তিনি সিলেট এম সি কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট ও ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। ১৯৬৬ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তদানিন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের কাকুল মিলিটারী একাডেমিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং ১৯৬৮ সালের এপ্রিলে কমিশন লাভ করে লাহোরে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ঢাকার জয়দেবপুরে বদলী হয়ে আসে। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী যখন ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে জয়দেবপুরে নিরস্ত্র করার ব্যর্থ অপচেষ্টা চালায় তখন তিনি রেজিমেন্টের এডজুটেন্ট ছিলেন। ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর সিলেটের পাকবাহিনী বাঙালী অফিসার ও সৈনিকদের হত্যা/ বন্দী করে এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে জেলে পুরে শহরে আতংকের সৃষ্টি করে। এমনি পরিস্থিতিতে ক্যাপ্টেন আজিজের নেতৃত্বে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈনিক তেলিয়াপাড়া, শ্রীমঙ্গল, লাতু-বিয়ানী বাজার হয়ে সিলেট শহরে প্রবেশ করে ও শহর দখল করে। এই সুযোগে সিলেট হাসপাতাল থেকে কিছু আহত অফিসার/সৈনিক এবং জেলা কারাগার থেকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে মুক্ত করা হয়। ক্যাপ্টেন আজিজ সিলেটের ই.পি.আর (বর্তমান বিজিবি), পুলিশ, আনসার এবং বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের একত্রিত করে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সুরমা নদীর তীরে, লালা বাজার, সাদিপুর ও শেরপুরের রণাঙ্গনে পুরো এপ্রিল মাস পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি সশস্ত্র আক্রমন করে তাদেরকে পর্যুদস্ত করে প্রচুর হতাহত করেন। শেরপুরের যুদ্ধে তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়ে প্রথমে কালিঘাট চা বাগান হাসপাতালে ও পরে ভারতের খোয়াই এবং আগরতলা হাসপাতালে চিকিৎসা লাভ করেন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই তিনি আবার যুদ্ধে যোগদান করেন এবং শ্রীমঙ্গল ও হবিগঞ্জ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব প্রদান করেন। সেপ্টেম্বর মাসে কালেঙ্গার বিখ্যাত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অর্ধশতাধিক পাকিস্তানী সৈনিক তাঁর বাহিনীর কাছে হতাহত হয়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ব্যাপী তিনি সিলেট এলাকায় বিরামহীনভাবে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে তাদের মনোবলকে পুরোপুরি ভাঙ্গতে সমর্থ হন। অপর দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সংঘটিত করে এলাকার জনগণের মনোবল বৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। মুক্তিযুদ্ধে অসম-সাহসিকতার জন্য তাঁকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদক "বীর উত্তম" খেতাবে ভূষিত করা হয়।

তিনি মিরপুর ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ থেকে স্নাতক (পিএসসি) এবং দিল্লীর ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর (এনডিসি) কোর্স সমাপ্ত করেন। তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এডজুটেন্ট জেনারেল ছিলেন। তিনি রংপুরে ডিভিশনের প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) ছিলেন। চট্টগাম ডিভিশনের জিওসি হিসাবে চার বছরেরও অধিক

সময় তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ঐ সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তির আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যা পরবর্তী সময়ে স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ রাইফেলসের মহাপরিচালক হিসাবে তিন বছর চার মাস দায়িত্ব পালন করে ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখ সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বিভিন্ন প্রতিকূলতা কাটিয়ে তাঁর নেতৃত্বে বিরোধপূর্ণ দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা ছিট মহলে প্রথমবারের মত দুইটি স্থায়ী সীমান্ত ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ রাইফেলসের সৈনিকদের জন্য নতুন কম্ব্যাট পোষাকের প্রচলন করা হয় যা সৈনিকদের মনোবলে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

সেনাবাহিনীর দায়িত্ব ছাড়াও তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, নেপালে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনটিগ্রেটেড মাউন্টেন ডেভেলোপমেন্ট (ICIMOD) এর বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্য হিসাবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। উপরোক্ত দুটি দায়িত্ব চট্টগ্রামের জিওসি থাকাকালীন তাঁকে পালন করতে হয়। তিনি বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট হিসাবেও অনেকদিন দায়িত্ব পালন করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি বাহরাইনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ঢাকা কমার্স কলেজ মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, বীর উত্তমকে গুণীজন সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রদান করে।

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: রাসলান হায়দার জামানী, শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৩২৩৮

প্রবন্ধ

গল্প

স্মৃতিকথা

ভ্রমণ। অনুবাদ

প্রত্নতি

২০১৫

সূচিপত্র

- ঢাকা কমার্স কলেজের বর্ণাঢ্য রজত জয়ন্তী / এস এম আলী আজম
- কলকাতা - মিরিখ-দার্জিলিং - এ সাতদিন / ড. এ. এম. সওকত ওসমান
- ম্যানগ্রোভের দেশে ফারুকী স্যার / মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন
- ৬৪ জেলার নামকরণের ইতিবৃত্ত: / মোঃ নজরুল ইসলাম
- হেরে যাওয়া যুদ্ধের কথা / অনুবাদ: মনসুর আলম
- দূর আমেরিকার দিনগুলো / খায়রুল ইসলাম
- The Pentagon of success: The Magic behind Success / Sabiha Afsari
- ঢাকা কমার্স কলেজের স্বয়ংক্রিয় হিসাব পদ্ধতি ও হিসাব ব্যবস্থাপনা / মোঃ আশরাফ আলী
- বেলাশেষে / আবু তাহের মুহাম্মদ মছিহ্
- পরীক্ষা / শিথিল ইসলাম
- প্রকৃতি এবং আমরা তিনজন / খন্দকার রবিউল ইসলাম
- বাগেরহাটে কাটানো একদিন / মোঃ আমিনুল ইসলাম আশিক
- আক্ষেপ / মোঃ মেহেদি হাসান পুনম
- প্রকৃতি / ইসরাত জাহান ইমা
- বই পড়ার অভ্যাস / মাহামুদুল হাসান নাবিল
- ফেলে আসা দিনগুলো / মোশারব হোসেন (রানা)
- রবিনের সফলতার গল্প / মোঃ খালিদ হোসেন খান
- আমার বন্ধু সোহেল / আবীর হাসান
- কেন এমন হলো / মোঃ পারভেজ দেওয়ান
- এবং একদিন / তাজনীন ইসলাম
- নানা রঙের দিনগুলো / সিফাত রাব্বানী
- ক্ষমা করে দিও বাবা / কুতুবুল আলম
- প্রেরণা / ফারিয়া জান্নাত ঝুমা
- নয়নাভিরাম সিলেট / নাঈম খন্দকার
- একটি নিরব আর্তনাদ / খন্দকার আবিদুর রহমান
- হাওয়া / লিমা ইসলাম
- আকাশ ফেলেছে ছায়া / নাফিস ইসমাম তাশিক
- বলা গল্প আবার বলা / দিদারুল আলম হিমেল
- লাবনীর গল্প / আসিনা রহমান হুমা

ঢাকা কমার্স কলেজের বর্ণাঢ্য রজত জয়ন্তী

এস এম আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ঢাকা কমার্স কলেজের কৃতিত্ব ও সফলতার ২৫ বছর উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে ৭ নভেম্বর ২০১৫ উদযাপিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজের রজত জয়ন্তী উৎসব ২০১৪। এ উপলক্ষে র‍্যালি, রক্তদান কর্মসূচি, গুণীজন সম্মাননা, কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা, স্মৃতিচারণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল ৮ ঘটিকায় রং-বেরংয়ের ব্যানার, বেলুন-ফেস্টুন, হাতি, ঘোড়ার গাড়ি, ব্যাণ্ড পার্টি ইত্যাদিসহ বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দের আকর্ষণীয় শোভাযাত্রা ও র‍্যালির মধ্য দিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজের রজত জয়ন্তী ২০১৪ এর শুভসূচনা হয়। শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে র‍্যালির উদ্বোধন করেন কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। র‍্যালিতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী, অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম ও উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল। এরপর কলেজ হলরুমে রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ঢাকা কমার্স কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য প্রফেসর ডাঃ এমএ রশীদ।

রজত জয়ন্তী উৎসবে গুণীজন সম্মাননা ও কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের উদ্যোক্তা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পরিচালনা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সাবেক স্বাস্থ্য সচিব এ এফ এম সরওয়ার কামাল, বিইউবিটি'র উপাচার্য প্রফেসর মোঃ আবু সালেহ প্রমুখ। রজত জয়ন্তী স্মরণিকা 'প্রদীপ্তি'র মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধান অতিথি আহম মুস্তফা কামাল। এরপর প্রধান অতিথি গুণীজনদের সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রদান করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে ঢাকা কমার্স কলেজের ইতিকথা ও প্রতিষ্ঠাকালীন স্বপ্নগাঁথার স্মৃতিচারণ করেন। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বাস্তবভিত্তিক ব্যবসায় ও প্রযুক্তি শিক্ষা অর্জনের কথা বলেন। স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে ক্রিকেট অনুরাগীসহ ক্রীড়া ও সংস্কৃতিমনা হওয়ার আহ্বান জানান। একই সাথে ক্রিকেটে একদিন আমাদের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন বাস্তবায়নের আশা তিনি ব্যক্ত করেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের দেশমাতৃকার রক্ষার জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। সভাপতির ভাষণে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক ঢাকা কমার্স কলেজ কর্তৃক আজকের গুণীজনদের সম্মাননা জানানোর মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে গুণীজনদের পদানুসারী হওয়ার উদ্বুদ্ধ করেন। সবশেষে তিনি সোনার বাংলা গড়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আরো প্রত্যয়ী ও পরিশ্রমী হওয়ার আহবান জানান।

রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানের ২য় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় স্মৃতিচারণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের স্মৃতিকথা এবং গান, নাচ ও অভিনয়ে মুগ্ধ হয় সকলে। গভীর রজনীতে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলামের সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে।

উল্লেখ্য, ঢাকা কমার্স কলেজের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ৩৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গুণীজন সম্মাননা ও স্বর্ণপদক দেয়া হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- পরিকল্পনা মন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. এ এইচ এম হাবিবুর রহমান, মিলেনিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবু আইয়ুব মোঃ বাকের, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ মঈনউদ্দীন খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ বিভাগ ও ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শান্তি নারায়ণ ঘোষ, এফবিসিসিআই এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মীর নাসির হোসেন, আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স অ্যাণ্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রোটারিয়ান আফতাব-উল ইসলাম, ট্রাস্ট ব্যাংক এর প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইকবাল-ইউ-আহমেদ, জীবন বীমা কর্পোরেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম শামছুল আলম, আইসিএবি এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এএসএম নাঈম এবং আইসিএমএবি এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রুহুল আমিন। এছাড়া ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের ৯ জন সদস্য এবং ১৭ জন শিক্ষককে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের

জন্য গুণীজন সম্মাননা ও স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়।

১৯৮৯ সালে রাজধানীর কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের শিশুদের আঙ্গিনায় ভূমিষ্ঠ হলো ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত এবং স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত আলোকবর্তিকা, যার রোদ ও তেজে ভেসে যায় শিক্ষাকাশের কালোমেঘ, শৈশবেই যার বলিষ্ঠ চাহনিতে মুগ্ধ সকলে, কৈশোরে যার নাম তামাম দেশ জুড়ে, যৌবনে যে শিক্ষার বিশ্বপল্লীতে অবগাহন করছে, সর্বদাই যে সাফল্যের শীর্ষে, তার নাম ঢাকা কমার্স কলেজ।

ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৯৬ সালে মাত্র ৭ বছরের শিশুকালে এবং ২০০২ সালে ১৩ বছরের কৈশোরকালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী যার নেতৃত্বে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি ১৯৯৩ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের স্বীকৃতি লাভ করেন। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ সামসুল হুদা, এফসিএ। কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ।

ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচালনা পরিষদে রয়েছেন দেশজুড়ে সুপরিচিত শিক্ষাবিদ, প্রশাসক ও সমাজসেবী ব্যক্তিবর্গ। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (১৯৮৮-৮৯)-র আহ্বায়ক ছিলেন প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী, সাংগঠনিক কমিটি (১৯৮৯-৯০)-র সভাপতি ছিলেন বিসিআইসির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ তোহা, নির্বাহী কমিটি (১৯৯০-৯১) এর সভাপতি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর আব্দুর রশিদ চৌধুরী। কলেজ পরিচালনা পরিষদের পূর্ববর্তী চেয়ারম্যানগণ হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ (১৯৯১-৯৮), সাবেক স্বাস্থ্য সচিব এ এফ এম সরওয়ার কামাল (২০০২-২০০৯) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক (১৯৯৮-২০০১ ও ২০০৯ থেকে বর্তমান)।

ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্দেশ্য বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা। কলেজের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার জন, শিক্ষক সংখ্যা ১৩২, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ১০৩ এবং পরিচালনা পরিষদ ১৬ সদস্য বিশিষ্ট। এ কলেজে উচ্চমাধ্যমিক ব্যবসায় শিক্ষা ছাড়াও ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি ও অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স রয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল কোর্স। শীঘ্রই খোলা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইলেকট্রনিক অনার্স কোর্স। ঢাকা কমার্স কলেজের রয়েছে অত্যাধুনিক কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, যেখানে প্রায় ৩৫ হাজার বই ও জার্নাল রয়েছে। এছাড়া সকল সম্মান শ্রেণির বিভাগে স্বতন্ত্র সেমিনার লাইব্রেরি রয়েছে। সবগুলো সেমিনার লাইব্রেরিতে প্রায় ১৫ হাজার গ্রন্থ রয়েছে। কলেজের ৪ তলায় রয়েছে অত্যাধুনিক ৪টি কম্পিউটার ল্যাব। কলেজের পরীক্ষা ও হিসাব কার্যক্রম অটোমেশনের মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে। শিঘ্রই ডায়নামিক ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে কলেজের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সফ্‌টওয়্যারে সম্পাদন করা হবে। সাফল্যের সুতিকাগার ঢাকা কমার্স কলেজের অর্থায়নে ৫ এপ্রিল ২০০৩ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যবসায় ও প্রযুক্তি শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)'।

ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের ভিত্তি একদল কমিটেড শিক্ষকের আন্তরিকতাপূর্ণ টিমওয়ার্ক। শিক্ষকদের মানোন্নয়নে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার এবং শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম। প্রতিষ্ঠানটির নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে ঈর্ষণীয় সাফল্য ক্ষয়িষ্ণু সমাজ প্রেক্ষাপটে উজ্জ্বল আশা ও সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করেছে। শিক্ষার্থী-অভিভাবক সর্বদা কলেজের বিধি-বিধান মেনে চলছেন।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত এবং রাজনীতি ও ধূমপান মুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের একটি আর্দশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্ল্যান অনুযায়ী এ কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হয়। সাপ্তাহিক, মাসিক ও তিন মাস অন্তর পর্ব পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা সকল ছাত্র-ছাত্রীকে অবশ্যই মেনে চলতে হয়। প্রতি টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সেকশন পরিবর্তন করা হয়। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাল ফলাফল করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো ফলাফল অর্জন করছে।

ব্যবসায় শিক্ষার সেরা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থীদের পূর্বের চেয়ে ভালো ফল অর্জন করার নিশ্চয়তা। নিম্নমানের কাঁচামাল দিয়ে সেরা পণ্য তৈরি যেন এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্ভব। জুৎসই পাঠদান ও পরীক্ষা

পদ্ধতির কারণে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অবিরাম সাফল্য ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানটির। অত্র কলেজের এইচএসসি প্রথম ব্যাচ (১৯৯১) বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাসসহ মেধাতালিকায় শিক্ষার্থীরা ২য় ও ১৫তম স্থান অর্জন করে। বোর্ড মেধাতালিকায় অত্র কলেজের শিক্ষার্থীরা ১৯৯২ সালে ১ম ও ১৬তম স্থান, ১৯৯৩ সালে ২য় সহ ৫ জন, ১৯৯৪ সালে ১ম সহ ৪ জন, ১৯৯৫ সালে ১ম ও ৩য় সহ ১০ জন, ১৯৯৬ সালে ১ম সহ ১৩ জন, ১৯৯৭ সালে ৪ জন, ১৯৯৮ সালে ৭ জন, ১৯৯৯ সালে ৮ জন, ২০০০ সালে ১ম, ২য় ও ৩য় সহ ১৩ জন, ২০০১ সালে ১ম সহ ৬ জন ও ২০০২ সালে ১ম ও ৩য় সহ ৪ জন মেধাস্থান লাভ করে। ২০০৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত জিপিএ পদ্ধতিতে এইচএসসি পরীক্ষায় অত্র কলেজের গড় পাসের হার ৯৯.৮% এবং এই ১৩ বছরে ২২০৮৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৯৩২ জন, যা ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় দেশের যে কোনো কলেজের তুলনায় সর্বোচ্চ। সৃষ্টিলগ্ন থেকে কলেজে গড় পাসের হার উচ্চমাধ্যমিকে প্রায় ৯৮%, অনার্স-এ ৯৪% ও মাস্টার্স -এ ৯৭%।

ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রন্থকীট হয়ে নেই। শিক্ষাসম্পূরক কার্যক্রমেও এরা সদা অগ্রগামী। প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বনভোজন, সুন্দরবন ভ্রমণ, নৌবিহার, শিক্ষাসফর, অফিস ও কারখানা পরিদর্শন, বার্ষিক ভোজ, মিলাদ ইত্যাদি। জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অত্র কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে প্রায় প্রতি বছরই পদক ছিনিয়ে আনছে। শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা পরিস্ফুটন ও নেতৃত্ব বিকাশে রয়েছে বিএনসিসি নৌ উইং, আন্তর্জাতিক রোটার‍্যাক্ট ক্লাব, আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি, সাধারণজ্ঞান ক্লাব, বির্তক ক্লাব, আবৃত্তি পরিষদ, নাট্য পরিষদ, নৃত্য ক্লাব, সঙ্গীত পরিষদ, রিডার্স এন্ড রাইটার্স সোসাইটি, ল্যাগুয়েজ ক্লাব, ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব, নেচার স্টাডি ক্লাব, আইটি ক্লাব, সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাব এবং বন্ধন সমাজকল্যাণ সংঘ। কলেজে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, রেডক্রিসেন্ট, সন্ধানী, অরকা, থ্যালাসেমিয়া হাসপাতাল ও আহছানিয়া মিশন রক্তদান ইউনিট এবং যুব পর্যটক ক্লাব শাখা সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করছে। কলেজের রয়েছে 'কণিকা' রক্তদান সংগঠন। সামাজিক কর্মকাণ্ডেও ঢাকা কমার্স কলেজ নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে। কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বন্যার্ত ও শীতার্তদের মাঝে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে থাকে। প্রতিবারই রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সকল শ্রেণিতে প্রত্যহ প্রথম ঘণ্টায় অতিরিক্ত ১৫ মিনিট সাধারণজ্ঞান ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজের রয়েছে সমৃদ্ধ প্রকাশনা ভাণ্ডার। বার্ষিকী, মাসিক পত্রিকা, জার্নাল, বিভাগীয় স্যুভেনির, ক্লাব স্যুভেনির, সার্ক ট্যুর স্যুভেনির, বিশেষ স্মরণিকা, স্মৃতি অ্যালবাম, ক্যালেন্ডার, ডায়েরি, টেলিফোন ইনডেক্স, প্রশ্নব্যাংক, দেয়ালিকা, শুভেচ্ছা কার্ড ইত্যাদি নিয়মিত বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে। ঢাকা কমার্স কলেজই দেশে প্রথম অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করে। প্রিন্টিং ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া অত্র কলেজের সংবাদ গুরুত্বসহ সচিত্র প্রকাশ করছে।

৬ অক্টোবর ১৯৮৮ মাত্র ১৫শ' ৫০ টাকা নিয়ে যে প্রকল্পের পদযাত্রা, ২৫ বছরেই তা বেসরকারিভাবে সম্পদে-শৌর্যে সূর্য ছুঁয়েছে। সরকার বা দাতাদের অনুদান ছাড়াই ঢাকা কমার্স কলেজ কমপ্লেক্স-এর উন্নয়ন কার্য মহীরূহে পরিণত হয়েছে। আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষার প্রজ্জ্বলিত মশাল হাতে প্রতিষ্ঠানটি শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বোটানিক্যাল গার্ডেনের কোল ঘেঁষে। আধুনিক স্থাপত্যকলা ও নির্মাণশৈলী এবং মনোলোভা সৌকর্যমন্ডিত কলেজ ভৌতকাঠামো যেন পর্যটন কেন্দ্রে রূপ নিয়েছে। প্রতি তলায় ১০ হাজার ৬শ' বর্গফুট মেঝের ১১ তলা বিশিষ্ট ১নং অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতি তলায় ৭ হাজার বর্গফুট আয়তনের ১৫ তলা বিশিষ্ট ২ নং অ্যাকাডেমিক ভবনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ৮ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনের ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ শেষ হয়েছে। ১২ তলা বিশিষ্ট ২টি শিক্ষক ভবনে ৬৬ জন শিক্ষক সপরিবারে বসবাস করছেন। ১৫শ আসন বিশিষ্ট প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী অডিটোরিয়াম এর নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসে ২০১৩ সাল থেকে চালু হয়েছে ৭২ আসন বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস। অডিটোরিয়াম সংলগ্ন কলেজ মাঠটি যেন আবাসিক শিক্ষক পরিবার ও শিক্ষার্থীদের 'ফুসফুস'। কলেজের রয়েছে অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদিসহ জিমনেশিয়াম। কলেজ অঙ্গনে ভাষা শহীদদের স্মরণে নির্মিত হয়েছে শহীদ মিনার। ১নং অ্যাকাডেমিক ভবনের নিচ তলায় রয়েছে আধুনিক ক্যাফেটেরিয়া এবং ২নং অ্যাকাডেমিক ভবনের নিচ তলায় রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পাঞ্জেগানা নামাজ ঘর। সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাকাডেমিক ভবনসমূহে নিয়মিত বিদ্যুত সরবরাহের সুবিধার্থে কলেজ প্রাঙ্গণে স্থাপন করা

হয়েছে ২টি জেনারেটর। কলেজ ও আবাসিক ভবনের পানীয় ব্যবস্থা কলেজের নিজস্ব ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। রূপনগর আবাসিক এলাকা ও মিরপুর বেরিবাঁধ সংলগ্ন কলেজের কয়েকটি প্লটে কর্মচারী আবাসিক ভবন, ছাত্রাবাস, ছাত্রী নিবাস ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। কলেজে স্থাপিত সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের এটিএম বুথ এবং বেতন কালেকশন সেন্টার কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের ব্যাংক লেনদেন এবং শিক্ষার্থীদের বেতন পরিশোধ সহজ ও আরামদায়ক করেছে।

ঢাকা কমার্স কলেজের ৩৫ হাজার প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ইতোমধ্যে তাদের ক্ষুরধার মেধা, নিপুণ যোগ্যতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দ্বারা দখল করে নিয়েছে দেশের সব শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক-বিমাসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক কোম্পানি থেকে শুরু করে বিভিন্ন গণমাধ্যম পর্যন্ত। ২০৩৯ সালে প্রতিষ্ঠানটির সুবর্ণ জয়ন্তীতে হয়তো দেখা যাবে গণতান্ত্রিক এদেশটির নেতৃত্ব দিচ্ছে এ কলেজেরই বহু প্রাক্তন শিক্ষার্থী; সুনাম, ফল আর কৃতিত্বে এটি হবে আন্তর্জাতিক মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

দীর্ঘ ২৫ বছর ঢাকা কমার্স কলেজ বিরামহীন ও নিরবচ্ছিন্নভাবে কৃতিত্ব আর উন্নয়নের মহাসড়কে চলছে আর চলছে; কখনও তাকে থেমে থাকতে হয়নি। সাফল্যের কক্ষপথ পরিক্রমায় কোনোরূপ বিচ্যুতির সম্ভাবনা দেখা যায়নি। তবুও কলেজের শরীরে কোনো কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি হলে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২০৩৯ সালের মধ্যে তা পলিমাটিতে সমৃদ্ধ হয়ে যাবে। ঢাকা কমার্স কলেজ ইতিহাসে নিয়ত সংযোজিত হোক নব সাফল্যের অনবদ্য সৃষ্টি-এই আমাদের প্রত্যাশা।

কর্মই ধর্ম। ঢাকা কমার্স কলেজের সৃজনশীল শিক্ষকেরা পরিচালকবৃন্দের সুনীতি ও যৌথ সিদ্ধান্ত এবং প্রশাসনের পরামর্শমূলক নির্দেশনায় প্রচেষ্টা আর সফলতার হালখাতা প্রতিনিয়ত চষে বেড়াচ্ছেন। বিশাল অবকাঠামোর মহীরূহ, পরীক্ষার ফলাফলের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রত্যহ বহুরূপ শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সুযোগ ইত্যাদি বিষয়াদি ঢাকা কমার্স কলেজকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। দীপ্তময় ঢাকা কমার্স কলেজ বেঁচে থাকুক তার কর্ম আর কৃতিত্বে। বেঁচে থাকুক আজীবন।

কলকাতা - মিরিখ-দার্জিলিং - এ সাতদিন

ড. এ. এম. সওকত ওসমান

ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবারের বিভিন্ন সদস্যবৃন্দ সুযোগ পেলেই দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে বেরিয়ে পরে। এবার পরিকল্পনা দার্জিলিং যাবার। অবশেষে ২৬ ডিসেম্বর রাত ১১:৩০টায় কল্যাণপুর গ্রীন লাইন পরিবহনের কাউন্টারে গিয়ে আমরা বাসের জন্য অপেক্ষা করি। ঐদিন বাস কল্যাণপুর থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে; কিন্তু ট্যুর অপারেটর জানত বাসটি ছাড়বে রাজারবাগ থেকে। তাড়াতাড়ি মোবাইল ফোনে বিষয়টি অবহিত করা হলে তিনি দ্রুত কল্যাণপুর আসেন। রাত সাড়ে এগারোটায় বাস যাত্রা শুরু করে। গ্রীন লাইন স্ক্যানিয়া বাসটি অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক। রাত দেড়টায় পাটুরিয়া ফেরী ঘাটে এসে পৌঁছালে জ্যাম দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ি। কিন্তু কলকাতাগামী বাসগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে ফেরী কর্তৃপক্ষ। ভোর ৭ টায় আমরা বেনাপোল গ্রীনলাইন কাউন্টারে অবতরন করি। আমরা ফ্রেশ হয়ে নাস্তা সেরে সকাল ৮:৩০ মি: বেনাপোল কাস্টমস্ ইমিগ্রেশন সেরে পেট্রাপোল ঢোকার জন্য উপস্থিত হই। ঈদ পরবর্তী ভীড়ে প্রায় দুঘণ্টা লাইনে দাড়িয়ে থাকতে হয়েছে। ইতিপূর্বে কখনও ভারত ঢোকার সময় এমনটি হয়নি। আমাদের দলে অধ্যক্ষ স্যার ও তার সহধর্মিনী, জনাব জাহাঙ্গীর আলম শেখ, জনাব শনজিৎ সাহা ও তার পুরো পরিবার, আমি ও আমার স্ত্রী। আমাদের নিয়ে চলছেন ট্যুর অপারেটর জনাব শাহেদ আহমদ শ্রাবন। তার প্রতিষ্ঠান হ্যাভেনটাচ ট্যুরিজম। ২০০৬ সন থেকে ঢাকা কমার্স কলেজের ট্যুরিজম পার্টনার। পথিমধ্যে অধ্যক্ষ স্যার নিয়মিত নামায ও সময় সময় আমাদের খোঁজখবর নিচ্ছেন। জাহাঙ্গীর আলম শেখ স্যার প্রথম বারের মত ভারতে ভ্রমণ শুরু করলেও তিনি যেন ছিলেন অনেক বেশি দক্ষ পর্যটক। সদা হাসিমুখ, সদালাপ এবং সহযোগীতা ছিল ওনার বৈশিষ্ট্য। ওনার আরেকটি বৈশিষ্ট্য আমাকে দারুনভাবে আকর্ষন করে সেটি হল শপিং-এ তিনি খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না।

পেট্রাপোল বন্দর থেকে আমাদের বাস ভারতীয় ১২:৩০ টায় ছেড়ে চলেছে। দুপুর ২:৩০ টায় দমদমের নিকট একটি সাদামাটা হোটেলে আহার। রুইমাছ, ডাল, সবজি। হোটেল বয়ের আতিথেয়তা। একটু ব্যতিক্রমী উষ্ণতায় ছিল।

বিকেল ৪:৩০ টায় আমরা কলকাতার পার্কস্ট্রীটে হোটেল সম্রাটে উঠি। রাত ৯ টায় ট্রেন। রাত ৮ টায় রওয়ানা। মাত্র কয়েক ঘণ্টার যাত্রাবিরতি হলেও হোটেল ভাড়া নেয়া হয়েছে বিশ্রামের জন্য। ভ্রমণ দলে অধিকাংশই পড়ন্ত বয়স ও শিশু। রাত ৮ টায় নিকটবর্তী দাওয়াত হোটেলে ডিনার সেরে শিয়ালদাহ্ স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা। এটি ভারতবর্ষের একটি বিখ্যাত রেলস্টেশন। রাত ৯টায় ট্রেন যাত্রা শুরু করে। আরামদায়ক ট্রেন। এসি কক্ষ। ভারতবর্ষের ট্যুরিজম শ্লোগান হল 'ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া'। এই বৈচিত্রময় ভারতবর্ষের বিস্ময়কর উপাদান ট্রেন সার্ভিস। পৃথিবীর বৃহত্তম রেল নেটওয়ার্কের অন্যতম ভারতীয় রেল। নির্ধারিত সিট, ওয়াশড চাদর, তোয়ালেসহ সকল উপকরণ ও আয়োজন ভ্রমণ উপযোগী। ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ পর আমরা যারযার বার্থে উঠে ঘুমিয়ে পড়ি। সকাল ৮টায় আমরা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে নাস্তা সেরে জীপ গাড়ীতে মিরিখের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। প্রায় ২ ঘণ্টা পর মিরিখ পৌঁছাই। মিরিখের বৈশিষ্ট্য হল অনেক উঁচু পাহাড়। নয়নাভিরাম দৃষ্টি নন্দন লেক। মিরিখ পরিদর্শন শেষে আহার এবং দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে যাত্রা। মিরিখে আমাদের দলের ২/১ জনের শ্বাস কষ্ট হয়েছে। পরবর্তীতে তা স্বাভাবিক হয়ে যায়। বিকেল ৫টা নাগাদ আমরা দার্জিলিং এ হোটেলে উঠি। রাতে আমরা কিছুটা শপিং করি। দার্জিলিং শাল, জ্যাকেট, স্যুয়েটার এর জন্য প্রসিদ্ধ। পরদিন সকালে বৌদ্ধ টেম্পল, তারপর রকগার্ডেন। রকগার্ডেন একটা ঝরনা। ৪০০ ফুট উঁচু হতে এটি নেমে এসেছে। অবশ্য দার্জিলিং এর আরেকটি বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান গঙ্গামায়া লেক। ভূমিকম্পে এটার ভৌগলিক অবস্থান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সংস্কার কাজ চলছে। এজন্য ট্যুরিষ্টরা এখন সেখানে যেতে পারছে না। রকগার্ডেন থেকে ফিরে হিমালয়ান মাউন্টেরিয়ান ক্লাবে আমরা যাই। পাশে একটি চিড়িয়াখানা আছে। এরপর আমরা দার্জিলিং এর বিখ্যাত রোপওয়ে চড়তে গমন করি। রোপওয়ে ভ্রমণ শেষ করে হোটেলে আসি পড়ন্ত দুপুরে। আহার সেরে রেষ্ট। রাতে আবার শপিং। গতকাল কারো কারো ২/১ টি আইটেম বাকী ছিল। আজকে পূর্ণ। পরদিন ভোরে টাইগার হিল গমন। দার্জিলিং ভ্রমণ এর সবচেয়ে আকর্ষনীয় ইভেন্ট কাঞ্চনজঙ্গায় সূর্যোদয় দেখা। সাধারণত নভেম্বর ডিসেম্বর এটি দর্শনের আদর্শ সময়। তার পরও এখানে সূর্যোদয় প্রতিদিন দেখা যায় না।

কুয়াসা বা মেঘ থাকলেই এসব অদৃশ্য। শুনেছি কবিগুরু এটি দর্শনের জন্য গিয়েছিলেন। অবশেষে দশ বারোবার যাওয়ার পর সূর্যোদয় দর্শন পেয়েছেন। আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলো। আমরা অত্যন্ত সুন্দর পরিষ্কার আকাশে এটির দর্শন পেয়েছি। সূর্যোদয় এবং কানচনজঙ্ঘা দর্শনে অমরা অভিভূত হয়ে যাই। হোটেলে গিয়ে দুপুর ২টায় আমরা নিউ জলপাইগুড়ি যাওয়ার জন্য যাত্রাশুরু করি । সন্ধা নাগাদ ওখানে পৌঁছাই।

রাত ৮.৩০ মিনিটে ট্রেনে আরোহন করি। যাবার পথে আমার স্ত্রীর সিট ট্রেনের উপরের টায়ারে পরে। অনুরোধ করার পর কলকাতার একজন বাঙ্গালী "চা বিশেষজ্ঞ" অবলীলায় তার নিজের সিট ছেড়ে দেন। সকাল ৮.৩০ মিনিটে শিয়ালদহ্ এসে পৌঁছাই। হোটেলে অবস্থান নেয়ার পর নাস্তা সেরে শপিং এ বেরিয়ে পরি, শনজিৎ স্যার যান চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। অধ্যক্ষ স্যার, জাহাঙ্গীর স্যার, আমি ও শাহেদ সাহেব প্রথমে নিউ মার্কেটে যাই। নিউ মার্কেট দলের মহিলা সদ্যসগণ পছন্দ না করাতে কলেজষ্ট্রীটে যাই। কলেজষ্ট্রীটে বেশ কয়েকটি বিখ্যাত আউটলেট রয়েছে। একটি আদিমোহীনি মোহন কানজিবরন। শ্রী লেদার এর প্রধান কার্যালয়ও এখানে। একপর্যায়ে অধ্যক্ষ স্যারকে আমরা হারিয়ে ফেলি। ইতোমধ্যে নেমে পড়ে বৃষ্টি। দেড়ঘণ্টা বৃষ্টির পর রাস্তায় কোন অটোরিক্সা পাচ্ছিলাম না। পরে বুঝলাম ঐরাস্তার চলাচল পরিবর্তন হয়েছে। অবশেষে বহুদূর হেটে যাই আমরা। সি, এন, জি নিয়ে পার্কস্ট্রীটে পৌঁছাই। ইতোমধ্যে অধ্যক্ষ স্যারও এসে পৌঁছান। ভ্রমণে অধ্যক্ষ স্যার একজন পর্যটকের ভূমিকায় ছিলেন। অর্থাৎ তিনি ওনার ট্রলিব্যাগ নিজেই বহন করেছেন। খাবার দাবার তিনি সবার মতই সেরেছেন। অতিরিক্ত কোনকিছু তিনি গ্রহণ করেন নাই। কলেজষ্ট্রীটে স্যারকে খুজতে গিয়ে জাহাঙ্গীর স্যার আহত হন। উনার হাত কেটে যায়। ২টায় অপারেটর শাহেদ সাহেব হসপিটালে নিয়ে উনাকে চিকিৎসা করান। রাতে আমরা সমন্বয় সভা করি। ভোর ৪টায় উঠে ৪.৩০ মিনিটের সময় বাসষ্টান্ডে পৌঁছাই এবং ৫টার সময় বাস যাত্রা শুরু করে। সকাল নয়টায় পেট্রাপোল এবং ১০টায় বেনাপোল এসে পৌঁছাই। চা-নাস্তা সেরে আবার ১১টার দিকে বাসে উঠি। রাত সাড়ে সাতটায় আমরা কল্যাণপুর এসে পৌঁছাই।

সমাপ্ত হয় ৭ দিনের কলকাতা - মিরিখ - দার্জিলিং ভ্রমণ।

ম্যানগ্রোভের দেশে ফারুকী স্যার

মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা কমার্স কলেজ জন্মের পর হতে প্রফেসর কাজী ফারুকী স্যারের নেতৃত্বে এক ঝাঁক তরুণ শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়ে স্যার প্রায়ই দেশ বিদেশের বিভিন্ন ভালো লোকেশন দেখতে বের হতেন। অনেক ঘুরাঘুরির অন্যতম একটি হলো সুন্দরবন ভ্রমণ। সে এক দুঃসাহসিক কাহিনী যা কাজী ফারুকী নামের সাথেই যায়। সৌভাগ্যক্রমে আমি ছাত্র ও শিক্ষক হিসেবে বেশ কয়েকবারই এই ভ্রমণে অংশগ্রহণ করেছি। তবে প্রথম বারের অভিজ্ঞতা আজও স্মৃতিতে অম্লান। কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি-

প্রস্তুতিপর্ব: বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিল সুন্দরবন ভ্রমণের প্রস্তুতি। ঢাকা কমার্স কলেজের বিবিধ ধারার সাংবাৎসরিক সহ-শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে আয়োজিত হয় এই ভ্রমণ কার্যক্রম।

প্রস্তুতি পর্বে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা, মধুমতি, তিস্তা ইত্যাদি নামের ৮টি হাউজে ভাগ করা হয়। দুজন করে শিক্ষকের উপর প্রতিটি হাউজের দায়িত্ব অর্পিত হয়। অন্যদিকে খাদ্য, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, খেলাধূলা, প্রচার, শৃঙ্খলা প্রভৃতি বিষয়ক আলাদা আলাদা কমিটি গঠন করা হয়। হাইস্পীড নেভিগেশন কোম্পানীর তিনতলা ২৭০ লম্বা ও ৫৬ চওড়া এম ভি তাকওয়া লঞ্চটি পূর্বরাত থেকেই সদরঘাটের তিন নং জেটীতে অপেক্ষা করছিল আমাদের স্বাগত জানানোর জন্য। রাতের মধ্যেই লঞ্চে তোলা হয়েছিল ভ্রমণ সময়কার প্রয়োজনীয় সকল উপাদান। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে ছিল ৯ টি গরু, ১২টি ছাগল, ৫০০টি মুরগী, ২০০০ ডিম, ৪০ মণ চাউল, ৮ মণ ডাল, ২ ট্রাক শাকসজী আর মাছ। জ্বালানী কাঠের পরিমাণ ছিল ৮০ মণ।

সুন্দরবন সফরের সবচেয়ে বড় সমস্যা পানীয় জলের। সাগর তীরবর্তী সুন্দরবনের পানি লবনাক্ত হওয়ায় এ অঞ্চল ভ্রমণার্থীরা প্রয়োজনীয় খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয় প্রথমেই। তাই ১৫/১৬ ড্রাম বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করতে আমাদের ভুল হয়নি। এছাড়া প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী ১০ লিটার পানি, প্লেট, বেড, লেপ ও বালিশ ইত্যাদি নিজ দায়িত্বে নিতে হয়।

সকাল থেকেই ছাত্রছাত্রীরা লঞ্চে অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে। সকাল সাড়ে আটটায় আমাদের সুন্দরবন সফরের কাণ্ডারী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী স্যারের আগমন ঘটে। লঞ্চে অবস্থান গ্রহণকারী এবং টার্মিনালে আগত ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা স্যারকে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে হাততালি দিতে থাকে। কেউবা বাঁশি বাজায়। পাঠ পরিক্রমার বাইরে এভাবে অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে স্যারকে পেয়ে অনেকেই স্যারের সাথে ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ফারুকী স্যারের নেতৃত্বে সুন্দরবন ভ্রমণের এই বিশাল আয়োজনে অংশগ্রহণ করেছিল ২৮২ জন ছাত্রছাত্রী, ৩৬ জন শিক্ষক আর কর্মচারীসহ প্রায় সাড়ে তিনশ মানুষ। এতো সংখ্যক লোকের খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থাসহ আমাদের যাত্রা যেন ছিল সিন্দাবাদের অভিযান। প্রকৃতি সব সময়ই মানুষকে কাছে টানে আপনবক্ষে।

যাত্রা হলো শুরু: কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে সদরঘাটের ৩ নং জেটী থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। দলনেতা প্রিন্সিপাল কাজী ফারুকী স্যারের অনুমতি নিয়ে তাকওয়া লঞ্চ এগুতে থাকে গন্তব্যের দিকে।

বুড়িগঙ্গার দুই পাড়ের অসংখ্য ভবন, ফ্যাক্টরী, লোকালয় আর কর্মব্যস্ত মানুষের কোলাহলপূর্ণ ঢাকা নগরীকে পিছনে ফেলে আমরা এগুতে থাকি গন্তব্যের ঠিকানায়। বুড়িগঙ্গার পর ধলেশ্বরী অতিক্রম করে শীতলক্ষার মোহনা হয়ে আমাদের লঞ্চ এসে পড়ে মেঘনা বক্ষে। সৃষ্টির এক অপূর্ণ খেলা আমাদের মনে জাগায় বিস্ময়। চাঁদপুরের আগে ষাটনল এর কাছে পদ্মা মেঘনার সঙ্গমস্থলে দুই রকম পানি দেখা গেল। মেঘনার পানি ঘোলা আর পদ্মার পানি পরিস্কার। এক নদীর পানি আরেক নদীর পানির সঙ্গে মিশছে না। কোন নৌযানের যাতায়াতে যদিও একদিকের পানি আরেকদিকে চলে যাচ্ছিল তথাপি কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার দুই ধরনের পানিই তাদের স্ব স্ব সীমানায় ফিরে আসছিল। রহস্যঘেরা তবুও মনে জাগে বিস্ময়। মনে পড়ে এ বিস্ময়ের অধিকর্তা সৃষ্টি কর্তা আল্লাহর কথা। দুপুর ১২টায় আমরা চাঁদপুর অতিক্রম করি। বিরতিহীনভাবে চলতে থাকে আমাদের লঞ্চ। লঞ্চ থেকে দেখা নদীতে ইলিশ ধরার দৃশ্য মনে জাগায় শিহরণ। বইয়ে পড়া কথা বিমূর্ত হয়ে উঠে চোখের পর্দায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে দিগন্ত রেখা বরাবর হারিয়ে যায়। নক্ষত্ররাজ সূর্য। রাতের শীতলতাপ বাড়তে থাকে। বাইরের প্রকৃতির দিকে চেয়ে থাকা চোখগুলো গুটি গুটি পদক্ষেপে ছাদ থেকে ডেক ও কেবিনে নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে আসে।

তিন তলার শীর্ষে নামাযের বন্দোবস্ত করা হয়। আর তিন তলার কেবিনে অধ্যক্ষ মহোদয় ও কয়েকজন শিক্ষকের থাকার ব্যবস্থা হয়। দোতলার বাম দিকের কেবিনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ, একজন ডাক্তার এবং ডানদিকে ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের থাকার ব্যবস্থা হয়। দোতলার ডেকের সমস্ত অংশে ছাত্ররা তাদের বিছানা পেতে নেয়। যারা সুবিধা করতে পারেনি তারা একতলার ডেকের সামনের দিকে কেন্টিন ও দোকানের সামনের উন্মুক্ত অংশ আপন ঠিকানা বরাদ্দ করে। সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কয়েকজন অনার্স এর ছাত্র দোতলার কেবিনের সামনের অংশের দিকে করিডোরে অবস্থান নেয়। এক তলার ডেকে পিছনের অংশে এক পাশে গরু, ছাগল, মুরগী এবং অন্যপাশে খাদ্যসামগ্রী ও খাবার পানির ড্রাম রাখা হয়। ডেকের সর্বশেষ অংশে রান্না বান্নার ব্যবস্থা হয়।

রাতের নিস্তব্ধতায় একে একে বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর প্রভৃতি জেলা পিছনে ফেলে লঞ্চ থেকে দৃশ্যমান বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত শহরগুলোকে বিদায় জানিয়ে কয়েকটি খাল, কীর্তনখোলা, গাবখান, কাউখালি, বান্ডাইরা, ইন্দুরকানী ও বলেশ্বর নদী দিয়ে শীতার্ত সকালে আমরা অতিক্রম করি বাগেরহাটের মোড়লগঞ্জ। কুয়াশাচ্ছন্ন সকালের সূর্যোদয় কাউকে আকৃষ্ট করতে পারেনি আপন সৌন্দর্যের মায়াজালে। তবু থেমে থাকেনি তার উদয়। উদিত সূর্য দূর করে দেয় নিঝুম রাতের ব্যথাতুর অন্ধকার। চলতে চলতে পশুর নদী দিয়ে এসে সকাল ১১ টায় আমরা মংলা পোর্টে পৌঁছি।

আমাদের সফরকে আনন্দদায়ক ও সহজ করতে হাইস্পীড কোম্পানী আমাদেরকে একটি স্পীডবোট দিয়েছিল। সফরে বিভিন্নভাবে আমরা উপকৃত হয়েছিলাম বোট টির মাধ্যমে। বনবিভাগের নিয়ম অনুযায়ী সুন্দরবনে প্রবেশের জন্য পোর্টের অনতিদূরে বনবিভাগের ঢাংমারি অফিস থেকে সশস্ত্র আনসার সাথে নিতে হয়।

সুন্দরবনের পথেঃ মংলা বন্দর অতিক্রম করার পর থেকেই আমরা সুন্দরবনের গভীরে প্রবেশ করতে থাকি। গাছপালা আর প্রকৃতির ধরন পাল্টাতে থাকে। স্রষ্টা কি এক বিচিত্র অনুভূতি মানব মনে সৃষ্টি করে রেখেছেন। বিগত দেড় দিনের সফরে লঞ্চ থেকে নানা প্রকৃতির গাছপালা দেখেও আমাদের মনে সুন্দরবনের অনুভূতি কমেনি। কিন্তু সুন্দরবনের গাছপালা আমাদের মনে জায়গা নেয় ভিন্ন এক আমেজ। আবেগময় এক স্বতন্ত্র অনুভূতি। সুন্দরবণ শুরু হয়েছে শুনে লঞ্চের সমস্ত জায়গায় ছাত্র শিক্ষকরা হুড়মুড় করে একদিকে এসে বনরাজ সুন্দরবনের সৌন্দর্য্য উপভোগ করে মিটাতে থাকে নয়ন তৃষ্ণা। ঝোপঝাড় আর ঘন গাছপালাময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমরা এগুতে থাকি। ইতোমধ্যেই দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়। বেলা সাড়ে ৫ টায় আমরা সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্ট এলাকায় পৌঁছি।

হিরণ পয়েন্ট ও নীলকমলেঃ হিরণ পয়েন্ট সুন্দরবনের গভীর অরণ্যের একটি। বন বিভাগের হিরণ পয়েন্ট রেষ্ট হাউজের পাশেই রয়েছে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর একটি ঘাঁটি। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বহনকারী নৌ বাহিনীর কয়েকটি বড় বোট এ অঞ্চলে সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। তাই টহল বোটগুলো দ্রুত ছুটাছুটি করছিল চারদিকে।

নদীতে ভাটা থাকাতে আমাদের বিশাল লঞ্চটি নদী থেকে খালের চ্যানেলের ভিতর হিরণ পয়েন্ট জেটীতে ঠুকতে রাত ১০টা বেজে যায়। সবাই রাতে লঞ্চে জেটীতেই অবস্থান করি। রোজ দুবেলা জোয়ার হয় বন এলাকায়। গভীর রাতে পরবর্তী ভাটার আশংকায় লঞ্চ জেটী থেকে আবার মাঝ নদীতে নোঙ্গর করে। কিন্তু সামুদ্রিক দমকা বাতাস আর ঢেউ বিরাটকায় হওয়া সত্ত্বেও লঞ্চটিকে দোলাতে থাকে ভীষণভাবে। ঘুমিয়ে থাকা অভিযাত্রীদলের ঘুম ভেঙ্গে যায় আঁতকে উঠে সবাই। আশংকা দেখা দেয় বাতাসের তোড়ে গভীর সমুদ্রের হারিয়ে যাবার। অগত্যা লঞ্চটি ফিরে এসে জেটী এলাকায় চ্যানেলের স্বল্প পানিতেই কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থান নেয়।

হিরণ পয়েন্টে সোনালী সূর্যের উদয়ে সবাই আমোদিত হয়ে বেরিয়ে আসে জেটিতে অথবা লঞ্চের ছাদে। নীলকমল অভয়ারণ্যের অধীন হিরণ পয়েন্ট এলাকা প্রচুর সংখ্যক হরিণের চারণভূমি। প্রথম বারের মতো আমরা জঙ্গলে হরিণ দেখে আনন্দে আহলাদিত হই। এ যেন ছিল পরম পাওয়া-সুন্দরবন সফরের স্বার্থকতা যেন হরিণ দেখতেই। সকাল আর বিকালে সুন্দরবনের নদীর পাড়ে হরিণের মেলা বসে। স্পীডবোটটি নদীর পাড়ে ঘুরে ঘুরে

ঘাস খাওয়া ও খেলাধূলারত সুন্দরবনের সৌন্দর্য চিত্রল হরিণকে ক্যামেরাবন্দী করি। নদী থেকে দেখা কেওড়া বন আর গোলপাতা মনে জাগায় এক সতেজ অনুভূতি। সারাদিন আমাদের লঞ্চটি পাশাপাশি অবস্থিত নীলকমল ও হিরণ পয়েন্ট জেটীদ্বয়ে অবস্থান করে। ফারুকী স্যারের সঙ্গে আমরা নিলকমল কেন্দ্রের বিশ্ময় নামক ওয়াছ টাওয়ারে যাই বোটে করে। ছাত্ররাও বিভিন্ন নৌকায় সরু নদীপথে ঘুরে ফিরে সুন্দরবন দেখতে থাকে। এদিন দুপুরে আমরা সবাই এক বনভোজনের আয়োজন করি। একদিকে সুন্দরবন ভ্রমণ, অন্যদিকে বনভোজন বিপুল আনন্দের সম্ভারে সমৃদ্ধ করে সবার মন। পিকনিক শেষে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ছাত্ররা বনের ভিতরে ঘুরতে যায়।

দুবলার চর: প্রিয় ফারুকী স্যার, আরো কয়েকজন শিক্ষক স্পীডবোটে করে দুবলা কেন্দ্র অফিসে যান এবং কর্মকর্তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। ৫৭ হাজার একর জমির এই চরটি শুঁটকি মাছের জন্য প্রসিদ্ধ। জেলেরা কার্তিক মাসের প্রথমেই এখানে আসে এবং মাঘ মাসের শেষের দিন চলে যায়। এ সময় তারা মাছ ধরে এবং সেগুলো রোদে শুকায়।

রূপচান্দা, চড়ি, চিংড়ি, লটিয়া, ফাইসা, ফাত্রা, দাবলি, পোমা, ককিলা, কুন্তি, মর্মা ইত্যাদি নানা জাতের মাছ ধরে তারা। এই মাছ বাছাই ও শুকানোর কাজে নিয়োজিতদের স্থানীয় নাম ডোলাসাংগা।

সকালে পুনরায় ছাত্র-ছাত্রীরা দুবলার চরে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পায়। সকালের নোনারোদে চরের বালু আর সমুদ্রের পানি ঝিকমিকিয়ে কথা কয়ে উঠে। অপরূপ লাগে চরের সৌন্দর্য। জেলেরা তাদের কাজ কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একটু বেলা উঠতেই আমাদের ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে পড়ে যায় শুটকি কেনার ধুম। ছুরি, রূপচান্দা, চিংড়ি, তপসে, লইট্যা প্রভৃতি শুটকি মাছ লঞ্চে উঠে আসে প্রচুর। অনেকে সাগর পাড়ে ঝিনুক খুঁজে বেড়ায়। দুবলা কেন্দ্র অফিসের পাশের অস্থায়ী চায়ের দোকানে দেখা যায় অনেককে। এমন পরিবেশে চা নাস্তা খেতে পারার মধ্যে আছে ভিন্ন স্বাদের অনুভূতি। অফিসের পিছনে একটু দূরে রয়েছে সাইক্লোন সেন্টার। অনেকেই সেখানে ছবি তুলতে যায়। কিন্তু এর বেশি যাবার কারো সাহস হয়নি। কেননা সচরাচর বাঘের দেখা না মিললেও সাইক্লোন সেন্টারের আশে পাশে বাঘের পায়ের ছাপ দেখেছে অনেকেই। দুবলা থেকে ফারুকী স্যার কাদা মাটিতে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পায়ের শুকনো ছাপ সংগ্রহ করে ঢাকা কমার্স কলেজের সংগ্রহশালার সমৃদ্ধিতে নতুন মাত্রা যোগ করেন।

কটকায়: বেলা সোয়া ১০ টায় দুবলার চর থেকে আমরা কটকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সাড়ে ১২ টায় কটকা এসে পৌঁছি। সুন্দরবনের দর্শনীয় স্থান ও স্পটগুলোর মধ্যে কটকার সৌন্দর্য স্বতন্ত্র। সুন্দরবনের মোট হরিণের প্রায় ২৫ শতাংশ এবং বাঘের প্রায় ২০ শতাংশের বাস এই কটকা অঞ্চলে। কটকা রেষ্ট হাউজে ফারুকী স্যার গোসল করে বিশ্রাম নেন। ছাত্রদেরকেও লঞ্চ থেকে নামতে ও গোসল করতে অনুমতি দেয়া হয়। একটি কথা উল্লেখ্য যে, সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল হওয়াতে সুন্দরবন অঞ্চলে খাবার পানির সংকট তীব্র। প্রতিটি রেষ্ট হাউজ অথবা বন কর্তৃপক্ষের অফিসের নিকটে একটি মিঠা পানির পুকুরের অবস্থান আমরা লক্ষ্য করেছি। কর্তৃপক্ষ পুকুরের পানি যেমন খাবার পানি হিসাবে ব্যবহার করেন তেমনি পুকুর থেকে পানি তুলে অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করেন। ছাত্ররা শিক্ষকদের নির্দেশ অনুযায়ী বনবিভাগের বিধি মোতাবেক রেষ্ট হাউজের পানি ব্যবহার করে। ইতোমধ্যেই লঞ্চে দুপুরের খাবার দেয়া হয়। খাবারের পরপরই বিভিন্ন শিক্ষকের নেতৃত্বের ২০ জন করে ছাত্র-ছাত্রী রেষ্ট হাউজের কাছাকাছি বনে ঘুরে বেড়ায়। ছাত্রদের একটি গ্রুপ বাঘ দেখার আশায় বনের অনেক গভীরে চলে যায় অসম্ভব সাহস দেখিয়ে। কিন্তু অনেক ঘুরেও তাদের সাথে কোন বাঘের দেখা মিলেনি। তবে কাদামাটিতে বিভিন্ন স্থানে তারা বাঘের পায়ের চিহ্ন দেখতে পান। বনের ভিতরে হরিণের একটি শিং তারা খুঁজে পান। খুব কাছ থেকে উন্মুক্ত বনে হরিণ দেখা এবং নিজ হাতে হরিণকে পাতা খাওয়ানোর সৌভাগ্য হয় এ দলের।

নকল বাঘের ডাক ও রক্তাক্ত হরিণ: নকল বাঘের ডাক ও রক্তাক্ত হরিণঃ গভীর রাত্রে বাঘের ডাক শুনে শিক্ষকগণ কটকা নামতে নিষেধ করে, এমনকি বন বিভাগের লোকজন খুব সাবধানে বলে গেলেন বাঘ উপরে আসছে, যাতে ছাত্র ছাত্রীরা সাবধানে চলাফেরা করে। পরে জানা

গেল একজন ছাত্রের কাজ সে মুখ দিয়ে বাঘের ডাক দিয়েছে। জামতলা বিচ এলাকায় আমরা সারিবদ্ধভাবে হাটছিলাম হঠাৎ একটি রক্তাক্ত হরিণ মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মনে হয় কেবলই বাঘ তাকে আক্রমণ করেছে অতএব যে যেভাবে পারো জীবন বাঁচাও।

টাওয়ার ও জামতলা বিচঃ রেষ্ট হাউজের সম্মুখস্থ চ্যানেল (খালের মতো সরু) এর অপর পাড়ের কটকা পর্যবেক্ষণ টাওয়ারটি স্থানীয় জেলেদের ভাষায় জামতলা টাওয়ার নামে পরিচিত। টাওয়ার থেকে বহুদূর বিস্তৃত মাঠ বা বন সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। মাঠে সুন্দরবনের সুন্দরের প্রতীক হরিণের বিচরণ বনের সৌন্দর্যকে দেয় বাড়তি শোভা। ফারুকী স্যার এবং কয়েকজন শিক্ষক টাওয়ারে উঠে সুন্দরবনের সৌন্দর্য অবলোকন করেন। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা এখানের বিচে পা ভিজিয়ে নিতে ভুল করেননি। যাতায়াতের পথটুকু সর্বদা মনে হয়, এই বুঝি বাঘ আসলো এতোটা ভয়ংকর।

কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতেঃ বেলা আড়াইটার দিকে আমরা মহীপুর পৌঁছি। মহীপুর বাজার থেকে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের দূরত্ব প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। কুয়াকাটা যাবার জন্য প্রতি শিক্ষকের নেতৃত্বে ১০ জন ছাত্রকে দেয়া হয়। ছাত্রীদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন শিক্ষিকাবৃন্দ।

বিকালের মধ্যেই সবাই কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে পৌঁছে যাই। পাঁচ দিনের একটানা ভ্রমণ শেষে কিচুটা ক্লান্ত ছাত্র-শিক্ষকরা এখানে যেন প্রাণের স্পন্দন ফিরে পায়। অনেকেই সমুদ্রে আবগাহন করে। তারুণ্যের উচ্ছলতায় সামুদ্রিক অবগাহনে শীতলতা আসে প্রাণে। যেন কুয়াকাটায় এসেছে বাংলাদেশ উপকুলে সমুদ্রের সাথে সূর্যের মিতালী পর্যবেক্ষণ কতে। সময়ে সাথে সাথে সূর্য সমুদ্রে ডুবে যাবার প্রস্তুতি নেয়। তাকওয়ার যাত্রীরা সব উঠে আসে তীরে সূর্যাস্ত দেখার জন্য। শ দুয়েক ক্যামেরা সূর্যাস্তকে লক্ষ্য করে ক্লিক ক্লিক শব্দে সচল হয়ে উঠে। কুয়াকাটায় সর্যাস্তের দৃশ্য দেখা যেন জীবনের এক পরম পাওয়া। সৌন্দর্যময় প্রকৃতিতে স্রষ্টার সৃষ্ট অনন্ত সৌন্দর্য ধারায় এ যেন এক স্বতন্ত্র সত্ত্বা। সূর্যাস্তের সাথে সাথে তারুণ্যের উচ্ছলতায় উজ্জীবিত সৈকত হারিয়ে যেতে থাকে অন্ধকারে। কোলাহলের ঘটে অবসান। সবাই ফিরে আসে লঞ্চে। শুধু ঢেউগুলো এক এক করে আছড়ে পড়ে বালির সমুদ্র তীরে।

নিঃশব্দ ডটকমঃ প্রথম ও দ্বিতীয় দিন ছাত্র-ছাত্রীদের মনমুগ্ধকর বিভিন্ন কর্মসূচিতে আমরা আনন্দ করি তারপরও মনে হলো কমতি আছে। অতএব শিক্ষকবৃন্দের নিঃশব্দ ডটকম নামে একটি দল সামনে হতে লঞ্চে উঠবে ঘোষণা করে। সকলেরই জিজ্ঞাসা কারা উঠবে। তারা আর কেউ নয় আমাদের শিক্ষকদের আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবাইকে মুগ্ধ করে। বহুবার ভ্রমণ করে ও ঐ আনন্দ আর পাই না। শিক্ষকদের উপস্থিত কার্যক্রমে ফারুকী স্যার মতিয়ুর রহমান স্যার খুবই খুশী হয়েছেন।

নদী তীরে আপ্যায়নঃ নদীর তীরে পটুয়াখালী বরিশাল, কুয়াকাটা, গাবখান চ্যানেল ইত্যাদি এলাকায় ভ্রমণের কাঁচা শাক সবজির প্রয়োজনে লঞ্চ থামাতে হতো। এই সময় ফারুকী স্যার চোট কলা, মুরি, নারিকেল, চা, মিষ্টি আমাদের আপ্যায়ন করাতেন যা ভুলবার নয়। মনে হতো বাবার মতোই আমাদের প্রয়োজন বুঝতেন।

কঠোর নিয়মঃ ফারুকী স্যারের ভ্রমণের মূল চালিকা শক্তি হলো নিয়ম কানুন। যা ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারী সকলকে মানতে বাধ্য করা। ধরুন সকাল ৮:০০ লঞ্চ ছাড়ার কথা ঠিক টাইমে লঞ্চ ছাড়লো। এমন ও দেখা গেলো সিনিয়র কয়েকজন শিক্ষক নৌকা, স্পীট বোর্টে কষ্ট করে লঞ্চ ধরলেন এবং স্যারের অনেক বকাবকি শুনলেন। আবার, বলা হলো কুয়াকাটা হতে সন্ধ্যা ৮:০০ লঞ্চ ছাড়বে, তাই হলো পাঁচ জন শিক্ষক রেখে।

এভাবে ঘোরের মধ্যে কিভাবে যে ৭টি দিন পার হয়ে গেল টেরই পাইনি। শুধু মনে হচ্ছিল এ ভ্রমণ যদি শেষ না হতো-আজও খুব মিস্ করি সেই সুন্দরবন ভ্রমণ। এখনও মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি ফারুকী স্যারের মত কাণ্ডারীকে নিয়ে সুন্দরবনে সেই ম্যানগ্রোভের দেশে যাওয়ার।

৬৪ জেলার নামকরণের ইতিবৃত্তঃ

মোঃ নজরুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক, সাচিবিক বিদ্যা বিভাগ

বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি যার রাষ্ট্রীয় বা সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাবসানের পর ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামে যে রাষ্ট্রটির সৃষ্টি হয়েছিল তার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ ছিল পূর্ব পাকিস্তান যা বর্তমানে আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ। এ দেশটি এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের একটি ছোট্র রাষ্ট্র। অবস্থান অনুযায়ী বাংলাদেশের তিন দিকে ভারত, পূর্ব-দক্ষিণে মায়ানমার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসগর। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে ৯৪তম; যার আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল। আর জনসংখ্যায় বিশ্বের জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম; যার বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ষোল কোটি। এছাড়াও বাংলাদেশ বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর একটি যার বর্তমান রূপ প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০৫৫ জন। বাংলাদেশের সর্ব উত্তরে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর, দক্ষিণে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ থানার ছেঁড়াদ্বীপ, পূর্বে বান্দরবান জেলার থানচি থানার আখাইনঠং এবং পশ্চিমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার মনাকশা স্থলবন্দর অবস্থিত। স্থানের নাম সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে শহরের তথ্য পেলেও গ্রাম সম্পর্কে তেমন নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য না পেয়ে প্রায় গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ ঐক্যমত হয়েছেন যে, 'Man made Town & God made Village.' এবার জেনে নেয়া যাক বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার (বিভাগওয়ারী) নামের ইতিবৃত্তঃ

রাজশাহী বিভাগ

বাংলাদেশের ৩য় বিভাগ হিসেবে রাজশাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালে। এ বিভাগের আয়তন ১৮,১৭৭ বর্গ কি.মি.। মোট জনসংখ্যা ১,৯২,২৫,৯০৯জন। মোট জেলার সংখ্যা ৮টি, উপজেলা-৬৭টি, ইউনিয়নের সংখ্যা ৫৬৪টি, গ্রামের সংখ্যা ১৪,০৭৫টি এবং সংসদীয় আসনের সংখ্যা ৩৯টি। সর্ববৃহৎ জেলা নওগাঁ এবং ক্ষুদ্রতম জেলা জয়পুরহাট। এ বিভাগের জেলাগুলো হলো:

১. রাজশাহী জেলা: মৈএ'র মতে, নাটোরের রাণী ভবানীর দেয়া নাম রাজশাহী। অবশ্য মি: গ্রান্ট-এর মতে, রাণী ভবানীর জমিদারীকেই 'রাজশাহী' বলা হতো এবং এই চাকলার বন্দোবস্তের কালে রাজশাহী নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। পদ্মার উত্তরাঞ্চল বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে পাবনা পেরিয়ে ঢাকা পর্যন্ত এমনকি নদীয়া, যশোর, বর্ধমান, বীরভূম নিয়ে এই এলাকা রাজশাহী চাকলা নামে অভিহিত হয়। অনুমান করা হয় 'রামপুর'এবং বোয়ালিয়া নামক দুটি গ্রামের সমন্বয়ে রাজশাহী শহর গড়ে উঠেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে 'রামপুর-বোয়ালিয়া' নামে অভিহিত হলেও পরবর্তীতে রাজশাহী নামটিই সর্বসাধারণে পরিচিতি লাভ করে। এই নামকরণ নিয়ে অন্য কল্পকাহিনীও রয়েছে। সাধারণভাবে বলা হয় এই জেলায় বহু রাজা-জমিদারের বসবাস, এজন্য এ জেলার নাম হয়েছে রাজশাহী। কেই বলেন রাজা গণেশের সময় (১৪১৪-১৪১৮) রাজশাহী নামের উদ্ভব।

এই জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৭২ সালে। মোট উপজেলার সংখ্যা ৯টি। এ জেলার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে শারদা পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বরেন্দ্র জাদুঘর,পুঠিয়া রাজবাড়ী, হযরত শাহ মখদুম (র.) এর মাজার, সোনা মসজিদ তালন্দ শীব মন্দির, গোপাল মন্দির, রেশম গবেষনা কেন্দ্র ইত্যাদি। আত্রাই, মহানন্দা ও পদ্মা এই জেলার প্রধান তিনটি নদ-নদী। এই জেলার আয়তন ২,৪০৭ বর্গ কিলোমিটার।

২. চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা: 'চাঁপাইনবাবগঞ্জ' নামটি সাম্প্রতিকালের। এই এলাকা নবাবগনঞ্জ নামে পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলটি ছিলো প্রচীন মুর্শিদাবাদের নবাবদের বিচরণ স্থান। সংগত কারণেই নবাবদের স্মৃতিধন্য স্থানটির নাম হয় নবাবগনঞ্জ। নবাব আলী বর্দী খাঁর আমলে এই নামকরণের কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল। নবাব আমলে মহেশপুর গ্রামে চম্পাবতী মতান্তরে চম্পারাণী বা চম্পাবাঈ নামে এক সুন্দরী বাঈজী বাস করতেন। তাঁর নৃত্যের খ্যাতি আশে-পাশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি নবাবের প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠেন। তাঁর নামানুসারে এই জায়গার নাম হয় চাঁপাই। আবার অন্য মতে, এ অঞ্চলে রাজা লখিন্দরের বাসভূমি ছিল। লখিন্দরের রাজধানীর নাম ছিল চম্পক। এই চম্পক নাম থেকে পরিবর্তীত হয়ে নাম হয়েছে চাঁপাই। আবার কোনো কোনো গবেষক চাঁপাইকে বেহুলার শ্বশুরবাড়ি চম্পকনগর বলে স্থির করেছেন এবং মত দিয়েছেন যে, চম্পক নাম থেকেই চাঁপাই নামের উৎপত্তি। এই চাঁপাই এবং নবাবগঞ্জ মিলে হয়েছে আজকের চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

এই জেলার উপজেলা সংখ্যা ৫টি। এর প্রতিষ্ঠা কাল হলো ১ মার্চ ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দ। পদ্মা ও মহানন্দা এর প্রধান ২টি নদী। সোনা মসজিদ, নাচোল রাজবাড়ী, আম গবেষনা কেন্দ্র এর উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান। এ জেলা আমের জন্য বিখ্যাত। এ জেলার মোট আয়তন ১৭০৩ বর্গ কিলোমিটার।

৩. নওগাঁ জেলা: 'নওগাঁ' নামের গ্রাম থেকে নওগাঁ নামের উৎপত্তি। নওগাঁ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে নও (নতুন) ও গাঁ (গ্রাম) শব্দ থেকে। শব্দ দুটি ফরাসী। নওগাঁ শব্দের অর্থ হলো নতুন গ্রাম। আবার কারো কারো মতে, 'সন্নিহিত নয়টি চক' বা জনবসতির সমন্বয়ে গঠিত 'নয়গাঁ'। কাল ক্রমে এই নয়গাঁ নামটি পরিবর্তিত হয়ে নওগাঁ হয়েছে।

মোট ১১টি উপজেলার সমন্বয়ে এই জেলা গঠিত। আত্রাই নদীর তীরে গড়ে ওঠা এই শহরটি ১ মার্চ ১৯৮৪ সালে জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ জেলার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, সোমপুর মহাবিহার,জগদল মহাবিহার, হলুদ বিহার,সত্যপীরের ভীটা , কুসুম্বা মসজিদ,কসবা মসজিদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নওগাঁ চালের জন্য বিখ্যাত।

৪. নাটোর জেলা: জনশ্রুতি আছে এই নগরের কোনো এক স্থানে ব্যাঙ সাপকে গ্রাস করেছিল এবং তা দেখে অদূরে কয়েকজন বালিকা নৃত্য করেছিল। এই নৃতকে উপলক্ষ্য করে এই স্থানের নাম করা হয় নাট্যপুর। কালক্রমে এই নাট্যপুর শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে নাট্যপুর/ নাটুর/ নাটাপুর থেকে নাটোর হয়েছে। আরেকটি জনশ্রুতি হলো, এখানকার জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় আমোদ-প্রমোদের জন্য গড়ে উঠেছিল বাইজিবাড়ি, নটিপাড়া জাতীয় সংস্কৃতি। এই নটিপাড়া থেকে নাটোর শব্দের উৎপত্তি হতে পারে বলে ধারণা করা হয়। অন্য মতে, নাটোর জেলার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে নারদ নদী। কথিত আছে এই নদীর নাম থেকেই 'নাটোর' শব্দের উৎপত্তি। নাটোর অঞ্চল নিম্নভূমি হওয়ায় চলাচল করা ছিল প্রায় অসম্ভব। জনপদটির দূর্গমতা বোঝাতে বলা হতো নাতোর- যার অর্থ দূর্গম। ভাষা গবেষকদের মতে, নাতোর নামক মূল শব্দটি উচ্চারণগত কারণে পরিবর্তীত হয়ে নাটোর নামের উৎপত্তি হয়েছে।

এই জেলার মোট আয়তন ১৮৯৬ বর্গকিলোমিটার। ৬টি উপজেলার সমন্বয়ে এ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দে। আত্রাই, বড়াল ও তুলসি এ জেলার প্রধান তিনটি নদী। এ জেলার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে উত্তরা গণভবণ (দীঘাপতিয়া রাজবাড়ী), নাটোর রাজবাড়ী, বাংলাদেশের সর্ববৃহত চিনির কল নর্থবেঙ্গল সুগারমিল্, সর্ববৃহৎ বিল চলন বিল, কাদিরাবাদ সেনানীবাস, বাংলাদেশের উষ্ণতম স্থান লালপুর ইত্যাদি। নাটোরের কাঁচাগোল্লা বাংলাদেশ বিখ্যাত।

৫. পাবনা জেলা: পাবনা নামকরণ নিয়ে কিংবদন্তির অন্ত নেই। ধারণা করা হয় যে, গঙ্গার 'পাবনী' নামক পূর্বগামিনী ধারা হতে পাবনা নামের উৎপত্তি হয়েছে। অপর সূত্র মতে, 'পাবন' বা 'পাবনা' নামের একজন দস্যুর আড্ডাস্থলই একসময় পাপবনা নামে পরিচিতি লাভ করে। অপর দিকে কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন, 'পাবনা' নাম এসেছে 'পদুম্বা' থেকে। কালক্রমে 'পদুম্বাই স্বরসঙ্গিত রক্ষা করতে গিয়ে বা শব্দগতব্যুৎপত্তি হয়ে পাবনা হয়েছে। আবার বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক কানিংহামের ধারণা মতে প্রাচীন রাজ্য 'পুন্ড্র'বা পুন্ড্রবর্ধনের নাম থেকে পাবনা নামের উৎপত্তি হয়েছে। ৯টি উপজেলার সমন্বয়ে এ জেলা ১৮৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পদ্মা, যমুনা,আত্রাই, বড়াল, ইছামতি এ জেলার প্রধান ৪টি নদী। হেমায়েতপুর মানসিক হাসপাতাল (পাগলা গারদ), হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, চাটমোহর শাহী মসজিদ, জগন্নাথ মন্দিরসমূহ এ জেলার ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত স্থান। মিল্কভিটার অধিকাংশ দুধ এ জেলা থেকে সংগ্রহ করা হয়।

৬. সিরাজগঞ্জ জেলা: বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সময় নবাব আমলে জমিদার সিরাজ আলী চৌধুরী সিরাজগঞ্জ শহরের গোড়া পত্তন করেন এবং জেলা প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন একটি 'গঞ্জ' নির্মাণ করেন। এক সময় সিরাজ নামের সাথে গঞ্জ যুক্ত হয়ে এ জেলার নাম হয় সিরাজগঞ্জ।

উল্লেখ্য যে, সিরাজ আলী ছিলেন নবাব মুর্শীদ আলী খাঁর পীর হযরত শাহ সুফী আফজার মাহমুদ এর বংশধর। যার বংশধর আজও বিদ্যমান। ৯টি উপজেলার সমন্বয়ে এ জেলা ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। যমুনা, করতোয়া ও বড়াল এ জেলার ৩টি প্রধান নদী।

৭. বগুড়া জেলা: ১৮২১ সালে করতোয়া নদীর তীর ঘেষে গড়ে উঠে বগুড়া শহর তথা বগুড়া জেলা। ১২৮১-১২৯০ খ্রিস্টাব্দে দিলির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান মাহমুদ নাসির উদ্দিন বগরা খান বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি শাসক হিসেবে খুব দ্রুত সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বগরা খান নামক এই সুশাসকের নাম অনুযায়ী এই জেলার নামকরণ করা হয় বগ্রা/বগড়া তথা আজকের বগুড়া।

এর আয়তন ২৯২০ বর্গকিলোমিটার। উল্লেখ্য ১৮৭৬ খৃ.প্রতিষ্ঠিত বগুড়া পৌরসভা আয়তন ও ভোটারের দিক থেকে দেশের বৃহত্তম। এর আয়তন প্রায় ৭০ বর্গকিলোমিটার এবং ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ১১ হাজার ৭১১ জন। মোট উপজেলা ১২টি। নাগর, বাঙ্গালী, করতোয়া এবং যমুনা এ জেলার প্রধান নদ-নদী। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন ৩য় বৃহত্তম সভ্য নগরী হলো এই বগুড়ার পন্ড্র নগর তথা মহাস্থান গড়। মধ্য তথা দক্ষিণ এশিয়ার ১ম বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়ে ওঠে বগুড়ার ভাসুবিহারে। এই জেলার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে মাহী সাওয়ার

সুলতান বলখী (র.) এর মাজার ও স্মৃতি বিজড়িত মহস্থান গড়, বেহুলা-লক্ষীন্দরের বাসরঘর, বৈরাগীর ভিটা, গোবিন্দ ভিটা, খোদার পাথর ভিটা, শীলাদেবীর ঘাট, বিহার ধাপ, ভাসু বিহার, মুনির ঘুন, পরশুরামের প্রাসাদ ইত্যাদি। এ জেলার মিষ্টি ও দই জগৎ বিখ্যাত।

৮. জয়পুরহাট জেলা: গৌড় পাল ও সেন রাজার রাজত্ব ছিলো জয়পুরহাটে। ভারত বর্ষের ইতিহাস থেকে জানা যায় ধর্মপাল দীর্ঘদিন নওগাঁ ও জয়পুরহাট নিয়ে রাজত্ব করেন। ধর্মপালের পর তার দ্বিতীয় ভ্রাতৃদ্বয় দেবপাল রাজা হয়। দেবপালের পর পাল রাজ বংশের রাজা হয় জয়পাল। তৎকালীন সময়ে ১৮০০ সালের দিকে রাজা জয়পালের নামানুসারে এই জেলার নাম হয় জয়পুরহাট। তার পূর্বে এর নাম ছিলো গোপেন্দ্রগঞ্জ। ১৮৫৭ থেকে ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ১৮৮৪ সালে জলপাইগুড়ি হতে কলকাতা পর্যন্ত ২৯৬ মাইল রেললাইন স্থাপন করা হয় এবং মালামাল রপ্তানির জন্য ৪-৭ মাইল পর পর স্টেশন স্থাপন করা হয়। এই সময় ভারত বর্ষে পূর্বেই আরেকটি জয়পুর স্টেশন ছিল যা এখনো রয়েছে। তাই ভারত সরকার সে সময় জয়পুরের সঙ্গে হাট যুক্ত করে জয়পুরহাট স্টেশন নামকরণ করে সেই অনুসারে জেলার নামকরণ জয়পুরহাট বলেই প্রচলিত হয় ও সরকারি রেজিস্টারেও যুক্ত হয়। হাট যুক্ত করার কারণ হচ্ছে জয়পুরহাট স্টেশনের পাশেই ছিলো ছোট যমুনা, যেখানে বসতো মূল বাজার। এই বাজারকে বলা হতো যমুনার হাট যা পরবর্তীতে হযে যায় জয়পুরহাট। বগুড়া জেলার মহকুমা ছিলো জয়পুরহাট। ১৯৮৪ সালে ৫টি উপজেলার সমন্বয়ে ৯৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে তুলসীগঙ্গা, হারাবতি ও যমুনা নদীর তীরে গড়ে উঠে এ জেলা। এখানে একটি চিনিকল আছে। তাছাড়া রাজা জয়গোপালের রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ, ভীমের পান্টি, নিমাই পীরের দরগাহ হলো এ জেলার দর্শনীয় স্থান।

রংপুর বিভাগ

বাংলাদেশের সপ্তম বিভাগের নাম রংপুর বিভাগ। এ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় জুলাই ১৩, ২০০৯ সালে এবং এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয় ১ জুন ২০১০ খৃ.। এ বিভাগের সর্ব উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিনে খুলনা ও ঢাকা বিভাগ, পূর্বে ঢাকা বিভাগ, ভারতের আসাম ও মেঘালয় রাজ্য এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। মোট আয়তন ১৬,৩১৭ বর্গকিলোমিটার এবং মোট জনসংখ্যা ১,৬৪,১২,২৮৭ জন। এ বিভাগের মোট গ্রাম ৯,০৫০টি, ইউনিয়ন ৫৩৯, উপজেলা ৫৮টি, সংসদীয় আসন ৩৩টি এবং মোট জেলার সংখ্যা ৮টি। বর্তমানে রংপুর একটি সিটি কর্পোরেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বিভাগের জেলাগুলো হলো:

৯. রংপুর জেলা: তিস্তা নদীর অববাহিকা ও চর অঞ্চলকে নেপালী ভাষায় 'রঙ্গ" বলে। কোন এক সময় নেপালীগণ এ অঞ্চলে আগমন করে বসবাস শুরু করলে এ অঞ্চলের নাম রঙ্গ-পুর থেকে বিবর্তন হয়ে রংপুর হয়েছে।

এ জেলার আয়তন ২৩০৮ বর্গকিলোমিটার। এ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬ ডিসেম্বর ৮৬৯ খৃ.। মোট উপজেলা ৮টি যথা: রংপুর সদর, গঙ্গাচড়া, তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ, কাউনিয়া, পীরগাছা, মিঠাপুকুর ও পীরগঞ্জ। তিস্তা, যমুনাশ্বরী, ঘাঘট ও আকিয়া এর প্রধান নদ-নদী এবং ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে কারমাইকেল কলেজ, পায়রাগঞ্জ বেগম রোকেয়ার বাড়ি, মন্তনার জমিদার বাড়ি, রংপুর জাদুঘর, ইসলামী ব্যক্তিত্ব মৌলানা কেরামত আলীর জৈনপুরির মাজার, মিঠা পুকুর, চন্দনহাট মন্দির ইত্যাদি। বউ পিয়ারী বা বউ পাগলা আম এ জেলার বিখ্যাত ফল।

১০.গাইবান্ধা জেলা: জনশ্রুতি আছে এই জনপদে একসময় ইতিহাসখ্যাত রাজার গো-চারণ ভূমি ছিল। এই গো-চারণ ভূমিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে এ জনপদের নামকরণ গাইবান্ধা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এ জেলার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৮৪ খৃ.। এর মোট আয়তন ২১৯৭ বর্গকিলোমিটার। ৭টি উপজেলাগুলো হলো গাইবান্ধা সদর, সাদুল্যাপুর, গোবিন্দগঞ্জ, সাঘাটা, ফুলছড়ি, সুন্দরগঞ্জ ও পলাশবাড়ি। এ জেলার উপর দিয়ে করতোয়া, কাটাখালী, ঘাঘট, তিস্তা ও ব্রক্ষপুত্র নদী বয়ে গেছে। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান গুলোর মধ্যে নলডাংগা ও বামন ডাংগার জমিদার বাড়ি, বর্দ্ধনকুঠি, গোবিন্দগঞ্জ, মীরের বাগান, শাহ সুলতান গাজীর মসজিদ অন্যতম।

১১. কুড়িগ্রাম জেলা: ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, মহারাজ বিশ্বসিংহ কুড়িটি জেলে পরিবারকে উচ্চ শ্রেণিতে হিন্দুরুপে স্বীকৃতি দিয়ে এ অঞ্চলে প্রেরণ করেন। এ কুড়িটি পরিবারের আগমনের কাহিনী থেকে এ জেলার নামকরণ করা হয়েছে কুড়িগ্রাম। আবার ভিন্ন মতে "কুঁড়ি" নামক উপজাতির গ্রাম বলে এ জেলার নাম হয়েছে কুড়িগ্রাম।

২২৯৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে ৯টি উপজেলার সমন্বয়ে ১৯৮৪ সালে এ জেলা গঠিত হয়। কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুর, চীলমারী, নাগেশ্বরী, ভুরঙ্গমারী, রাজিবপুর, রাজারহাট, ফুলবাড়ি ও রৌমারী। এর চার দিকে তিস্তা, ধরলা ও ব্রক্ষপুত্র নদী রয়েছে। ঐতিহাসিক স্থানগুলোর মধ্যে জয়মনির জমিদার বাড়ি, উলিপুরের কালী সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির, পাংগেশ্বরী রাজবাড়ি ও মন্দির এবং মোগল আমলে নির্মিত রাজারহাট ও পাটেশ্বরী মসজিদ ইত্যাদি।

১২. লালমনিরহাট জেলা: বিপ্লবী কৃষক নেতা নুরুলউদ্দিন-এর ঘনিস্ট সাথী লালমনি নামে এক ধনাঢ্য মহিলা ছিলেন। যিনি সর্বশক্তি দিয়ে এদেশের নির্যাতিত পরাধীন কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ প্রজাদের অধিকার, দায়িত্ববোধ তথা স্বাধীনতা সমন্ধে সচেতনা সৃষ্টি করতে প্রচেষ্টা করেছেন। আর এজন্য তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে মৃত্যুবরণ করেন। এই মহিয়ষী ক্ষণজন্মা মহিলার নাম অনুযায়ী এ জেলার নামকরণ করা হয় লালমনিরহাট।

তিস্তা, ধরলা ও শিংগিমারী নদীর মহনায় ৫টি উপজেলা নিয়ে ১২৪১ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ১৯৮৪ সালে এ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। লালমনিরহাট সদর, পাটগ্রাম, আদিত মারী, কালিগঞ্জ ও হাতিবান্ধা। এটি বাংলাদেশের সর্ব উত্তরে অবস্থিত। কাকিনা রাজবাড়ি, মোগলহাট ধরলা ব্রিজ, সুবাদার মনসুর খাঁ মসজিদ, পাঁচ গম্বুজ মসজিদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান।

১৩. নীলফামারী জেলা: ইংরেজ আমলে এ অঞ্চলটি নীল চাষের কেন্দ্র ভূমি ছিলো। তাই ঐতিহাসিকদের ধারণা এই নীল চাষকে কেন্দ্র করেই এ এলাকার নাম হয় নীলফামারী। ১০৮৪ সালে ১৫৮১ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে তিস্তা, ঘাঘট, যমুনাশ্বরী ও শিংগীসারী নদীর অববাহিকায় ৬টি উপজেলা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নীলফামারী জেলা। উপজেলাগুলো হলো নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা ও কিশোরগঞ্জ। বৃটিশ-বাংলাদেশের একমাত্র বিমানঘাটি ছিলো সৈয়দপুরে। তাছাড়া সৈয়দপুর রেলওয়ে জংশন, নীলসাগর বা বিরাটদিঘী, নীলকুঠী, রাজা ধর্মপালের গড়, ডিমলা রাজবাড়ি ইত্যাদি এ জেলার দর্শনীয় ও ঐতিহাসিক স্থান।

১৪. দিনাজপুর জেলা: ১৭৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দিনাজপুর জেলা। এর আয়তন ৩৪৩৮ বর্গ কিলোমিটার। প্রবাদ আছে যে, দীনা নামে এক অখ্যাত রাখাল এই জনপদে বাস করত। ভাগ্যের জোরে সে এক সময় রাজা হয়। এই দীনা রাজা থেকেই কালক্রমে দিনাজপুর শব্দের উৎপত্তি। আবার ভিন্ন মত হলো সমগ্র উত্তর-বঙ্গের সামন্ত প্রধান ছিলেন রাজা গণেশ। তিনি পনেরশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে "ধনুজাবর্ধন দেব" উপাধী গ্রহণ করে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই ধনুজাবর্ধন দেব উপাধী থেকে কালক্রমে এ জেলার নাম হয় দিনাজপুর। করতোয়, যমুনা, আত্রাই, পূর্ণভবা, টাংগন ও দীপা নদী এ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। উপজেলার সংখ্যা ১৩টি। দিনাজপুর সদর, কাহারুল, ঘোড়াঘাট, বিরোল, খানসামা, পার্বতীপুর, বিরামপুর, নবাবগঞ্জ, বোচাগঞ্জ, বীরগঞ্জ, ফুলবাড়ি এবং চিলিবন্দর। কাটারীভোগ চাল, চিড়া ও লিচুর জন্য দিনাজপুর বিক্ষাৎ। রামসাগর দিঘী, দিনাজপুর জাদুঘর, গুপ্তযুগের তাম্রলিপি, কান্তজীর মন্দির, গোবিন্দর গড় ইত্যাদি এ জেলার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান।

১৫. ঠাকুরগাঁও জেলা: জনশ্রুতি আছে যে, এ এলাকায় প্রতাপশালী হিন্দু পুরোহিত ঠাকুর পরিবার বসবাস করতেন। সময়ের বিবর্তনে কালক্রমে এই ঠাকুর পরিবারের নামানুসারে এ জেলার নাম হয়ে যায় ঠাকুরগাঁও। এ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালে। এর মোট আয়তন ১৮১০ বর্গ কিলোমিটার। ঠাকুরগাঁও সদর, পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল, বালিয়াডাংগী ও হরিপুর এই ৫টি উপজেলা নিয়ে গড়ে উঠেছে এ জেলা। টাংগর, নাগোর ও কুলিক নদীর মহনায় গড়ে উঠেছে এ জেলা। জগদল রাজবাড়ি, রাণী দিঘী, আধার দিঘী, রাজা গণেশের রজবাড়ি, ফতেহ্পুর মসজিদ, রাজা টংকনাথের বাসভবন সনগাঁও শাহী মসজিদ ইত্যাদি এ জেলার দর্শনীয় স্থান।

১৬. পঞ্চগড় জেলা: কথিত আছে এ জেলায় পাঁচটি গড় ছিল। গড়গুলো হলো-হোসেন গড়, রাজাগড়, মীরগড়, বিতরগড় ও দেবেনগড়। ধারণা করা হয় এ পাঁচ গড়ের সমষ্টি থেকেই পঞ্চগড় নামের উপত্তি। ১৯৮৪ সারের ১ ফেব্রুয়ারি ১৪০৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ৫টি উপজেলা গঠিত হয় পঞ্চগড় জেলা। এর উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণে ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর, পূর্বে নীলফামারী এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ অবস্থিত। উপজেলা গুলো পঞ্চগড় সদর, বোদা, তেঁতুলিয়া, দেবীগঞ্জ ও আটোয়ারী। নদ-নদীর মধ্যে করতোয়া, আত্রাই, পূর্ণভবা, টাঙ্গন ও মহানন্দা অন্যতম। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে বার আউলিয়ার বাজার , ভিতরগড়, হোসেনগড়, মীলগড়, রাজন গড়, দেবেনগড়, নয়নী বুরুজ, আটোয়াবীর জমিদার বাড়ির ধ্বংশাবশেষ, মির্জাপুর শাহী মসজিদ, ময়দান দিঘী, চন্দন বাড়ির মোগলী কেল্লা ও বোদা মন্দির অন্যতম। উল্লেখ্য বাংরাদেশের সর্ব উত্তরের উপজেলা হলো তেঁতুলিয়া।

খুলনা বিভাগ:

খুলনা বাংলাদেশের ৪র্থ বিভাগ। এর পুতিষ্ঠাকাল ১৯৪৭ খৃ.। এ বিভাগের মোট আয়তন ২২,২৭৪ বর্গ কি.মি.। মোট জনসংখ্যা ১,৬৩,০৯,৩০৪ জন। এ বিভাগে ৯,২৮৭টি গ্রাম, ৫১২১ টি ওয়ার্ড, ৫৭৪টি ইউনিয়ন, ৫৯টি উপজেলা এবং ১০টি জেলা রয়েছে। মোট সংসদীয় আসনের সংখ্যা ৩৬টি। এর বৃহৎ জেলা খুলনা এবং ক্ষুদ্রতম জেলা হলো মেহের পুর। জেলাগুলো হলো:

১৭. খুলনা জেলা: হযরত পীর খানজাহান আলীর (র.) স্মৃতি বিজড়িত ও ভৈরব-রূপসা বিধৌত পৌর শহর খুলনার ইতিহাস

নানাভাবে ঐতিহ্য মন্ডিত। খুলনা নামকরণের উৎপত্তি সমন্ধে নানান মত রয়েছে। প্রবাদ আছে যে, "কিসমত খুলনা" গ্রামের স্থানে যে শহর গড়ে উঠেছে তাই হলো আজকের খুলনা। ধনপতি সওদাগরের দ্বিতীয় স্ত্রী খুলনার নামে নির্মিত 'খুলনেশ্বরী কালী মন্দীর' থেকে খুলনা; ১৭৬৬ সালে 'ফলমাউথ' জাহাজের নাবিকদের উদ্ধারকৃত রেকর্ডে লিখিত Culnea শব্দ থেকে খুলনা। ইংরেজ আমলের মানচিত্রে লিখিত Jessorw-Culna শব্দ থেকে খুলনা শব্দের উৎপত্তি। ১৮৮২ সালের ১ জুন ৪৩৯৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ৯টি উপজেলার সমন্বয়ে রূপসা নদীর মহনায় খুলনা শহর গড়ে উঠে। এ জেলার উপজেলাগুলো হলো-কয়ড়া, ডুমুরিয়া, তেরখাদা, দাকোপ, দিঘলিয়া, পাইকগাছা, ফুলতলা, বটিয়াঘাট ও রূপসা। এর উত্তরে যশোর ও নড়াইল, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে বাগেরহাট এবং পশ্চিমে সাতক্ষিরা অবস্থিত। ঐতিহাসিক স্থানগুলোর মধ্যে হাদিস পার্ক, সুন্দরবন, বিএল কলেজ, মংলা বন্দর, প্রেম কানন, কবি কৃষ্ণ চন্দ্রের বাড়ি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নদ-নদীর মধ্যে কপোতাক্ষ, ভৈরব, শিবসা, কয়রা, শাকবাড়িয়া, পশুর ও রূপসা অন্যতম। সুন্দরবনের মধু, মিঠা পানির মাছ, হরিণের গোস্ত ইত্যাদি বিখ্যাত।

১৮. সাতক্ষীরা জেলা: এ জনপদের পূর্ব নাম ছিল সাতঘরিয়া। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বিষ্ণুরাম চক্রবর্তী নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দের কর্মচারী হিসেবে ১৭৭২ সালে নিলামে এই পরগনা কিনে গ্রাম স্থাপন করেন। জনশ্রুতি আছে বিষ্ণুরামের পুত্র প্রাণনাথ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য সাতঘর কুলীন ব্রাহ্মণ এনে তাঁর পরগনায় সকল সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের বস বাসের ব্যবস্থা করেন। সেই "সাতঘর" হতে পর্যায়ক্রমে সাতক্ষিরা নামের উৎপত্তি। আবার অন্য মতে, এ জেলার ক্ষীর খুব সাদের মজাদার ছিল। কালক্রমে এই "স্বাদ-ক্ষীর" থেকে সাতক্ষীরা নামের উৎপত্তি হয়েছে।

১৯৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ৩৮৫৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ৭টি উপজেলার সমন্বয়ে সাতক্ষিরা জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জেলার উপজেলাগুলো জলো- সাতক্ষীরা সদর, কালিগঞ্জ, দেবহাটা, আশাশুনি, তালা, শ্যামনগর ও কলারোয়া। নদ-নদীর মধ্যে সাতক্ষিরা, আরপাংশা, হরিণভাংগা, মালঞ্চ, রায়মঙ্গল ও কালিন্দি অন্যতম। ঐতিহাসিক স্থানের মধ্যে সুন্দরবন, জাহাজঘটা নৌ-দূর্গ, তিওর রাজার দিঘী ও মাটির প্রাচীর সন্নিবেশিত মানিঘর, নবরত্ন মন্দির, রাজা প্রতাপাদিত্যের নগরদূর্গ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ জেলার আম খুব সু-স্বাধু।

১৯. বাগেরহাট জেলা: সুন্দরবনে বাঘের বাস, দাড়টানা ভৈরব পাশ, সবুজ শ্যামলে ভরা নদীর বাঁকে বসতো যে হাট তার নাম বাগের হাট। এক সময় বাগের হাটের নাম ছিল খলিফাতাবাদ বা প্রতিনিধির শহর। খানজাহান আলী (র.) গৌড়ের সুলতানদের প্রতিনিধি হিসেবে এ অঞ্চল শাসন করতেন। কেউ কেউ মনে করেন, বরিশালের শাসক আঘা বাকের এর নামানুসারে বাগেরহাট হয়েছে। কেউ বলেন, পাঠান জায়গীরদার বাকির খাঁ এর নামানুসারে বাগেরহাট হয়েছে। আবার কারো মতে, বাঘ শব্দ হতে বাগেরহাট নাম হয়েছে। সুন্দরবনের কিছু অংশ এই অঞ্চলে থাকায় এখানে প্রায় বাঘের উৎপাত হতো। এই বাঘের উৎপাত থেকেই কাল ক্রমে এ জেলার নাম হয়ে যায় বাঘর বা বাগের হাট। আবার জনশ্রুতি আছে নদীর বাঁকে খানজাহান আলী (র.) এর একটি বাগ (ফার্সি শব্দ বাগ অর্থ বাগিচা) ছিল- যেখানে হাট বসতো। এ বাগ এবং হাট শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে আজকের বাগেরহাট। এর আয়তন ৩৯৫৯ বর্গ কিলোমিটার। এ জেলার উত্তরে গোপলগঞ্জ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে পিরোজপুর ও বরগুনা জেলা এবং পশ্চিমে খুলনা জেলা অবস্থিত। ১৯৮৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ৯টি উপজেলা নিয়ে এ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। উপজেলা গুলো হলো: বাগেরহাট সদর, মোলার হাট, ফকিরহাট, মংলা, কচুয়া, রামপাল, শরণখোলা, মোড়লগঞ্জ ও চিতলমারী। হরিণহাটা, মধুমতি, মংলা, বালেশ্বরী, পাথুরিয়া ও শীলা এর অন্যতম নদ-নদী। ঐতিহাসিক স্থানের মধ্যে সুন্দরবন, খানজাহান সমাধী কমপেক্স, ষাট গম্বুজ মসজিদ, পিসি কলেজ, কুঠিবাড়ি, চালনা সমুদ্র বন্দর, হিরণ পয়েন্ট, দূবলারচর ইত্যাদি।

২০. নড়াইল জেলা: নড়াইল একটি জমিদার পরিবারের নাম। কথিত আছে এই জনপদে প্রভাবশালী নড়াইল পরিবারের বসবাস ছিল। ধারণা করা হয় এই নড়াইল জমিদার পরিবারের নামানুসারে এ জেলার নাম হয়েছে নড়াইল। এ জেলার মোট আয়তন ৯৯০ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৮৪ সালে নড়াইল সদর, কালিয়া ও লোহাগড়া নামক ৩টি উপজেলা নিয়ে এ জেলা গঠিত। ভৈরব, কুমার, মধুমতি, চিত্র, নবগঙ্গা ও কাজলা নদী এ জেলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় রাজা রতন রায়ের রাজবাড়ি, গোয়ালবাথান গ্রামের মসজিদ, কদমতলীর মসজিদ, নলদীর গাজীর দরগাহ্, জোড়বাংলা রাধা গোবিন্দ মন্দির, নিশিনাথতলা বড়দিয়ার মঠ, সর্বমংগলা কালিমন্দির এবং এস এম সুলতানের শিশুস্বর্গ অন্যতম।

২১. যশোর জেলা: আরবী জশোর শব্দের অর্থ সেতু। এক সময় যশোর ছিল নদীবহুল এলাকা। ফলে এ এলাকায় চলাচল করতে অনেক সেতু বা সাঁকো পার হতে হতো। তাই ঐতিহাসিক কানিংহামের ধারণামতে, এই সাঁকো বা সেতুকে কেন্দ্র করেই আজকের যশোর নামের উৎপত্তি। অন্য মত হলো রাজা প্রতাপদিত্যের পতনের পর চাঁচড়ার রাজাদের যশোরের রাজা বলা হতো। কেননা তারা যশিাররাজ প্রতাপাদিত্যের সম্পত্তির অধিকাংশ পুরস্কার স্বরূপ অর্জন করেছিলেন। এই মত সঠিক বলে মনে হয়। যশোর বৃটিশ-বাংলার প্রথম জেলা যা ১৭৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত। ৮টি উপজেলা নিয়ে গঠিত এ জেলার মোট আয়তন ২৫৬৭ বর্গ কিলোমিটার। কপোতাক্ষ, ভদ্রা ও ভৈরবা নদীর তীর ঘেষে গড়ে ওঠা উপজেলা হলো- যশোর সদর, অভয়নগর, বাঘারপাড়া, শার্শা, মণিরামপুর, কেশবপুর, ঝিকোরগাছা ও চৌগাছা। ঐতিহাসিক স্থানগুরার মধ্যে ১১ দুয়ারী মন্দির, নীলকুঠি, নবাব মীর জুমলার রাজবাড়ি, মণিহার সিনেমা হল, মাইকেল মধুসূদন দত্তেরবাড়ি, হাজী মোহাম্মদ মোহসিনের তৈরি ইমাম বাড়ি,সিদ্ধির পাশা রাজা বাড়ি দিঘী ইত্যাদি। এখানকার জামতলার পন্স মিষ্টি ও খাজুরার খেজুরের গুড়ের সাধ অতুলনীয়।

২২. ঝিনাইদহ জেলা: জনশ্রুতি আছে এই জনপদে প্রচুর ঝিনুক পাওয়া যেত। এই ঝিনুক কুড়ানো শ্রমিকের বসতি গড়ে উঠে। সে সময় কলকাতা থেকে ঝিনুক ব্যবসায়ীরা মুক্তা লাভের আশায় এখানে ঝিনুক কিনতে আসতো। সে সময় ঝিনুক প্রাপ্তির স্থানকে ঝিনুকদহ বলা হত। অনেকের মতে ঝিনুককে আঞ্চলিক ভাষায় ঝিনেই বা ঝিনাই বলে। দহ অর্থ বড় জলাশয়, দহ ফার্সী শব্দ যার অর্থ গ্রাম। সেই অর্থে ঝিনুক দহ বলতে ঝিনুকের জলাশয় অথবা ঝিনুকের গ্রাম। কালক্রমে এ ঝিনুক কুড়ানো থেকে পরিবর্তীত হয়ে এ জেলার নাম হয়েছে ঝিনাইদহ। ১৯৮৪ সালে ১৯৬১ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে এ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। উপজেলা ৬টি। ঝিনাইদহ সদর, কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর, শৈলকোপ ও হরিণাকুন্ডু। চিত্র, ভৈরব, নবগঙ্গা ও কুমার এ প্রধানতম নদ-নদী। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে বেথুলী বটতলা (সপ্তদশ শতাব্দী, এশিয়া মহাদেশের সর্ব বৃহত্তম বটগাছ), গোড়াই মসজিদ, গলাকাটা দিঘী ও গলাকাটা মসজিদ, শ্রী রাম রাজার দিঘী, গোপাল মন্দির অন্যতম।

২৩. মাগুরা জেলা: প্রবাদ আছে বর্তমান মাগুরা জেলা অতীতে বাংলা মাসের নাম অনুযায়ী "মাঘ" নামে পরিচিত ছিল। পর্যায়ক্রমে এই "মাঘ" শব্দ থেকে মাগুরা নামকরণ করা হয়েছে। মাগুরা প্রাচীন আমলের একটি গ্রাম। মাগুরা দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। মহকুমা সদরের পূর্বে মাগুরা ও পশ্চিমে ছিল দরি মাগুরা। দরি শব্দের অর্থ মাদুর বা সতরঞ্জি। দরি মাগুরায় মাদুর তৈরি সম্প্রদায়ের লোক বাস করতো বলে নাম হয়েছিল দরি মাগুরা। ধর্মদাস নামে জনৈক মগ আরাকান থেকে এসে মাগুরা শহরের পূর্ব কোণের সোজাসুজি গড়াই নদীর তীরে খুলুমবাড়ি মৌজাসহ অন্য এলাকা দখল করে। লোকে তাকে মগ জায়গীর নামে আখ্যায়িত করেছিল। তাই অনেকের মতে মগরা থেকে আজকের মাগুরা শব্দের উৎপত্তি। আবার লোক মুখে শোনা যায় এককালে এ এলাকায় বড় বিল ছিল। সেই বিলে পাওয়া যেত পুচুর মাগুর মাছ। এই মাগুর মাছের নাম থেকেও মাগুরা নামের উৎপত্তি হতে পারে। কাজেই মাগুরা নামের উৎপত্তি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ১ মার্চ ১৯৮৪ সালে ১০৪৯ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে মাগুরা জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইছামতি, নবগঙ্গা ও বেগবতি নদীর অববাহিকায় এ জেলার ৪টি উপজেলা হচ্ছে মাগুরা সদর, শালিখা, মোহাম্মদপুর ও শ্রীপুর। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান গুলোর, মধ্যে গরীব শাহের মাযার, রাজা সীতারাম রায়ের রাজবাড়ির ধবংশাবশেষ, রাজাশত্রুজিৎ রায়ের রাজবাড়ি, দেবল রাজার গড়, ন্যাংটা বাবার আশ্রম, শ্রীপুরের বিরাট রাজার রাজবাড়ির স্মৃতিচিহ্ন ইত্যাদি।

২৪. কুষ্টিয়া জেলা: কুষ্টিয়ায় এক সময় কোস্টার (পাট) চাষ হতো বলে কোস্ট শব্দ থেকে কুষ্টিয়ার উৎপত্তি। হেমিলটনের গেজেটিয়ারে উল্লেখ করেন যে, স্থানীয় জনগণ একে কুষ্টি বলে ডাকত। ঐতিহাসিক তথ্য মতে, এই কুষ্টি থেকে কুষ্টিয়া নামের উৎপত্তি যা কুষ্টিয়া নামক গ্রামের স্থানে গড়ে উঠেছে আজকের কুষ্টিয়া জেলা শহর। ১৯৪৭ সালে ১৬০১ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে কুমার, গড়াই ও কালিগঙ্গা নদীর অববাহিকায় গঠিত হয় আজকের কুষ্টিয়া জেলা। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি, বিখ্যাত সাধক লালন শাহের আখড়া (মাজার), মোগল আমরের মসজিদ, মীর মোশারফ হোসেনের বসতবাড়ি, কালীদেবী মন্দির, জর্জবাড়ী, মহিষকুন্ডি নীলকুঠি উল্লেখযোগ্য। কুষ্টিয়ার তিলের খাজা খুবই মজাদার।

২৫. চুয়াডাঙ্গা জেলা: জনশ্রুতি আছে, মলিক বংশের আদি পুরুষ চুংগু মলিক নামে জনৈক ব্যক্তির নাম থেকে পর্যায়ক্রমে আজকের চুয়াডাংগা নামের উৎপত্তি। ১৭৪০ সালের দিকে চুংগু মলিক তাঁর স্ত্রী, তিন ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে ভারতের নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার সীমানার ইটেবাড়ি মহারাজপুর গ্রাম থেকে মাথাভাংগা নদীপথে এখানে এসে প্রথম বসতি গড়েন। ১৭৯৭ সালের এক রেকর্ডে এ জায়গার নাম চুঙ্গোডাঙ্গা উল্লেখ রয়েছে। ফারসী থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার সময় উচ্চারণের বিকৃতির

কারণে বর্তমান চুয়াডাঙ্গা নামটা এসেছে। ১১৭৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে ১৯৮৪ সালে ইছামতি ও নবগঙ্গা নদীর অববাহিকায় প্রতিষ্ঠিত হয় আজকের চুয়াডাংগা জেলা। এ জেলার উপজেলা ৪টি। চুয়াডাংগা সদর, আলম ডাংগা, দামুড়হুদা ও জীবননগর। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে দর্শনা চিনিকল, শিবনগর মসজিদ,হাজার দুয়ারী স্কুল, কার্পাসডাংগা নীলকুঠি, ঘোল দাড়ী নীলকুঠি, ঠাকুরপুর মসজিদ অন্যতম।

২৬. মেহেরপুর জেলা: ধারণা করা হয় ষোড়শ শতাব্দীতে সমাজসংস্কারক "মেহের উলাহ্ শাহ্" নামে এক ধর্মীয় চিন্তাবিদ এ এলাকায় বসবাস করতেন। তার নাম অনুযায়ী এ জনপদের নামকরণ করা হয় মেহেরপুর। ২৪ জানুয়ারি ১৯৮৪ সালে ৭১৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে উচ্চ ভৈরব, ইছামতি ও মাতাভাঙ্গা নদীর অববাহিকায় প্রতিষ্ঠিত হয় আজকের মেহরেপুর জেলা। এ জেলার উপজেলা ৩টি। মেহেরপুর সদর, মজিবনগর ও গাংনী। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে মজিবনগর স্মৃতিসৌধ, বৈদনাথতলা, লালন শাহের মাজার,বরকত বিবির মাজার, শাহ এনায়েত (র.)এর দরগাহ্, বলভপুর শিবমন্দির, তের ঘরিয়া মারুত (মাটির নিচে পোড়া মাটি দিয়ে তৈরি প্রতিরক্ষা চৌকি), ভাটপাড়া নীল কুঠি ইত্যাদি।

বরিশাল বিভাগ:

৫ম বিভাগ হিসেবে বরিশাল বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১ জানুয়ারি ১৯৯৩ খৃ.। এ বিভাগের মোট আয়তন ১৩,২৯৭ বর্গ কি.মি. এবং জনসংখ্যা ৮৬,৫২,৩২৪ জন। এ বিভাগে ৪,০৯৭ টি গ্রাম, ৩,০১৫ টি ওয়ার্ড, ৩৪৯টি ইউনিয়ন, ৪২টি উপজেলা, ১টি সিটি কর্পোরেশন (২০০০ খৃ. প্রতিষ্ঠিত), এবং ৬টি জেলা রয়েছে। সর্ববৃহৎ জেলা ভোলা এবং ক্ষুদ্রতম জেলা হলো ঝালকাঠী। জেলাগুলো হলো:

২৭. বরিশাল জেলা: বরিশাল নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ আছে। এক কিংবদন্তি থেকে জানা যায় পূর্বে এখানে খুব বড় বড় শাল গাছ জন্মাতো, আর এই বড় শাল গাছের কারণে (বড়+শাল) বরিশালের উৎপত্তি। কেউ কেউ দাবী করেন, পর্তুগীজ বেরি ও শেলির প্রেমকাহিনীর জন্য বরিশাল নামকরণ করা হয়েছে। আবার জনশ্রুতি আছে ইংরেজ ও পূর্তগিজ বণিকেরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে এ জনপদে পদচারণা করেছিল। বণিকেরা বড় বড় লবন চৌকিকে "বরিসল্ট" বলত। এই বরিসল্ট থেকেই বরিশাল শব্দের উৎপত্তি।

এ জেলার আয়তন ২৭৮৫ বর্গ কিলোমিটার এবং প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৯৭ খৃ.। এ জেলার ১০টি উপজেলাগুলো হলো: বরিশাল সদর, ঝালকাঠী, বাবুগঞ্জ, মেহেন্দীগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ, অগৈলঝড়া, গৌরনদী, বানারীপাড়া, মূরাদী ও উজিরপুর। কীর্তনখোলা, রোহালিয়া, রামগঞ্জ ও গজালিয়া এরমধ্যে প্রবাহিত নদ-নদী। কথায় আছে নদী, বিলে, খাল তিনে বরিশাল। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান গুলোর মধ্যে রামমোহনের সমাধী মন্দীর, সুজাবাদের কেল্লা, সংগ্রাম কেল্লা, শারকরের দূর্গ, গীর্জামহলা, বেলস্ পার্ক, অক্সফোর্ড গীর্জা, শংকরমঠ, মুকন্দ দাসের কালী বাড়ি, চরকিলা, দূর্গাসাগরদীঘি, সাড়ে তিন মণ ওজনের পিতরের মনসা ইত্যাদি। গৌড়নদীর দধি ও মিষ্টি এবং বরিশাল আমড়া ও পেয়ারার জন্য বিখ্যাত।

২৮. ঝালকাঠী জেলা: জেলার নামকরণের সংগে জড়িয়ে আছে এ জেলার জেলে সম্প্রদায়ের ইতিহাস। মধ্যযুগ-পরবর্তী সময়ে সন্ধ্যা, সুগন্ধা, ধানসিঁড়ি আর বিষখালী নদীর তীরবর্তী এলাকায় জেলেরা বসতি স্থাপন করে। এর প্রাচীন নাম ছিল মহারাজগঞ্জ। মহারাজগঞ্জের ভূ-স্বামী শ্রী কৈলাস চন্দ্র জমিদারী বৈঠক সম্পাদন করতেন এবং পরবর্তীতে তিনি এ স্থানটিতে একটি গঞ্জ বা বজার নির্মাণ করেন। এই গঞ্জে জেলেরা জালের কাঠি বিক্রি করত, পরবর্তীতে জালের কাঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আজকের ঝালকাঠি নামের উৎপত্তি হয়েছে। আরো জানা যায় বিভিন্ন স্থান থেকে জেলেরা এখানে মাছ শিকারের জন্য আসতো এবং যাযাবরের মতো সুগন্ধা নদীর তীরে বাস করত। এ স্থানের জেলেদের পেশাগত পরিচিতিকে বলা হতো ঝালো। এর পর জেলেরা বন-জংগল পরিস্কার করে এখানে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলে। এভাবেই জেলে থেকে ঝালো জংগল কেটে বসতি স্থাপনের কারণে কাটি শব্দের প্রচলন হয়ে ঝালকাঠী শব্দের উৎপত্তি হয়।

বিষখালী, সুগা ও গজালিয়া নদীর অববাহিকায় ৭৪৯ বর্গ কিলো মিটার এলাকা জুড়ে ৪টি উপজেলার সমন্বয়ে ১৯৮৪ সালে এ জেলা গঠিত হয়। উপজেলাগুলো হলো-ঝালকাঠি সদর, নলছিটি, রাজাপুর ও কাঁঠালিয়া। এখানকার দশূনীয় স্থানগুলোর মধ্যে ঘোষাল রাজ বাড়ির ধবংশাবশেষ, সুজাবাদের কেল্লা, নুরুলাপুর মঠ, সিভিল কোর্টভবন ইত্যাদি।

২৯. পিরোজপুর জেলা: এই জনপদে ফিরোজ শাহ্ নামে এক শাসনকর্তা ছিলেন। এই ফিরোজ ছিলেন বাংলার সুবেদার শাহ সুজার ছেলে। ধারণা করা হয় তাঁর নাম অনুসারে এ জনপদের নামকরণ হয়েছে ফিরোজপুর। পরবর্তীতে বেনিয়া চক্রের ছোয়াচ লেগে পাল্টে পিরোজপুরে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার অন্য মতে, বাংলার সুবেদার শাহ সুজা আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলার নিকট পরাজিত হয়ে বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলে এসে আত্মগোপন

করেন। এক পর্যায়ে নলছিটি উপজেলার সুগন্ধা নদীর পাড়ে একটি কেল্লা তৈরি করে কিছুকার অবস্থান করেন। মীর জুমলার বাহিনী এখানেও হামলা করলে শাহ সুজা দুই কন্যাসহ আরাকান রাজ্যে পালিয়ে যান। সেখানে তিনি অপর এক রাজার চক্রান্তে নিহত হন। পালিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী ও এক শিশু পুত্র রেখে যান। পরবর্তীতে তারা অবস্থান পরিবর্তন করে ধীরে ধীরে পশ্চিমে চলে এসে বর্তমান পিরোজপুরের পাশ্ববর্তী দামোদার নদীর মুখে আস্তানা তৈরি করেন। এ শিশুর নাম ছিল ফিরোজ এবং পরবর্তীতে তার নামানুসারে হয় ফিরোজপুর যা রূপান্তর হয়ে হয় পিরোজপুর।

১৯৮৪ সালে ১৩০৮ বর্গ কিলো মিটার এলাকা নিয়ে মধুমতি, ধলেশ্বরী, বলেশ্বরী, কাঁচাখালী এবং সন্ধ্যা নদীর কোল ঘেষে এ জেলা গঠিত হয়। এর ৭টি উপজেলাগুলো হলো-পিরোজপুর সদর, ভান্ডারিয়া, মঠবাড়িয়া, নাজিরপুর, স্বরূপকাঠি, কাউখালী ও জিয়ানগর। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রায়বাহাদুর চৌধুরীর ধ্বংশপ্রাপ্ত প্রাসাদ, কুমারখালীর কালি মন্দির, রায়েরকাঠী এবং কৌড়িখাড়ির রাজবাড়ির ধবংশাবশেষ।

৩০. বরগুনা জেলা: আঠার শতকের প্রথম দিকে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী বনাঞ্চলে খাকদোন নদীর পার্শ্ব জেলা শহর বরগুনায় কাঠব্যবসায়ী আসতে পুরো জোয়ার-ভাটা সময় লাগত। এই জোয়ার-ভাটার সময়কে আঞ্চলিক ভাষায় বরগুণ বলত। পরবর্তী সময়ে এই বরগুন শব্দটিই রূপান্তরিত হয়ে বরগুনা নামের উৎপত্তি। কেউ কেউ বলেন, বরগুনা নামক কোন প্রভাবশালী রাখাইন অধিবাসীর নামানুসারে হয়েছে বরগুনা। আবার অন্যদের মতে, বরগুনা নামক কোনো এক বাওয়ালীর নামানুসারে এ স্থানের নাম হয়েছে বরগুনা।

১৯৮৪ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে ৫টি উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত হয় বরগুনা জেলা। এ জেলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে পায়রা, বিষখালী, বুড়িশ্বর, হরিণঘাটা, মাণিক ও চাঘাই নদী। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানগুলো হলো বিবিচিনি মসজিদ, বৌদ্ধ মন্দির, বৌদ্ধ একাডেমি, টেপুরার গাজী-কালু মাজার, চাওড়া পাতাকাটার মাটির মসজিদ ইত্যাদি।

৩১. পটুয়াখালী জেলা: জনশ্রুতি আছে পেট আকৃতির খাল-বিল থেকেই পটুয়াখালী নামের উৎপত্তি। আবার কারো কারো ধারণা, কবি দেবেন্দ্রনাথ দত্তের "পতুয়ার খাল" নামক কবিতা থেকেই পটুয়াখালী নামের উৎপত্তি হয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে আরো জানা যায় যে, পটুয়াখালী চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এ দৃষ্টিতে এই জনপদের নামকরণের পিছনে প্রায় সাড়ে তিনশত বছরের অত্যাচারের ইতিহাস জড়িত। পটুয়াখালী শহরের উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত নদীটি পূর্বে ভরানী খাল নামে পরিচিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দির শুরু থেকে পর্তুগীজ জলদস্যুরা এই খালের পথ দিয়ে এসে সন্নিহিত এলাকায় নির্বিচারে অত্যাচার, হত্যা, লুণ্ঠন চালাত। স্থানীয় লোকেরা এই হানাদারদের নটুয়া বা পটুয়া বলত এবং তখন থেকে খালটি নটুয়ার খাল নামে ডাকা হয়। কথিত আছে, এই নটুয়ার খাল বা পটুয়ার খাল থেকে পরবর্তীতে এ এলাকার নাম হয় পটুয়াখালী।

এ জেলা ১৯৬৯ সালে ৩২২১ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে ৮টি উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত হয়। পটুয়াখালী সদর, দুমকি, গলাচিপা, দশমিনা, বাউফল, কলাপাড়া, মির্জাগঞ্জ ও রাঙ্গাবালী। তেঁতুলিয়া, গলাচিপা, আগুনমুখো পালহালিয়া ও পায়রা এ জেলার প্রধান প্রধান নদ-নদী। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে সুন্দরবন, কমলা রাণীর দিঘী, দয়াময়ীর মন্দির, কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত, আগুনমুখো ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৩২. ভোলা জেলা: প্রবাদ আছে যে, ভোলা গাজী নামে সর্বজন পরিচিত এক ধর্ম সাধকের নামে এ জনপদের নামকরণ করা হয় ভোলা। আবার এ জনপদে স্থায়ীভাবে আর একটি লোককাহিনী প্রচলিত আছে যে, ভোলা শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া বেতুয়া নামক খালটি এখনকার মত অপ্রশস্ত ছিল না। এক সময় এটি পরিচিত ছিল বেতুয়া নদী নামে। খেয়া নৌকার সাহায্যে নদীতে পারাপার করা হতো। বুড়ো সেই মাঝির নাম ছিল ভোলা গাজী পাটনী। বর্তমানের যোগীরঘোলের কাছেই তাঁর আস্তানা ছিল। এই ভোলা গাজীর নামানুসারেই এ জেলার নাম হয় ভোলা।

এ জেলার আয়তন ১৫০৩ বর্গকিলোমিটার। ১৯৮৪ সালে এ জেলা গঠিত হয়। এর ৭টি উপজেলা- ভোলা সদর, চরফ্যাশন, মনপুরা, লালমোহন, দৌলতখান, বোরহানউদ্দিন ও তজুমদ্দিন। এ জেলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে- মেঘনা, ইলশা, তেঁতুলিয়া, বোয়ালিয়া ও শাহবাপুর নদী। দর্শনীয় স্থানগুলোর, মধ্যে মনপুরা দ্বীপ, সুতা বাড়িয়া দয়াময়ি মন্দির, বেতাগী সিকদারিয়া জামে মসজিদ, কবিরাজ বাড়ির দিঘী, কুয়াকাটা বৌদ্ধবিহার, মহেন্দ্র পাগলার আশ্রম, মদনপুর সিকদারবাড়ির অন্ধকুপ উল্লেখযোগ্য। এ জেলার মহিষের দুধ খুব প্রসিদ্ধ।

সিলেট বিভাগ

৬ষ্ঠ বিভাগ হিসেবে সিলেট বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১ আগস্ট ১৯৯৫ খৃ.। এ বিভাগের আয়তন ১২,৫৯৬ বর্গ কি.মি. এবং মোট জনসংখ্যা ১,০২,৯৬,৯৫৫ জন। এ বিভাগে ১০,২৫০ টি গ্রাম,

২,৯০৭টি ওয়ার্ড, ৩৩৩টি ইউনিয়ন, ৩৯টি উপজেলা, ১টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৪টি জেলা এবং ১৯টি সংসদীয় আসন রয়েছে। সর্ববৃহৎ জেলা সুনামগঞ্জ এবং ক্ষুদ্রতম জেলা হলো হবিগঞ্জ। জেলাগুলো হলো:

৩৩. সিলেট জেলা: কিংবদন্তি রয়েছে প্রাচীন গৌড়ের রাজধানীতে রাজা গুহক তার স্নেহময়ী কন্যা শিলার স্মৃতি রক্ষার্থে এক সময় একটি হাট নির্মাণ করেন এবং এ নাম রাখেন-শিলার হাট বা শিলহট্র। এই শিলার হাট থেকে পর্যায়ক্রমে শ্রী হাট বা সিলেট নামকরণ করা হয়। ১৭৮২ সালের ৩ জানুযারি ১৪৯০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সুরমা, কুশিয়ারা সোনাই নদীর অববাহিকায় ১৩টি উপজেলা নিয়ে গঠিত হয় সিলেট জেলা। উপজেলাগুলো হলো-সিলেট সদর, বালাগঞ্জ, বিশ্বনাথ, কানাইহাট, ফেঞ্চুগঞ্জ, কোম্পনীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, বিয়ানী বাজার, জকিগঞ্জ, জৈন্তাপুর, গোলাপগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা ও ওসমানী নগর। দর্শনীয় স্থানগুলোর, মধ্যে হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (র.) এর দরগাহ্, জৈন্তাপুরের প্রস্তর স্মৃতি, গড়দুয়ার ঢিবি, গায়েবী মসজিদ, নবাবী মসজিদ, আকালিয়ার মোঘল মসজিদ ইত্যাদি।

৩৪. মৌলভীবাজার জেলা: এ জনপদে বাস করতেন বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক মৌলভী কুদরতউল্লাহ। তিনি জেলা প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন স্থানে একটি বাজার বসান। তাঁর মৃত্যুর পর মৌলভী কুদরতউল্লাহর প্রতি সন্মান জানিয়ে এই জনপদের নামকরণ করা হয় মৌলভীবাজার। এর আয়তর ২৭৯৯ বর্গ কিলোমিটার। ৭টি উপজেলা নিয়ে মনু ও ধলাই নদীর তীরে ১৯৮৪ সালে এ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। মৌলভীবাজার সদর, শ্রীমঙ্গল, রাজনগর, কুলাউড়া, বড়লেখা, কমলগঞ্জ ও জুড়ি। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে মাধবকুন্ডু জলপ্রপাত, কুলাউড়া পাহাড়, পৃথ্বিম পাশার নবাব বাড়ি, মজলিশ আলম নির্মিত মুগল স্থাপত্য কীর্তি গয়ঘরের ঐতিহাসিক খোজার মসজিদ, হিন্দু সাধক অঙ্গান ঠাকুরের মসজিদ ইত্যাদি।

৩৫. হবিগঞ্জ জেলা: এ জনপদের জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব "হাবিবুল্লা" জেলা প্রধান কার্যলয় সংলগ্ন স্থানে "গঞ্জ" বসান। কালক্রমে হাবিবুল্লা এবং গঞ্জ মিলে এ জেলার নামকরণ করা হয় হবিগঞ্জ।এ জেলার আয়তন ২৬৩৭ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৮৪ সালে ৮টি উপজেলা নিয়ে এ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। উপজেলাগুলো হবিগঞ্জ সদর, মাধবপুর, বানিয়াচং, চুনারুঘাট, বাহুবল, আজমিরীগঞ্জ, নবীগঞ্জ ও লাখাই। সুতাং, কাউলাই, গোপাল, লাঙ্গলা, কালনী ও খোয়াই এ জেলার নদ-নদী। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে কালনী, সুতাং ও খোয়াই উল্লেখযোগ্য।

৩৬. সুনামগঞ্জ জেলা: ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলে "সুনামদী" নামক এক মুসলিম সৈনিকের নামের বিকৃতি ঘটে সুনামদী থেকে সুনামগঞ্জ হয়েছে। ১৯৮৪ সালে ৩৬৭০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে ১১টি উপজেলার সমন্বয়ে কুশিয়ারা, বলাই, সোমেশ্বরী ও পুরাতন সুরমা নদীর অববাহিকায় সুনামগঞ্জ জেলা গঠিত হয়। উপজেলাগুলো হলো-সুনামগঞ্জ সদর, দিরাই, ছাতক, জামালগঞ্জ, ধর্মপাশা, জগন্নাথপুর, তাহেরপুর, শালা, দোয়ারাবাজার, বিশম্ভর পুর ও দক্ষিণ সুনামগঞ্জ। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে ছাতক পেপার মিল সুখাইর কালিবাড়ি মন্দির, ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরী,হাইল হাওর, নারায়ণ তলা, বাসুদেব মন্দির, জগন্নাথ জিওর মন্দির, পরাশ জামে মসজিদ ইত্যাদি অন্যতম।

চট্টগ্রাম বিভাগ:

বাংলাদেশের ২য় বিভাগ হিসেবে চট্টগ্রাম বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালে। এ বিভাগের আয়তন ৩৩,৭৭১ বর্গ কি.মি.। মোট জনসংখ্যা ২,৯৫,৫৩,৮৫৭ জন। মোট জেলার সংখ্যা ১১টি, উপজেলা-১০১ টি, ইউনিয়নের সংখ্যা ৯৪৭টি, গ্রামের সংখ্যা ১৫,২১৯টি এবং সংসদীয় আসনের সংখ্যা ৫৮টি। সর্ববৃহৎ জেলা রাঙামাটি এবং ক্ষুদ্রতম জেলা ফেনী। এ বিভাগের জেলাগুলো হলো:

৩৭. চট্টগ্রাম জেলা: চট্রগ্রামের ৪৮টি নামের খোঁজ পাওয়া যায়। এর মধ্যে রম্যভূমি, চাটিগাঁ, চাতগাও, রোসাং, চিতাগঞ্জ, জাটিগ্রাম ইত্যাদি। চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে, পণ্ডিত বার্ণোলির মতে, আরবী (খ-) অর্থ বদ্বীপ, গাঙ্গ অর্থ গঙ্গা নদী থেকে চট্টগ্রামের উৎপত্তি। অন্য মতে জনশ্রুতি আছে, ত্রয়োদশ শতকে এ জনপদে ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন বার জন আউলিয়া। এ ১২ জন আউলিয়া এসে জ্বীন ও পরী তাড়াবার জন্য একটি বড় বাতি (চেরাগ) জেলে উচু জায়গায় স্থাপন করেছিলেন। এই বাতি যতদূর ছড়েয়ে পড়ে ততদূর থেকে জ্বীন পরীরা পালিয়ে গিয়েছিল এবং সর্বপ্রথম মানুষের বসবাস উপযোগী হয়ে উঠে।

এ জনপদের আঞ্চলিক ভাষায় "চাটি" অর্থ বাতি বা চেরাগ আর গাও অর্থ গ্রাম। এ থেকে এই অঞ্চলের নাম হয় চাটিগাঁও বা চাঁটগাও কালক্রমে আজ যা চট্রগাম নামে পরিচিত। আবার এশিয়াটেক সোস্যাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোন্সের মতে, এ এলাকার একটি ক্ষুদ্র পাখির নাম থেকে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি। ১৬৬৬ খ্রি. চট্টগ্রাম মোঘল সাম্রাজের অংশ হয়।

আরাকানদেও পরাজিত করে মোঘলরা এ জনপদের নাম রাখেন ইসলামাবাদ। ১৭৬০ খ্রি. মীর কাশিম আলী খান ইসলাবাদকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করেন। পরে কোম্পানি এর নাম রাখেন চিটাগাং।

১৬৬৬ সালে ৫,২৮৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে কর্ণফুলি, সাঙ্গু, হালদা ও ফেনী নদীর তীরে এ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উপজেলা ১৪টি। চট্টগ্রাম সদর, আনোয়ারা, বাঁশখালী, বোয়ালখালী, চন্দনাইশ, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, লোহাগড়া, মিরসরাই, পটিয়া, রাঙ্গুনিয়া, রাউজান, সন্দ্বীপ, সাতকানিয়া ও সীতাকুন্ড। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে ফয়েস লেক, আগ্রাবাদ জাতিতত্ত্ব জাদুঘর, পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, সীতাকুন্ড ইকোপার্ক, বায়েজিদ বোস্তামির মাজার, মুসাখাঁ মসজিদ, ফকিরা মসজিদ, ব্রোঞ্জ মূর্তি, বাঁশখালী, কালা মসজিদ কদম মোবারক মসজিদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৩৮. কক্সবাজার জেলা: ঐতিহাসিকদের মতে, সপ্তদশ শতকে এ জনপদের নাম ছিল ফালকিং। তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স নামে এক ইংরেজ সেনানায়ককে পালকিং অঞ্চলের সুপারেনটেনডেন্ট নিয়োগ করেন। ক্যাপ্টেন কক্স সেখানে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তার নাম অনুযায়ী এ জেলার নামকরণ করা হয় কক্সবাজার।

এ জেলার আয়তন ২৪৯২ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৮৪ সালে নাফ নদী ও মাতামুহরী নদীর মোহনায় এ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ৮টি উপজেলাগুলো কক্সবাজার সদর, মহেশখালী, কুতুবদিয়া, চকোরিয়া, রামু, উখিয়া, টেকনাফ ও পেকুয়া। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানগগুলো হলো-বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত, ইনানী সমুদ্র বন্দর, কুতুবদিয়া বাতিঘর, হিমছড়ি, মহেশখালী দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, এলিফ্যান্ট পয়েন্ট, বীর কমলার দিঘী, রামকোট বৌদ্ধ কেয়াং, লামারপাড়া বৌদ্ধ কেয়াং, রামু বৌদ্ধ বিহার ইত্যাদি।

৩৯. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা: তিতাস, সালদা ও মেঘনা নদীর অববাহিকায় এ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালে। পূর্বে এই জেলা কুমিল্ল জেলার অন্তর্ভূক্ত ছিল। উল্লেখ্য ১৮৩০ সালের পূর্বে সরাইল পরগণা ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্ভূক্ত ছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নামকরণের সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি।

তবে একটি মত আছে এরূপ যে, রাজা লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে এই জনপদে কোন ব্রাহ্মণ পরিবার ছিল না। যার ফলে পূজা পার্বনে হিন্দুদের খুবই অসুবিধা হতো। এই অসুবিধার কারণে রাজা লক্ষণ সেন "কন্যাকুঞ্জু" থেকে কয়েকটি ব্রাহ্মণ পরিবার এখানে এনেছিলেন। ধারণা করা হয় এই ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে এ জেলার নামকরণ করা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া। আবার অন্য মত হলো, উক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারগুলো যে খালের ধারে বসতি স্থাপন করেছিলেন তার দক্ষিণ পাড়ে দিল্লি থেকে আগত শাহ সুফি হযরত কাজী মাহমুদ শাহ নামক এক মুসলিম দরবেশ ও ধর্মপ্রচারক আস্তানা স্থাপন করেন। এই সাধক কর্তৃক উক্ত ব্রাহ্মণ পরিবার এখান থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। কথিত আছে যে উক্ত দরবেশ "ব্রাহ্মণবেরিয়েযাও" বলে হুকুম করেছিলেন এবং তার সেই উক্তি থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামের উৎপত্তি। সাধকের নামানুসারে স্থানটির নাম হয়েছে কাজীপাড়া। এখানে তার মাজার রয়েছে।

এ জেলার আয়তন ১৯২৭ বর্গ কিলোমিটার এবং এর উপজেলা ৯টি। যেমন-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, আখাউড়া, কসবা, বাঞ্চারামপুর, সরাইল, নবীনগর, নাছির নগর, আশুগঞ্জ ও বিজয় নগর। দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে তিতাস গ্যাস উত্তোলন কেন্দ্র, আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, জিয়া সারকারখানা অন্যতম।

৪০. ফেনী জেলা: জনশ্রুতি আছে বিরাট নলাজার এক সামন্তের নাম ছিল ফনী রাজা-পোড়া মাটির পাহাড়ে যা শিলার শহর নামে পরিচিত ছিল। কালক্রমে এই ফনী রাজা থেকে ফেনী জেলার নামকরণ করা হয়। আবার অন্য মতে, ফেনী নদীর নাম অনুসারে এ অঞ্চলের নাম রাখা হয় ফেনী। মধ্যযুগে কবি-সাহিত্যিকদের কবিতা ও সাহিত্যে পারপারের ঘাট হিসেবে ফণি শব্দটি পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দিতে কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগলপুরের বর্ণনায় লিখেছেন, "ফণী নদীতে বেষ্টিত চারিধার,পূর্বে মহাগিরি পার পাই তার।" সতের শতকে মির্জা নাথানের ফার্সি ভাষায় রচিত বাহারিস্থান-ই ডায়েরীতে ফনী শব্দ ফেনীতে পরিণত হয়। মোসলমান কবি-সাহিত্যিকদের ভাষায় আদি শব্দ "ফনী" ফেনীতে পরিণত হয়েছে।

এর মোট আয়তন ৯২৮ বর্গ কিলোমিটার। ৬টি উপজেলা নিয়ে এ জেলা ১৯৮৪ সালে ফেনী মহুরী ও সেলোনাই নদীর অববাহিকায় গঠিত হয়। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে মোহাম্মদ আলী চৌধুরী মসজিদ ও বাসভবন, মহিপালের বিজয় সিংহ দিঘি এবং চাঁদগাজী মসজিদ অন্যতম।

৪১. নোয়াখালী জেলা: বর্তমান নোয়াখালী জেলার প্রাচীন নাম ছিল ভুলুয়া। নোয়াখালী সদর থানার আদি নাম ছিল সুধারাম।

ঐতিহাসিকদের মতে, একবার ত্রিপুরার পাহাড় থেকে প্রবাহিত ডাকাতিয়া নদীর পানিতে ভুলুয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভয়াবহভাবে

পাবিত হয়ে ফসলি জমির ব্যাপক ক্ষতি করে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপাই হিসেবে ১৬৬০ সালে একটি বিশাল খাল খনন করা হয়, যা পানি প্রবাহকে ডাকাতিয়া নদী থেকে রামগঞ্জ, সোইমুড়ি, ও চৌমুহনী হয়ে মেঘনা এবং ফেনী নদীর দিকে প্রবাহিত করে। এই বিশাল খালকে আঞ্চালিক ভাষায় নোয়া খাল বলা হতো। গেজেট সূত্রে জানা যায় যে, ২৯ মার্চ ১৮২২ সালে জেলা প্রধান কার্যালয়টি ছিল নোয়াখাল সংলগ্ন জনপদ। ধারণা করা হয় এই নোয়াখাল নামকে কেন্দ্র করে এ জেলার নাম ভুলুয়া পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয় নোয়াখালী।

১৮২১ সালে ভুলুয়া নামে এ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে ১৮৬৮ সালে নোয়াখালী নামকরণ করা হয়। এর আয়তন ৩৬০১ বর্গ কিলোমিটার। এর ৯টি উপজেলা নোয়াখালী সদর, বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সেনবাগ, কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া কবীরহাট, সোনাইমুড়ী ও সুবর্ণচর। নদী ৩টি্ মেঘনা, ডাকাতিয়া ও ফেনী। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে গান্ধি আশ্রম, বজরা শাহী জামে মসজিদ, নিঝুম দ্বীপ, বীর শ্রেষ্ঠ রুহুল আমীনের সমাধী অন্যতম। বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম ছোট থানা (জনসংখ্যায়) এ জেলার বেগমগঞ্জ থানা।

৪২. লক্ষীপুর জেলাঃ রাজা লক্ষী নারায়ণের নামানুসারে এ জেলার নামকরণ করা হয় লক্ষীপুর। ১৯৮৪ সালে ১৪৫৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর অববাহিকায় এ জেলা গঠিত হয়। উপজেলা ৫টি। যেমন- লক্ষীপুর সদর, কমল নগর, রায়পুর, রামগঞ্জ ও রামগতি। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে কাঞ্চপুর দরগাহ,হরিশপুর দরগাহ, শ্রীরামপুর রাজবাড়ি, খোয়াসাগর দিঘি, শ্রী গোবিন্দ মহাপ্রভুর জিও আখড়া, সাহাপুর নীল কুঠি অন্যতম। লক্ষীপুর ডাব, নারকেল ও সুপারীর জন্য বিখ্যাত।

৪৩. চাঁদপুর জেলাঃ ১৭৭৯ খৃ. বিট্রিশ শাসনামলে ইংরেজ জরিপকারী মেজর জেমস রেনেল তৎকালীন বাংলার যে মানচিত্র অংকন করেছিলেন তাতে চাঁদপুর নামে এক অখ্যাত জনপদ ছিল। তখন চাঁদপুরের দক্ষিণে নরসিংহপুর নামক (বর্তমানে যা নদী গর্ভে বিলীন) সাথানে চাঁদপুরের অফিস-আদালত ছিল। পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গমস্থল ছিল বর্তমান স্থান থেকে প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। বার ভূঁইয়াদের আমলে চাঁদপুর অঞ্চল বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদ রায়ের দখলে ছিল। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ জে এ গুপ্তের মতে, বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদ রায়ের নাম থেকেই চাঁদপুর নামের উৎপত্তি। আবার কথিত আছে চাঁদপুরের (কোড়ালিয়া) পুরিন্দপুর মহলার চাঁদ ফকিরের নামে এ অঞ্চলের নাম হয়েছে চাঁদপুর। কারো কারো মতে, শাহ আহমেদ চাঁদ নামে একজন প্রশাসক দিলি থেকে পঞ্চদশ শতকে এখানে এসে একটি নদীবন্দর স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে হয়েছে চাঁদপুর।

১৮৭৮ খৃ. প্রথম চাঁদপুর মহকুমার সৃষ্টি হয়। ১৮৯৬ সালে পৌরসভা গঠিত হয়। এ জেলার আয়তন ১৭০৪ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৮৪ সালে ৮টি উপজেলা নিয়ে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর অববাহিকায় এ জেলা গঠিত হয়। উপজেলাগুলো হলো- চাঁদপুর সদর, হাজীগঞ্জ, শাহরাস্তি, হাইমচর, ফরিদগঞ্জ, কচুয়া, মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে বেগম মসজিদ, হাজীগঞ্জ বড় মসজিদ, শাহ সুজা মসজিদ, আলমগিরী মসজিদ, উজানীর বেহুলার শিলা, বাসামাস স্মৃতিস্তম্ভ অংগীকার, নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট, কাশিম বাজার বার দুয়ারা ইত্যাদি। চাঁদপুর ইলিশ মাছের জন্য বিখ্যাত।

৪৪. কুমিল্লা জেলাঃ কুমিল্লার প্রাচীন নাম ছিল ত্রিপুরা, এই ত্রিপুরার প্রাণচাঞ্চল্যে অনুধাবিত হয়ে পূর্ব বাংলার দেব ও চন্দ্র বংশের রাজা পূর্ণচন্দ্র কুমিল্লার অদূরে লালমাই পাহাড়ি এলাকায় একটি রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক ওয়াংচোয়াং কর্তৃক সমতট রাজ্য পরিভ্রমণের বৃত্তান্ত। তাঁর বর্ণনায়, দ্রুদিয়ান কলিংস এক সময় এই জনপদে কামালাঙ্কা (Kiamolonkia) নামে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ধারণা করা হয় কামালাঙ্কা থেকে কুমিল্লা নামের উৎপত্তি। আবার ভিন্ন মত হচ্ছে, হযরত রাস্তিশাহ্ (রা.) নামক এক ওলি ইরাকের বাগদাদ থেকে এ জনপদে এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য, যার নাম অনুযায়ী বর্তমান শাহরাস্তি থানার নামকরণ করা হয়েছে। বাগদাদ থেকে যাত্রাকালীন সময়ে তাঁর পীর তাকে গন্তব্যস্থান সম্পর্কে বলেছিলেন গন্তব্যেও পূর্বে একটি পাহাড় দেখতে পাবে। পথিমধ্যে একটি স্থানে এসে তাঁর সফর সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠেন-"কুহু মিলা" কুহু মানে পাহাড়, আর মিলা মানে পেয়েছি বা পাওয়া গেছে। যার অর্থ পাহাড় পেয়েছি। কালের বিবর্তনে সেই কুহ মিলা আজ কুমিল্লা।

কুমিল্লার আয়তন ৩০৮৫ বর্গ কি.মি.। ১৭৯০ সালে ত্রিপুরা নামে এবং ১৯৬০ সালে কুমিল্লা নামের জেলাটি গোমতী, মেঘনা, বুড়ি ও সালদা নদীর অববাহিকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ১৬টি উপজেলাগুলো হচ্ছে- কুমিল্লা সদর, দেবীদ্বার হোমনা, সদর দক্ষিণ, বরুরা, দাউদকান্দি, ব্রাক্ষণপাড়া, বুড়িচং, চৌদ্দগ্রাম, মুরাদনগর, মনোহরগঞ্জ, লাকসাম, নাঙ্গলকোর্ট,

তিতাস, চান্দিনা ও মেঘনা। কুমিল্লার খদ্দর কাপড় ও রসমালাই-মিষ্টি বিখ্যাত। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে শালবন বিহার, ময়নামতি পাহাড়, লালমাই পাহাড়, কৈটিল্যা মুড়া, চারন্দ্র মুড়া, ইটাখোলা মুড়া, রূপবান মুড়া, আনন্দ রাজার প্রসাদ, ভোজবাজার প্রসাদ, শাহ সুজা মসজিদ, জগন্নাথ মন্দির, ধর্ম সাগর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৪৫. বান্দরবন জেলা: বর্তমান বান্দরবান শহরের অপর প্রান্তে কালো পাহাড়ে একটি ঝরণা ছিল। ঝরণার পাহাড়ি পানি ছিল লবনাক্ত। সেই পাহাড়ি পানি পান করার জন্য অসংখ্য বানর দলবেধে সাংগু নদী পার হতো। সে সময় অতি বৃষ্টির কারণে ছড়ার পানি বৃদ্ধি পেলে বানরের দল ছড়াপাড় থেকে পাহাড়ে যেতে না পারায় একে অপরকে ধরে সারিবদ্ধভাবে ছড়া পার হয়। বানরের ছড়া পার হওয়ার দৃশ্য সাধারণ মানুষ দেখতে পায় । এ সময় থেকে এ জায়গাটি "ম্যাঅকছি ছড়া" হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। মার্মা ভাষায় ম্যা অক শব্দের অর্থ বানর, আর ছি: শব্দের অর্থ হলো বাধ। ধারণা করা হয় কালের প্রবাহে বাংলা ভাষা ভাষির সাধারণ উচ্চারণে এই শহরের নামকরণ করা হয় বান্দরবান। তবে মার্মা ভাষায় বান্দরবানের প্রকৃত নাম "রদক্যওচি চিস্রো"।

এর আয়তন ৪৪৭৯ বর্গ কি.মি.। ১৯৮১ সালে ৭টি উপজেলা নিয়ে সাঙ্গু (শংখ), মাতামুহুরী ও বাকখালী নদীর মোহনায় বান্দরবান জেলা গঠিত হয়। দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ তাজিনডং, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কেওক্রাডং, বগা লেক, মাতামুহুরী, বাঁকখালী, প্রান্তিক লেক, চিম্বুক পাহাড় ও নীলগিরী অন্যতম। বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম জেলা হলো বান্দরবান (জনসংখ্যায়) এবং সর্বাধিক ছোট উপজেলা হলো থানচি (জনসংখ্যায়)।

৪৬. রাঙামাটি জেলা: বিলু কবীরের লেখা "বাংলাদেশ জেলা নামকরণের ইতিহাস" বই থেকে জানা যায় তা হলো- এই এলাকায় পর্বতরাজি গঠিত হয়েছিল টারশিয়রি যুগে। এই জনপথের মৃত্তিকার রং রক্তিম বা রাঙ্গা আকৃতির বলে মৃত্তিকার সাথে আবহমান কালের আত্বিক সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখতে এই জেলার নামকরণ করা হয় রাঙামাটি। অন্য প্রচলিত মতটি হলো, বর্তমান রাঙামাটি জেলা সদরের পূর্বদিকে একটি ছড়া ছিল, যা এখন হ্রদের মধ্যে নিমজ্জিত। এই হ্রদের স্বচ্ছ পানি যখন লাল বা রাঙামাটির উপর দিয়ে ঢাল বেয়ে প্রপাত ঘটাতো, তখন তাকে লাল দেখাতো। তাই এই ছড়ার নাম হয়েছিল 'রাঙামাটি"। এই জেলা সদরের পশ্চিমে আরও একটি ছড়া ছিল। অনুরূপ কারণে তার নাম দেয়া হয়েছিল "রাঙাপানি"। এই দুই রাঙা ছড়ার মোহনার বাঁকেই গড়ে উঠেছে বর্তমান জেলা শহর-যা মূলত ছিল অনাবাদী টিলার সমষ্টি এবং বহু উপত্যকার এক নয়নাভিরাম বিস্ময়ভূমি। এই দুটি ছড়া রাঙামাটি ও রাঙাপানি হতে "রাঙামাটি" জেলার নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

৬১১৬ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে ১৯৮৩ সালে কাসালং, রানখিয়াং, কর্নফুলি ও সংখ নদীর অববাহিকায় এ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ১০টি উপজেলা রয়েছে। যেমন-রাঙামাটি সদর, বরকল, বাঘাইছড়ি, কাউখালী, জুড়াইছড়ি, লংগদু, বিলাইছড়ি, কাপ্তাই, নানিয়াচর ও রাজস্থলী। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে কাপ্তাই লেক, উপজাতীয় জাদুঘর, চাকমা রাজবাড়ি, শুভলং ঝরনা অন্যতম। বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম থানা হলো এ জেলার জুড়াইছড়ি থানা (জনসংখ্যায়)।

৪৭. খাগড়াছড়ি জেলা: খাগড়াছড়ি একটি নদীর নাম। প্রাক্তন জেলা প্রধান কার্যালয়টি অসংখ্য খাগড়া গাছে পরিপূর্ণ "চেংড়িষ্ট্রিম" বা ছড়ার তীরে ছিল। এই খাগড়া গাছের নাম থেকে খাগড়া আর ছড়ার থেকে ছড়ি যুক্ত হয়ে খাগড়াছড়ি নামকরণ হয়।

এ জেলার মোট আয়তন ২৭০০ বর্গ কি.মি.। ৯টি উপজেলা নিয়ে চিংড়ি ও কর্নফুলী নদীর তীরে ১৯৮৪ সালে এ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উপজেলাগুলো হলো- খাগড়াছড়ি সদর, মহালছড়ি, মানিকছড়ি, পানছড়ি, লক্ষীছড়ি, দীঘিনালা, রামগড়, মাটিরাঙা ও গুইমারা। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে আলুটিলা পর্যটন কেন্দ্র, প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার, রিছং ঝরনা, পানছড়ি, শান্তিপুর অরণ্য কুটির, মং সার্কেলের রাজবাড়ি, দিঘিনালার দিঘি অন্যতম।

ঢাকা বিভাগ

বাংলাদেশের ১ম বিভাগ হিসেবে ঢাকা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৯ সালে। এ বিভাগের আয়তন ২০,৬৩০ বর্গ কি.মি.। মোট জেলার সংখ্যা ১৩ টি। সর্ববৃহৎ জেলা ঢাকা এবং ক্ষুদ্রতম জেলা নারায়নগঞ্জ। এ বিভাগের জেলাগুলো হলো:

৪৮. ঢাকা জেলা: বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা মোঘল পূর্ব যুগে কিছু গুরুত্ব ধারণ করলেও এ শহরটি ইতিহাস প্রসিদ্ধি লাভ করে মোঘল যুগে। ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট করে তেমন কিছু জানা যায় না। ক. জনশ্রুতি আছে, ১৬১০ খৃ. মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন ঢাকাকে সুবা বাংলার রাজধানী ঘোষণা করেন, তখন সুবাদার ইসলাম খাঁ আনন্দের বহি:প্রকাশ স্বরূপ শহরে ঢাক বাজানোর নির্দেশ দেন। বুড়িগঙ্গার কাছে "ঢাক"

বাজিয়ে যতদূর পর্যন্ত শোনা যায় ততদূর পর্যন্ত সীমানা নির্ধারণ করে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঢাক বাজানোর কাহিনী লোক মুখে কিংবদন্তির রূপ ধারণ করে এবং তা থেকেই এ শহরের নাম ঢাকা হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৬১০ খৃ. ইসলাম খাঁন চিশতি সুবাহ্ বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন এবং সম্রাটের নামানুসারে এর নামকরণ করেন জাহাঙ্গীর নগর। খ. এক সময় এ জনপদে প্রচুর ঢাক গাছ (বুটি ফুডোসা) ছিল; গ. 'ঢাকাভাষা' নামে একটি প্রাকৃত ভাষা এখানে প্রচলিত ছিল; ঘ. রাজতরঙ্গিনী-তে ঢাক্কা শব্দটি 'পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র' হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে অথবা এলাহাবাদ শিলালিপিতে উল্লেখিত সুমদ্রগুপ্তের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ডবাকই হলো ঢাকা। ঙ. কথিত আছে যে, সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকায় ভ্রমণকালে সন্নিহিত জংগলে হিন্দু দেবী দূর্গার বিগ্রহ খুঁজে পান। দেবী দূর্গার প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ রাজা বল্লাল সেন ঐ এলাকায় একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু দেবীর বিগ্রহ ঢাকা বা গুপ্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল তাই রাজা মন্দিরের নাম দেন ঢাকেশ্বরী মন্দির। আর এ মন্দিরের নাম থেকেই কাল ক্রমে স্থানটির নাম ঢাকা হিসেবে গড়ে ওঠে।

১৭৭২ সালে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ১৪৬৪ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে ঢাকা জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ জেলার ৫টি উপজেলা যেমন-কেরাণীগঞ্জ, সাভার, দোহার, নবাবগঞ্জ ও ধামরাই। বড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, বংশী ও তুরাগ হলো এ জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদ-নদী। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার,জাতীয় সংসদ ভবন, জাতীয় স্মৃতি সৌধ, জাতীয় জাদুঘর, শিশুপার্ক, লালবাগ কেল্লা, জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকাররম মসজিদ, আহসান মঞ্জিল, ঢাকেশ্বরী মন্দির, হোসেনী দালান, তারা মসজিদ, বাহাদুর শাহ পার্ক, কার্জন হল, সোহরাওযার্দী উদ্যান, বঙ্গভবন, গণভবন, বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং ঢাকা কমার্স কলেজ অন্যতম। জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জেলা ঢাকা এবং সর্বাধিক বৃহত্তম উপজেলা হলো সাভার।

৪৯. গাজীপুর জেলা: জনশ্রুতি আছে মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালে পালোয়ান গাজী নামক জনৈক মুসলিম কুস্তিগির এ জনপদে বসতি স্থাপন করেন এবং বহুদিন সাফল্যের সাথে এ অঞ্চল শাসন করেন। এ কুস্তিগির/ বীর পালোয়ানের নাম অনুযায়ী এ জেলার নামকরণ করা হয় গাজীপুর। আর একটি জনশ্রুতি হলো, সম্রাট আকবরের সময় চব্বিশ পয়গনার জায়গিরদার ছিলেন ঈশা খাঁ। এই ঈশা খাঁরই একজন অনুসারীর ছেলের নাম ছিল ফজল গাজী-যিনি ছিলেন ভাওয়াল রাজ্যের প্রথম প্রধান। তারই নাম বা নামের সাথে যুক্ত গাজী পদবী থেকে এ অঞ্চলের নামকরণ করা হয় গাজীপুর। এ জেলার পূর্বের নাম জয়দেবপুর। এ জয়দেবপুর নামটি কেন হলো, কতদিন থাকলো, কতদিন পর আবার উঠে গেল সেটিও প্রাসঙ্গিক এবং জ্ঞাতব্য। ভাওয়ালের জমিদার ছিলেন জয়দেব নারায়ণ রায় চৌধুরী। বসবাস করার জন্য এ জয়দেব নারায়ণ রায় চৌধুরী পীরাবাড়ি গ্রামে একটি গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। গ্রামটি ছিল চিলাই নদীর দক্ষিণ পাড়ে। এ সময় ঐ জমিদার নিজের নামের সাথে মিল রেখে এ জনপদের নাম রাখেন জয়দেবপুর এবং এ নামই বহাল ছিল মহকুমা হওয়ার আগ পর্যন্ত। উল্লেখ্য এখনো অতীত কাতর ঐতিহ্যমূখী স্থানীয়দের অনেকেই জেলাকে জয়দেবপুর বলেই উল্লেখ করেন। গাজীপুর সদরের রেলওয়ে স্টেশনের নাম এখনো জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশন। মোট কথা গাজীপুর জেলার আগের নাম জয়দেবপুর এবং তারও আগের নাম ভাওয়াল।

এ জেলার আয়তন ১৮০০ বর্গ কি.মি. জেলার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৮৪ খৃ. এবং ২০১৩ খৃ. ৭ জানুয়ারি সিটি কর্পোরেশন ঘোষণা করা হয়। তুরাগ, বালু, বানার ও শীতলক্ষ্যা নদীর অববাহিকায় কালিগঞ্জ, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, কাপাসিয়া ও গাজীপুর সদর উপজেলা নিয়ে গঠিত হয়েছে গাজীপুর জেলা। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে ভাওয়াল রাজবাড়ি, ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, বাংলাদেশ ধান গবেষণা একাডেমি, আনসার ও ভিডিপি একাডেমি, বঙ্গবন্ধু সাপারী পার্ক অন্যতম।

৫০. নারায়ণগঞ্জ জেলা: এ জনপদ প্রায় তিন হাজার বছরের পুরানো। ধারণা করা হয় হিন্দু ধর্মীয় দেবতা নারায়ণ ঠাকুরের নামানুসারে এ জেলার নামকরণ করা হয় নারায়ণগঞ্জ। ১৯৮৪ সাল ৭৬০ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে ধলেশ্বরী, শীতলক্ষা ও মেঘনা নদীর অববাহিকায় এ জেলা গঠিত হয়। বাংলার বার ভূঁইয়াদের অন্যতম প্রধান নেতা রাজা ঈশা খাঁর রাজধানী ছিল সোনারগাঁ। এক সময়ে পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকল ছিল না:গঞ্জে। এর উপজেলা সংখ্যা ৫টি-নারায়ণগঞ্জ সদর, আড়াইহাজার, সোনারগাঁও, বন্দর ও রূপগঞ্জ। এতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে সোনারগাঁও, পানাম নগর, পানাম সেতু, পরি বিবির মাজার, সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের মাজার, হাজী গঞ্জ দূর্গ ইত্যাদি অন্যতম। সোনারগাঁয়ের মুসলিন শাড়ী পৃথিবী বিখ্যাত।

৫১. নরসিংদী জেলা: রাজা নরসিংহের নাম থেকে নরসিংদী জেলার নামকরণ করা হয়। এ জেলার আয়তন ১১৪১ বর্গ কি.মি.। ১৯৮৪ সালে মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ ও শীতলক্ষা নদীর অববাহিকায় এ জেলা গঠিত হয়েছে। এর ৬টি উপজেলাগুলো হলো-নরসিংদী সদর, পলাশ, রায়পুর, বেলাবো, শিবপুর ও মনোহরদী। দর্শনীয় স্থানগুলো হলো-ওয়ারী বটেশ্বর, ঘোড়াশাল সার কারখানা, রঘুনাথের মন্দির, বিবি জয়নবের মসজিদ, ড্রিম হলিডে পার্ক অন্যতম। নরসিংদী কলার জন্য বিখ্যাত।

৫২. মুন্সিগঞ্জ জেলা: মুন্সিগঞ্জের প্রাচীন নাম ছিল ইন্দ্রাকপুর। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইন্দ্রাকপুর কেল্লার ফৌজদারের নাম ছিল ইন্দ্রাক। ধারণা করা হয় তাঁর নাম অনুযায়ী হয়েছে ইন্দ্রাকপুর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় রামপালের কাজী কসব গ্রামের মুন্সি এনায়েত আলী সাহেবের জমিদারীভূক্ত হওয়ার পর মুন্সি নাম থেকে ইন্দ্রাকপুরের নাম মুন্সিগঞ্জ নামে অভিহিত হয়।

৯৫৫ বর্গ কি.মি. এলাকায় ধলেশ্বরী, পদ্মা ও মেঘনা নদীর অববাহিকায় এ জেলা ১ মার্চ ১৯৮৪ সালে গঠিত হয়। ৬টি উপজেলা-মুন্সিগঞ্জ সদর, লৌহজং, টঙ্গীবাড়ি, শ্রীনগর, গজারিয়া ও সিরাজদীখান। ঐতিহাসিক স্থানের মধ্যে-রামপাল দিঘি, ইন্দ্রাকপুর দূর্গ, রাজা বল্লাল সেনের বাড়ি, অতীশ দীপংকরের জন্মভূমি, তাজপুর মসজিদ, পাথরঘাটা মসজিদ সোনাকান্দা দূর্গ নাটেশ্বর বৌদ্ধ মন্দির অন্যতম।

৫৩. মানিকগঞ্জ জেলা: কিংবদন্তি রয়েছে যে, মানিক শাহ্ নামে এক সুফি সাধকের নামানুসারে এ জেলার নাম হয়েছে মানিকগঞ্জ। আবার এও জনশ্রুতি আছে যে, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সেই বিশ্বাস ঘাতক মানিক চাঁদের নামানুসারে ইংরেজরা এ অঞ্চলের নামকরণ করেন মানিকগঞ্জ। এ জেলার আয়তন ১৩৭৯ বর্গ কি.মি.। ১৯৮৪ সালে এ জেলা গঠিত হয়। এর উপজেলা ৭টি। মানিকগঞ্জ সদর, ঘেয়র, শিবালয়, সাঁটুরিয়া, হরিরামপুর, দৌলতপুর সিংগাইর। ধলেশ্বরী, পদ্মা ও যমুনা এর প্রধান ৩টি নদী। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে বাইমাইলের নীলকুঠি, একডালা দূর্গ, ফোর্ড নগরের দুর্গ, নবরত্ন মঠ, বালিটির জমিদার বাড়ি (সাটুরিয়া), ইব্রাহীম শাহের মাজার অন্যতম।

৫৪. টাঙ্গাইল জেলা: জমিদার এনায়াতুলাহ খাঁ চৌধুরী লৌহজং নদীর টানের আইল দিয়ে যে পথে ক্রোশ খানিক পশ্চিমে দক্ষিণস্থ খুশনদপুর সদর কাচারীতে যাতায়াত করতেন তা টানের আইল বা টান আইল বলে বহু দিন উচ্চারিত হয়ে এক সময় টান আইল থেকে টাঙ্গাইল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এর আয়তন ৩৪২৪ বর্গ কি.মি.। ১৯৬৯ সালে বংশী, ধলেশ্বরী ও যমুনা নদীর অববাহিকায় ১২টি উপজেলা নিয়ে এ জেলা গঠিত হয়। এর উপজেলাগুলো হলো-টাঙ্গাইল সদর, মধুপুর, ভূয়াপর, মির্জাপুর, গোপালপুর, নাগরপুর, সখীপুর, কালিহাতি, বাসাইল, ঘাটাইল, ধনবাড়ি ও দেলদুয়ার। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে আতিয়া জামে মসজিদ, মধুপুরের গড়, বঙ্গবন্ধু সেতু, সাগরদিঘি,ইছামতি দিঘি, ধনবাড়ি মসজিদ ইত্যাদি। টাঙ্গাইলের শাড়ী ও পোড়াবাড়ির চমচম বিখ্যাত।

৫৫. কিশোরগঞ্জ জেলা: ১৮৬০ খৃ. কিশোরগঞ্জ মহকুমার জন্ম হয়। মহকুমার প্রথম প্রশাসক ছিলেন মি. বকসেল। বর্তমান কিশোরগঞ্জ তৎকালীন জোয়ার হোসেনপুর পরগনার অর্ন্তগত ছিলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকেও কিশোরগঞ্জ এলাকা 'কাটখালী' নামে পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিকদের ধারণা ও জনশ্রুতি মতে, এ জেলার জমিদার ব্রজনন্দ কিশর প্রামাণিকের নামের 'কিশোর' এবং তার প্রতিষ্ঠিত হাট বা 'গঞ্জ' যোগ করে অনুযায়ী এ জেলার নামকরণ করা হয় কিশোরগঞ্জ।

এর আয়তন ২৬৮৯ বর্গ কি.মি.। ১৯৮৪ সালে ১৩টি উপজেলা নিয়ে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, ধলেশ্বরী, কালনী, ধনু ও বাউলাই নদীর মহনায় এ জেলা গঠিত হয়। এর উপজেলাগুলো হলো- কিশোরগঞ্জ সদর, করিমগঞ্জ, পাকুন্দিয়া, ইটনা, মিটামাইল, তাড়াইল, কটিয়াদী, বাজিতপুর, কুলিয়ারচর, ভৈরব বাজার, নিকলী ও অষ্টগ্রাম। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে এগারসিন্ধুর দুর্গ, শহীদি মসজিদ, জঙাগলবাড়ি দুর্গ, শোলাকিয়া ঈদগাহ্ মাঠ, দিল্লির আখড়া, নটরাশ শীবমূর্তী অন্যতম।

৫৬. শরীয়তপুর জেলা: ঐতিহাসিক ফরায়েজি আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও উপমহা দেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ হাজী মো: শরিয়তুল্লাহর নামানুসারে এ জেলার নামকরণ করা হয় শরীয়তপুর। ১৯৮৪ সালে ১১৮২ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে পদ্মা, মেঘনা ও পালং নদীর অববাহিকায় এ জেলা গঠিত হয়। এর ৬টি উপজেলা-শরীয়তপুর সদর, ডামুড্যা, নড়িয়া, ভেদরগঞ্জ, জাজিরা ও গোসাইরহাট। দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে ফতেহজংপুর দুর্গ, কেদারবাড়ি ও মানসা বাড়ি অন্যতম।

৫৭. মাদারীপুর জেলা: জনশ্রুতি আছে সাধক হযরত বদর উদ্দিন শাহ্ মাদার (র.) এর নামানুসারে এ জেলার নামকরণ করা হয় মাদারীপুর। এর আয়তন ১১৪৫ বর্গ কি.মি.। ১৯৮৪ সালে এ জেলা গঠিত হয়। এর উপজেলা ৪টি- মাদারীপুর সদর, শিবচর, রাজৈর ও কালকিনী। নদ-নদী ৩টি পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ ও পুরাতন কুমার। দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে আওলিয়াপুর নীল কুঠি, খালিয়ায় প্রচীন রাম মন্দির, সেতপতি দিঘি, শাহ মাদারের দরগাহ্, মাদারীপুর লেক ও রাজারাম মন্দির।

৫৮. গোপালগঞ্জ জেলা: গোপালগঞ্জ জেলা শহরের রয়েছে প্রাচীন ইতিহাস। অতীতের রায়গঞ্জ বাজার আজকের জেলা শহর গোপালগঞ্জ। আজ থেকে প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে শহর বলতে যা বোঝায় তার কিছুই এখানে ছিল না। এর পরিচিতি ছিলো শুধু একটি ছোট বাজার হিসেবে। এ অঞ্চলটি ছিল মাকিমপুর স্টেটের জমদিার দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমনির এলাকাধীন ছিল। উল্লেখ্য রানী রাসমণি একজন জেলের মেয়ে ছিলেন। সিপাহি রাইটস্-এর সময় তিনি একজন উচ্চ পদস্ত ইংরেজ অফিসারের প্রাণ রক্ষা করেন। পরবর্তীতে তারই পুরস্কার স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার রাসমণিকে মাকিপুর স্টেটের জমিদারী প্রদান করেন এবং তাকে রাণী উপাধীতে ভূষিত করেন। রাণী রাসমণির এক নাতীর নাম ছিল নব-গোপাল। ধারণা করা হয় এই গোপালের নামানুসারে মধুমতি নদীর তীরে ছোট এই গঞ্জটির নাম রাখা হয় গোপালগঞ্জ। এ জেলার আয়তন ১৪৯০ বর্গ কি.মি. এবং এ জেলা গঠিত হয় ১৯৮৪ সালে। এর ৫টি উপজেলা। যেমন- গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানি, মকসুদপুর, টুঙ্গীপাড়া ও কোটালীপাড়া। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজার, চন্দ্রভর্মা ফোর্ট বা কোটাল দুর্গ, সেন্ট মথুরনাথ এ জি চার্চ, কোর্ট মসজিদ অন্যতম।

৫৯. ফরিদপুর জেলা: বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন শেখ ফরিদ (র) এর নামানুযায়ী এ জেলার নামকরণ করা হয় ফরিদপুর। এ জেলার আয়তন ২০৭৩ বর্গ কি.মি.। প্রতিষ্ঠাকাল ১৮১৫ খৃ.। উপজেলা ৯টি। ফরিদপুর সদর, সদরপুর, মধুখালী, চরভদ্রাসন, বোয়ালমারী, ভাঙ্গা, সালথা, নগরকান্দা ও আলফাডাঙ্গা। নদীর মধ্যে পদ্মা, মধুমতি, কুমার ও আড়িয়াল খাঁ। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে নদী গবেষনা ইনস্টিটিউট, গেরদা মসজিদ, বাসুদেব মন্দির, জগদ্বন্ধুর আঙ্গিনা, ফতেহাবাদ টাকসাল, কামারখালী গড়াই সেতু অন্যতম।

৬০. রাজবাড়ি জেলা: বাদশা আকবরের আমলে এ জনপদে রাজার বাড়ি ছিল। ধারণা করা হয় রাজার বাড়ি থেকেই এ জেলার নামকরণ করা হয় রাজবাড়ি। পদ্মা ও চন্দনা নদীর তীরে এ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালে। এর মোট আয়তন ১১১৯ বর্গ কি.মি.। উপজেলা ৫টি। রাজবাড়ি সদর, পাংশা, গোয়ালন্দ, কালুখালী ও বালিয়াকান্দী। দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে মীর মোশাররফ হোসের বাড়ি, লক্ষীকোলের রাজারবাড়ি, বাণী বহের জমিদার বাড়ি অন্যতম।

ময়মনসিংহ বিভাগ:

বাংলাদেশের সর্বশেষ বিভাগ এটি। সর্বশেষ ২০১৫ সালে এ বিভাগ ৪টি জেলার সমন্বয়ে গঠিত হয়। এ জেলার মোট আয়তন ১০,৫৬৯ বর্গ কি.মি.। মোট উপজেলা ৩৫টি। জেলাগুলো হলো-

৬১. ময়মনসিংহ জেলা: পরগণা মমিন শাহীকে কেন্দ্র করে জেলাটি গঠিত হওয়ায় ইংরেজ আমলে এর নাম মুমিনশাহী জেলা রাখা হয় এবং পর্যায়ক্রমে মাইমেনসিং যা বর্তমানে ময়মনসিংহ নামে পরিচিত। ৪৩৬৩ বর্গ কি.মি. আয়তনের এ জেলাটি ১৭৮৭ সালে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষা, বানার ও মহুরী নদীর অববাহিকায় গঠিত হয়। এর ১৩টি উপজেলাগুলো হলো- ময়মনসিংহ সদর, ত্রিশাল, গৌরিপুর, মুক্তাগাছা, ভালুকা, গফরগাঁও, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল, ফুলবাড়িয়া, ফুলপুর, ধোবাউড়া, হালুয়াঘাট ও তারাকান্দা। দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে জাতীয় কবি নজরুলের ত্রিশালের দরিরামপুর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গারো পাহাড়, গৌরিপুর ও মুক্তাগাছার রাজবাড়ি, আলেকজান্দ্রা ক্যাসেল, গসপেল চার্চ, বোকাইনগর দূর্গ এবং কেল্লা তাজপুর অন্যতম।

৬২. জামালপুর জেলা: হযরত শাহ্ জামাল (র.) নামক একজন ধর্মপ্রচারক এ অঞ্চলে ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন। কালক্রমে তাঁর নামানুসারে এ জনপদের নাম হয়ে যায় জামালপুর। ২০৩২ বর্গ কি.মি. এলাকার এ জেলাটি ১৯৭৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, যমনা ও বানার নদীর অববাহিকায় গঠিত হয়। এর ৭টি উপজেলাগুলো হলো- জামালপুর সদর, মেলন্দাহ দেওয়ানগঞ্জ, সরিষাবাড়ি, ইসলামপুর, বক্সীগঞ্জ ও মাদারগঞ্জ। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে যমুনা সারকারখানা, শাহ জামাল (র.) এর মাজার, দুরমুটের শাহ কামালের মাজার,

দয়াময়ী মান্দরপাঁচ গম্বুজ রসপাল জামে মসজিদ নরপাড়া দূর্গ অন্যতম।

৬৩. শেরপুর জেলা: গাজী বংশের শৈর আলী গাজীর নামানুসারে এ জনপদের নামকরণ করা হয় শেরপুর। এর আয়তন ১৩৬৪ বর্গ কি.মি.। ১৯৮৪ সালে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, বাটাই, কংশ, মৃগি ও মালিঝি নদীর মহনায় ৫টি উপজেলা নিয়ে শেরপুর জেলা গঠিত হয়। শেরপুর সদর, ঝিনাইগাতি, নালিতাবাড়ি, শ্রীবর্দী ও নকলা হলো এ জেলার ৫টি উপজেলা। দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে বারোদুয়ারী মসজিদ, হযরত শাহ্ কামালের (র.) এর মাজার, কসবার মুঘল মসজিদ, ঘাঘরা লস্কর বাড়ি মসজিদ, নয়আনি জমিদার নাট মন্দির, দরবেশ জরিপ শাহের মাজার, পানিহাটা দিঘি, গজনি অবকাশ কেন্দ্র অন্যতম।

৬৪. নেত্রকোণা জেলা: প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি, হাজং ও গারো উপজাতিদের বাসস্থান নেত্রকোনা জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য স্বতন্ত্র মন্ডিত। এ জেলার নামকরণের সঠিক কোনো ইতিহাস জানা যায়নি। নিতাই, সমেশ্বরী, মগরা, পাটকুরা, ধনু, কংস ও বাউলাই নদীর মোহনায় ২৮১০ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে ১৯৮৪ সালে এ জেলা গঠিত হয়। এ জেলার ১০টি উপজেলাগুলো হলো নেত্রকোণা সদর, মোহনগঞ্জ, মদন, খালিয়াজুড়ি, কেন্দুয়া, দূর্গাপুর, কলমাকান্দা, আটপাড়া, বারোহাট্রা ও পূর্বধলা। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে গারো পাহাড়, আটপাড়ার কৃষ্ণ বৌদ্ধমঠ, খোঁজার দিঘি, কেন্দুয়ার বোয়াইল বাড়ি দূর্গ, সালকি মাটিকাটাগ্রামের পূরাকৃর্তি, দূর্গাপুরের সুসং মহারাজার রাজবাড়ি অন্যতম।

[তথ্যসূত্র: জেলা তথ্য বাতায়ন, বাংলা পিডিয়া, উইকিপিডিয়া, ইসলামি ফাউন্ডেশনের মাসিক সবুজ পাতা এবং বিবিধ সূত্র হতে]

সুয়েতলানা এলেক্সিয়েভিচের নোবেল ভাষণ

হেরে যাওয়া যুদ্ধের কথা

অনুবাদ: মনসুর আলম
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

[বেলারুশের ননফিকশন লেখক ও অনুসন্ধানী সাংবাদিক সুয়েতলানা এলেক্সিয়েভিচের জন্ম ১৯৪৮ সালে ইউক্রেনে। তিনি ২০১৫ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারলাভ করেন। ২০১৫ সালের ৭ ডিসেম্বর নোবেল পুরস্কার গ্রহণকালে স্টকহোমের সুইডিস একাডেমিতে তিনি যে ভাষণ দেন তার বাংলা অনুবাদ উপস্থাপন করা হলো ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য।]

এই মঞ্চে আমি একা দাঁড়িয়েছি– এমন নয়। আমার চারপাশে মানুষের কণ্ঠস্বর আছে, হাজার হাজার কণ্ঠস্বর। আমার ছোটবেলা থেকে কণ্ঠস্বরগুলো আমার সঙ্গেই আছে। আমি বড় হয়েছি গ্রাম এলাকায়। আমরা ছোটরা বাইরে খেলাধুলা করতে পছন্দ করতাম। তবে সন্ধ্যা নামলেই ঘরে ফিরে আসতাম। কারণ তখন নিজেদের কুঁড়েগুলোর সামনের বেঞ্চে জড়ো হতেন গ্রামের বয়স্ক নারীরা। তাদের ক্লান্ত কণ্ঠ আমাদের চুম্বকের মতো টানত। তাদের কারো স্বামী, বাবা কিংবা ভাই ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমাদের গ্রামে কোনো পুরুষ মানুষ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। যুদ্ধের সময়ে বেলুরুশের প্রতি চারজনের একজন মারা গেছেন। তাদের মৃত্যু হয়েছে হয় যুদ্ধ করতে করতে, নয়তো মতাদর্শের বিরোধিতার কারণে। যুদ্ধের পরে আমরা ছোটরা নারীদের জগতে বড় হয়েছি। আমার সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট মনে আছে, নারীরা মৃত্যু নিয়ে নয়, বরং ভালোবাসা নিয়ে কথা বলতেন। তাদের গল্পের মধ্যে থাকত তাদের ভালোবাসার মানুষটিকে যুদ্ধে যাওয়ার আগের দিন বিদায় দেয়ার কথা। ভালোবাসার মানুষদের জন্য অপেক্ষায় থাকার কথা বলতেন তারা। তাদের গল্পে উঠে আসত কিভাবে তারা তখনও প্রিয়জনদের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষায় আছেন। বহু বছর চলে গেছে। তবু তারা অপেক্ষায় আছেন। তাদের কেউ কেউ বলতেন, ওর হাত পা না থাকুক, তবু আমি ওকে চাই। আমিই ওকে বয়ে বেড়াতাম। হাত নেই, পা নেই। তাতে কী!

মনে হয়, ভালোবাসা কী জিনিস আমি ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছি। ওই নারীদের দেখে বুঝতে পেরেছি।

তাদের সম্মিলিত কণ্ঠের কয়েকজনের সুর এখানে তুলে ধরছি:

প্রথম কণ্ঠস্বর

আপনারা এ সম্পর্কে এত কিছু জানতে চান কেন? বিষয়টি তো খুব দুঃখের। যুদ্ধের সময় আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বার্লিন পর্যন্ত সারা পথ আমি ট্যাঙ্কের ক্রুদের সঙ্গেই ছিলাম। মনে আছে, আমরা রাইখস্ট্যাগ বিল্ডিংয়ের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। তখনও সে আমার স্বামী হয়নি। সে আমাকে বলল, চলো আমরা বিয়ে করি। আমি তোমায় ভালোবাসি। শুনে আমি খুব বিচলিতবোধ করলাম– আমাদের জীবন তখন ছিল ময়লা আবর্জনা, রক্ত আর গোটা যুদ্ধের ভেতর। অশ্লীল কথাবার্তা ছাড়া আর কিছু আমাদের কানে আসেনি তখন। উত্তরে আমি বললাম, আমাকে আগে নারীর মর্যাদা দাও: আমাকে ফুল উপহার দাও। আমার কানে কানে আবেগময় মিষ্টিকথা বলো। সেনানিবৃত্তি পেলে আমি বিয়ের পোশাক তৈরি করে নেব। আমি এতটাই বিচলিত ছিলাম, মনে হলো ওকে মার দিয়ে বসি। সে নিজেও সব বুঝতে পারছিল। ওর একপাশের চোয়াল পুড়ে গিয়েছিল। লাল দাগ হয়ে গিয়েছিল। দেখতে পেলাম, ওর চোয়ালের দাগের ওপর দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। ওকে বললাম, ঠিক আছে বিয়ে হবে।

ঠিক এভাবেই বলেছিলাম ওকে। বিশ্বাসই হয়নি, আমি সত্যিই এভাবে, ঠিক একথাগুলোই বলেছিলাম ওকে। আমাদের চারপাশে তখন ছাই, ভাঙা ইটের গুঁড়ো আর মোটের ওপর যুদ্ধ। এর বেশি আর কিছু ছিল না।

দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর

চেরনোবিল নিউক্লিয়ার কারখানার নিকটে আমরা থাকতাম। আমি বেকারিতে কাজ করছিলাম, পেস্ট্রি তৈরি করছিলাম। আমার স্বামী ওখানকার জ্বালানি তত্ত্বাবধায়কের কাজ করত। তখন কেবল নতুন জীবন শুরু হয়েছে আমাদের। দোকানে যাওয়ার সময়ও আমরা দুজনে একজন আরেকজনের হাত ধরাধরি করে যেতাম। যে দিন পারমাণবিক চুল্লিতে বিস্ফোরণ ঘটে সেদিন আমার স্বামী দমকলের দায়িত্বে ছিল। যে সাধারণ পোশাকে ওরা ছিল ওই অবস্থাতেই ওরা এগিয়ে যায়। নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। কিন্তু ওদেরকে বিশেষ কোনো আলাদা পোশাক দেয়া হয়নি। আমাদের জীবন এমনই ছিল, জানেন তো। সারা রাত কাজ করে ওরা আগুন নেভায়। কিন্তু আগুন নেভানোর জন্যই জীবন সংহারী তেজক্রিয়ার সংশ্রব লাভ করে ওরা। পরের দিন সকালেই বিমানে ওদেরকে মস্কোতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরীক্ষায় দেখা যায় ওদের শরীরে তীব্র তেজস্ক্রিয়ার আক্রমণ ঘটেছে। এরকম তেজস্ক্রিয়ায় আক্রান্ত হলে কয়েক সপ্তাহের বেশি বাঁচে না মানুষ। আমার স্বামীর স্বাস্থ্য ভালো ছিল। ও ছিল অ্যাথলেট। আক্রান্তদের মধ্যে সবার শেষে মৃত্যু হয়েছিল ওর। আমি মস্কোতে ওর হাসাপাতালে পৌঁছলে আমাকে বলা হলো, ওকে বিশেষ বিচ্ছিন্ন এক চেম্বারে রাখা হয়েছে। কাউকে যেতে দেয়া হচ্ছে না ওর ওখানে। আমি ওদের অনুনয় করে বললাম, কিন্তু আমি তো ওকে ভালোবাসি। আমাকে বলা হলো, সৈনিকেরা ওদের দেখাশোনা করছে। কোথায় যাচ্ছেন আপনি বুঝতে পারছেন? আমি বললাম, আমি ওকে ভালোবাসি। ওরা আমার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল, আপনি যাকে ভালোবাসেন সে লোকটি আর আগের মতো নেই। তার গায়ে কারো ছোঁয়া লাগতে দেয়া যাবে না। অস্পৃশ্য এক বস্তুতে পরিণত হয়েছেন তিনি। বুঝতে পারেছেন এখন? আমি নিজেকেই বার বার বলতে লাগলাম ওই একই কথা, আমি ওকে ভালোবাসি। আমি ওকে ভালোবাসি। ভবনে আগুন লাগলে জরুরি নামার যে ব্যবস্থা থাকে তেমন একটা পথ বেয়ে উঠে আমি রাতের বেলা ওকে দেখার চেষ্টা করতাম। রাতের দারোয়ানকে অনুরোধ করতাম ভেতরে যেতে দিতে। ওদের কাউকে কাউকে হাতে টাকা গুঁজে দিয়েছি যাতে আমাকে ভেতরে যেতে দেয়। আমি ওকে ছেড়ে যাইনি। ওর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি ওর সঙ্গে ছিলাম। ওর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে আমার একটা মেয়ে হলো। কিন্তু মেয়েটা মাত্র কয়েক দিন বেঁচে ছিল। কত সাধের মেয়েটা! মেয়েটা পেটে আসার পর আমরা ওকে নিয়ে কত আনন্দ করতাম। আর আমিই মেয়েটাকে মেরে ফেললাম। মেয়ে আমার জীবন বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। সব তেজস্ক্রিয়া ওর শরীরে ধারণ করে চলে গেল মেয়েটা। দেখতে খুব ছোট ছিল ওর শরীরটা। কিন্তু আমি ওদের দুজনকেই খুব ভালোবাসতাম। ভালোবাসাকে কি কোনোভাবে হত্যা করা যায়? ভালোবাসা আর মৃত্যু এত নিবিড় কেন? ভালোবাসা আর মৃত্যু এক সঙ্গেই আসে। নিদারুণ এই সত্যকে কে ব্যাখ্যা করতে পারে? কবরের পাশে আমি নতজানু হই।

তৃতীয় কণ্ঠস্বর

জীবনে প্রথম এক জার্মানকে হত্যা করি, তখন আমার বয়স মাত্র দশ বছর। তবে ততদিনে মতাদর্শের বিরোধিতার মিশনে আমি দীক্ষালাভ করেছি। ওই জার্মান সৈনিকটা মাটির ওপর আহত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েছিল। আমাকে বলা হয়েছিল তার

পিস্তলটা নিয়ে নিতে। আমি দৌড়ে গেলাম তার কাছে। কিন্তু সে দুহাতে পিস্তলটা আঁকড়ে ধরে আমার মুখের দিকে তাক করল। তবে পিস্তলটা দিয়ে প্রথম গুলিটা সে ছুঁড়তে পারল না। আমিই ছুঁড়লাম।

এই ঘটনায় আমি তেমন ভীত হয়েছিলাম– তা নয়। যুদ্ধের সময় আমি তার কথা ভাবিনি কখনও। অনেক অনেক মানুষ মারা গিয়েছিল যুদ্ধে। আমরা বেঁচেছিলাম মৃতদের মাঝেই। অনেক বছর পরে ওই জার্মানকে হঠাৎ স্বপ্নে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। হঠাৎ করেই শুরু; এরপর মাঝে মাঝেই দেখতে লাগলাম একই স্বপ্ন। স্বপ্নে দেখতাম, আমি আকাশে উড়ে যাচ্ছি। সে আমাকে ওপরের দিকে উড়ে যেতে দিচ্ছে না। আমি ওপরে ওঠার চেষ্টা করছি। সে যখন ধরে ফেলছে, আমি তার সঙ্গে নিচে খাদের মতো একটা জায়গায় পড়ে যাচ্ছি। আমি ওখান থেকে বের হওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াচ্ছি। কিন্তু সে আমাকে উঠতে দিচ্ছে না। তার কারণে আমি ওখান থেকে উড়ে চলে আসতে পারছি না।

এই একই স্বপ্ন আমি দেখেছি। দশকের পর দশক ধরে এই স্বপ্ন আমাকে তাড়া করে ফিরেছে।

আমার ছেলেকে এই স্বপ্নের কথা বলতে পারিনি; তার বয়স অল্প ছিল। তার চেয়ে বরং রূপকথার গল্প পড়ে শুনিয়েছি ছেলেকে। আমার ছেলে এখন বড় হয়েছে। কিন্তু এখনও আমি তাকে এই স্বপ্নের কথা বলতে পারি না।

ফ্লবেয়ার নিজেকে মানব কলম বলেছেন। আমি বলব, আমি হলাম মানব কর্ণ। রাস্তায় হাঁটার সময় শব্দ, শব্দবন্ধ, বিস্ময়বোধের প্রকাশ ইত্যাদি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে। তখন মনে হয়, কত কত উপন্যাস চিহ্নহীন অবস্থায় আড়ালে চলে যাচ্ছে। অন্ধকারের আড়ালে চলে যাচ্ছে। মানব জীবনের কথোপকথনের দিকটা আমরা সাহিত্যের জন্য ধরে রাখতে পারিনি। এই দিকটাকে আমরা ভালো করে বুঝিনি; এই দিক নিয়ে আমরা বিস্ময়বোধ করিনি কিংবা এখান থেকে আনন্দও পাইনি। কিন্তু মানব জীবনের এই দিকটা আমাকে মুগ্ধ করে, টানে, আমাকে বন্দি করার মতো করে আটকে রাখে। মানুষের কথোপকথন আমার খুব ভালো লাগে। একাকী মানুষের কণ্ঠ শুনতেও আমার ভালো লাগে। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভালো লাগা এবং গভীর আবেগ হলো মানুষের কথোপকথনকে পছন্দ করা।

আমার এই মঞ্চে আসার পথটা বেশ দীর্ঘ। প্রায় চল্লিশ বছরের দীর্ঘ এই পথ। এই সময়ে আমি জনে জনে দেখা করেছি; একজনের কণ্ঠ থেকে আরেক জনের কণ্ঠের কাছে গিয়েছি তাদের একান্ত কথা শুনতে। এই পথ অনুসরণ করার কাজটা সব সময় ঠিকমতো করতে পেরেছি– বলতে পারছি না। কতবার ঘাত-অভিঘাত সামনে এসেছে, কতবার ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। এসব অভিজ্ঞতা হয়েছে মানুষের কারণেই। আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তার বিপরীত অভিজ্ঞতাও পেয়েছি। যা শুনেছি ভুলে যেতে ইচ্ছে করেছে; মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, অজ্ঞতার জগতের মধ্যেই ফিরে যাই। একাধিকবার আমি মানুষের উচ্চতম মহিমাও দেখেছি। আনন্দে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়েছে।

আমাদের দেশে ছোটবেলা থেকে আমাদের মৃত্যুবরণ করা শেখানো হয়েছে। আমাদেরকে মৃত্যু চেনানো হয়েছে। আমরা শুনেছি, মানুষের অস্তিত্বের কারণটাই হলো একটা মহিমান্বিত উদ্দেশ্য: তার যা কিছু আছে অন্যের জন্য ত্যাগ করতে হবে। নিজেকে পুড়িয়ে, নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে হবে অন্যের জন্য। মানুষকে অস্ত্র দিয়ে ভালোবাসতে শিখেছি আমরা। অন্য কোনো দেশে আমার জন্ম হয়ে থাকলে আমি এই পথে চলতে পারতাম না।

অশুভ শক্তি সব সময়ই নিষ্ঠুর। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে মন শক্ত রাখতে হবে। ঘাতক আর ঘাতকের বলি– তাদের উভয়ের মাঝেই আমরা বেড়ে উঠেছি। আমাদের বাবা-মায়েরা ভয়ের মধ্যে থাকলেও আমাদেরকে সেসব সম্পর্কে কিছু বলেননি। তবু আমরা বুঝেছি, আমাদের জীবনের বাতাসটাই ছিল বিষাক্ত। অশুভ শক্তি আমাদের ওপর সব সময় তীক্ষ্ণ নজর রাখত।

আমি পাঁচটি বই লিখেছি। তবে আমার মনে হয়, সবগুলো মিলিয়ে একটিই বই। এক স্বপ্নরাজ্যের ইতিহাসের বই।

ভারলাম সালামভ একবার লিখেছিলেন, মানবতার সত্যিকারের নবায়নের স্বার্থে আমি বিশাল এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। অবশ্য সে যুদ্ধে আমাদের পরাজয় ঘটেছিল। আমিও সেরকম যুদ্ধের ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করি। যুদ্ধের জয়পরাজয়সহ পুনর্নির্মাণ করে থাকি। সে ইতিহাসে থাকে পৃথিবীতে মানুষের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, সূর্যরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। অবশেষ হিসেবে থেকেছে শুধু রক্তের সমুদ্র আর লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের ধ্বংসাবশেষ। একটা সময় ছিল যখন বিশ শতকের কোনো রাজনৈতিক ধারণাই সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেনি। তখন পশ্চিমের

এবং পৃথিবীর সবখানেকার বুদ্ধিজীবীদের এতটা শক্তি আর আবেগের সঙ্গে টানতে পারেনি অন্য কিছুই। রেমন্ড আরন রাশিয়ার বিপ্লবকে বলেছেন 'বুদ্ধিজীবীদের আফিম'। তবে সমাজতন্ত্রের ধারণা কমপক্ষে দুহাজার বছর আগেকার। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বিষয়ক উপদেশের মধ্যে সমাজতন্ত্রের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। অ্যারিস্টোফেনের আদর্শের স্বপ্নের মধ্যে বলা হয়েছে, একটা সময় আসবে যখন সবকিছু সবার অধিকারে থাকবে। টমাস মোর, টমাসো ক্যাম্পানেলা, পরবর্তীতে সেইন্ট সিমোন, ফুরিয়ার এবং রবার্ট ওয়েনের মধ্যে দেখা যায় সমাজতন্ত্রের ধারণা। রুশ মানসে একটা সহজাত বৈশিষ্ট্য আছে; সে বৈশিষ্ট্যটাই সমাজতন্ত্রের আদর্শকে বাস্তবে রূপদান করতে চায়।

বিশ বছর আগে আমরা সোভিয়েতের 'লোহিত সাম্রাজ্য'কে অভিশাপ আর অশ্রুতে বিদায় জানিয়েছি। ইতিহাসের পর্যবেক্ষণ হিসেবে আমরা এখন সে অতীতের দিকে অধিকতর নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাকাতে পারি। কাজটা বেশ গুরুত্বের; কারণ সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত যুক্তিতর্ক শেষ হয়ে যায়নি। একটা নতুন প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে, সে প্রজন্মের মানুষদের কাছে আছে পৃথিবীর ভিন্ন চিত্র। তবে অনেক উঠতি বয়সীই এখন মার্ক্স এবং লেনিন পড়ছে। রাশিয়ার শহরে নতুন নতুন জাদুঘর তৈরি হয়েছে স্টালিনের নামে। তাঁর সম্মানে নতুন নতুন সৌধ তৈরি হয়েছে।

'লোহিত সাম্রাজ্য' শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু 'লোহিত মানব' বা সম-সোভিয়েত ব্যক্তি তো রয়ে গেছে। তার টিকে থাকার ক্ষমতা আছে।

আমার বাবা সম্প্রতি মারা গেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমাজতন্ত্রে তাঁর বিশ্বাস ছিল অটল। তাঁর কাছে দলের সদস্যের কার্ডও ছিল। সোভিয়েত মানস বোঝানোর জন্য অবমাননাকর বিশেষণ 'সোভক' ব্যবহার করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ তাহলে আমার বাবা, বন্ধুবান্ধব এবং আরো সব নিকটজনদের জন্যও এই বিশেষণটা ব্যবহার করতে হবে। তারা সবাই একই জায়গা থেকে এসেছেন, সমাজতন্ত্র থেকে। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই বড় বড় আদর্শ আছে। কেউ কেউ আবার বড় বড় রোমান্টিক। আজকের দিনে তাঁদের কাউকে কাউকে দাসত্বের রোমান্টিক বলা হয়। মানে তাঁরা স্বপ্নরাজ্যের দাস। আমার বিশ্বাস, তাঁরা সবাই অন্যরকম জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা সোভিয়েত জীবন যাপন করেন। কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি বহুদিন। এক সময়ের ইউএসএসআর নামক দেশটির বিশাল এলাকা আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। হাজার হাজার রেকর্ডারে টেপ করে রেখেছি মানুষের কথা। এটাই ছিল সমাজতন্ত্র; সোজা কথায়, এটাই ছিল আমাদের জীবন। আমি একটু একটু করে দেশীয় আর ঘরোয়া সমাজতন্ত্রের ইতিহাস সংগ্রহ করেছি। দেখার চেষ্টা করেছি, কিভাবে এই ইতিহাস মানুষের মনোজগতে নিজের প্রভাব ফেলে গেছে। মানব নামের খুব ছোট এই পরিসরটাই আমাকে টানে খুব। মানে একজন ব্যক্তিমাত্র। আসলে ব্যক্তি মানুষের ওপরেই তো সবকিছু ঘটে।

যুদ্ধের অল্প কিছুদিন পরেই থিয়োডর অ্যাডর্নো খুব বেদনাহত হয়ে লিখলেন, আউসভিৎসের পরে কবিতা লেখা অসভ্যতার কাজ। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে চাই আমার শিক্ষক অ্যালেস অ্যাডামোভিসের নাম। তিনি অনুভব করেছেন, বিশ শতকের দুঃস্বপ্ন সম্পর্কে গদ্য লেখা মানে ভ্রষ্টাচার করা। নতুন কিছু তৈরি করার দরকার কী? আপনি শুধু সত্যকে যেভাবে দেখেছেন সেভাবে তুলে ধরুন। প্রয়োজন অত্যুত্তম সাহিত্য। বাস্তব চিত্র যারা দেখেছেন তারাই কথা বলবেন। নিট্‌শের কথা মনে পড়ছে। তিনি বলেছেন, কোনো শিল্পীই বাস্তবতার সমান হতে পারেন না। তিনি বাস্তবতাকে ওপরে তোলার ক্ষমতা রাখেন না।

সত্য একটিমাত্র হৃদয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না, একজনের মানসের সঙ্গে খাপ খেয়ে চলে না– এ বিষয়টি আমাকে সব সময় ভাবিয়েছে। সত্য অপরিমেয়; সত্যের মধ্যে আছে বৈচিত্র্য; সত্য সারা পৃথিবীতে ছড়ানো ছিটানো। দস্তয়েভস্কি মনে করতেন, সাহিত্যে যতটুকু মানবতা ধরা আছে তার চেয়ে বেশি মানবতা আছে মানবতার নিজের কাছেই। তাহলে আমি কী করছি? আমার কাজটা কী? আমি প্রাত্যহিক জীবনের আবেগ অনুভূতি, চিন্তাচেতনা আর শব্দ সংগ্রহ করি। আমার সময়ের জীবনকেই সংগ্রহ করি আমি। আমি মানুষের আত্মার ইতিহাস বিষয়ে জানতে আগ্রহী। আত্মার প্রাত্যহিক জীবন এবং এর মতো ছোটখাটো বিষয়কে ইতিহাসের সামগ্রিক চিত্র অগ্রাহ্য করে থাকে কিংবা অবহেলা করে থাকে। আমি হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস নিয়ে কাজ করি। এখনও আমাকে প্রায়ই শুনতে হয়, আমি যা লিখছি সেটা সাহিত্য নয়; আমার লেখাকে বড়জোর দলিল বলা যায়। আজকের দিনে সাহিত্য কী? কে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন? আমাদের জীবন আগের চেয়ে অনেক বেশি গতিসম্পন্ন। আধার আর আঙ্গিকের মধ্যে ফাটল তৈরি

হয়। আধার আঙ্গিককে ভেঙে ফেলে পরিবর্তন করে। সব আধারই তার আধেয়র কিনারা উপচে পড়তে পারে। সংগীত, চিত্রকলা, এমনকি দলিলের শব্দও দলিলের সীমানা পার হয়ে যেতে পারে। বাস্তবতা আর কল্পনার বুননের মাঝে আর কোনো সীমা রেখা নেই। একটার প্রবাহ আরেকটার জগতে অহরহ ঢুকে যেতে পারে। প্রত্যক্ষদর্শীরাও নিরপেক্ষ নন। গল্প বলার সময় মানুষ নিজেও খানিকটা তৈরি করে নেয়। ভাস্কর যেমন পাথরের সঙ্গে সংগ্রাম করে ভাস্কর্য তৈরি করেন, তারাও তেমনি সময়ের সঙ্গে লড়াই করে গল্প তৈরি করেন। তারা অভিনেতা। আবার তারাই স্রষ্টা।

আমার আগ্রহ ক্ষুদ্র মানুষদের প্রতি। বরং বলতে পারি, তারা ক্ষুদ্র হলেও মহান। কারণ তাদের দুর্ভোগ তাদের পরিচয়কে ব্যাপক পরিসরে ছড়িয়ে দিয়ে থাকে। আমার বইগুলোতে এই মানুষেরাই তাদের নিজেদের ইতহাস বয়ান করে থাকেন। তাদের সেই বয়ানের ভেতরে বড় ইতিহাসও চলে আসে। আমাদের জীবনে কী কী ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে এতসব বুঝে দেখার সময় আমাদের থাকে না। আমরা শুধু ঘটনাগুলো বয়ান করতে চাই। শুরুতে বলা যায়, যা যা ঘটেছে সেসব কমপক্ষে মুখে বলে প্রকাশ করা তো উচিত আমাদের। আমরা সে কাজটা করতেও ভয় পাই। আমরা অতীতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেও পারিনা। দস্তয়েভস্কির 'ডেমনস'-এ আলাপের শুরুতেই শাতোভ স্তাভরোজিনকে বলে, তুমি আমি দুটো জীব; আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে সীমাহীন অসীমে। এই জগতে এটাই শেষ সাক্ষাৎ। সুতরাং তোমার ওই সুর বাদ দিয়ে মানুষের মতো করে কথা বলো। কমপক্ষে একটি বারের জন্য মানুষের কণ্ঠে কথা বলো।

আমার প্রধান চরিত্রদের সঙ্গে আমার কথাবার্তাও অনেকটা এরকম করেই শুরু হয়। অবশ্য তারা তাদের নিজের সময় থেকে কথা বলেন। তারা শূণ্যের ভেতর থেকে কথা বলতে পারেন না। তবে মানুষের মানস জগতে পৌঁছনো খুব কঠিন কাজ। কারণ পথে অনেক অনেক টেলিভিশন আর খবরের কাগজের ছড়াছড়ি। আরো আছে শতাব্দীর কুসংস্কার, সময়ের পক্ষপাতিত্ব, প্রতারণা ইত্যাদি।

সময় কিভাবে গড়িয়েছে; ধারণা কিভাবে মরে গেছে, মৃত আদর্শের পথ কিভাবে আমি অনুসরণ করেছি– এসব দেখানোর জন্য আমার ডায়েরি থেকে কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে শোনাতে চাই।

১৯৮০– ১৯৮৫

যুদ্ধ সম্পর্কে আমার একটা বই লেখা চলছে। যুদ্ধ নিয়ে কেন লিখছি? কারণ আমরা হলাম যুদ্ধের মানুষ। আমরা সব সময় যুদ্ধের ভেতরই ছিলাম, কিংবা যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ছিলাম। ভালো করে খেয়াল করে দেখলে যে কেউ বুঝতে পারবেন, আমাদের সবার চিন্তাচেতনার সবকিছু যুদ্ধকেন্দ্রিক। বাড়িতে, রাস্তাঘাটে– সবখানে। সে কারণেই আমাদের দেশে মানুষের জীবন এত সস্তা।

শুরু করেছি সন্দেহ নিয়ে: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে আরেকটা বই? কিসের জন্য?

আমার এক ভ্রমণে এক নারীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে এক গল্প শুনলাম: তাঁরা লাডোগা হ্রদ পার হচ্ছিলেন। তখন শীতের দিন। হ্রদের পানিতে তাঁদের নড়াচড়া দেখেই শত্রুরা টের পেয়ে যায়। তাঁদের উদ্দেশ করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায় শত্রুরা। বরফাচ্ছন্ন পানির নিচে মানুষজন ঘোড়া– সব ডুবে চাপা পড়ে যায়। ঘটনাটা রাতের বেলা ঘটেছিল। হাতের কাছে একজনকে পেয়ে তিনি জাপটে ধরেন এবং টানতে টানতে তীরের দিকে নিয়ে আসেন। তিনি মনে করেছিলেন আহত কেউ। তিনি বলেন, আমি যাকে তুলছিলাম তার পরনে কোনো কাপড় ছিল না। তার ওপরে তো ভেজা ছিলই। ভাবলাম, তার কাপড়চোপড় সব ছিড়ে গেছে। ডাঙায় তুলে আনার পরে দেখলাম, আমি যাকে মানুষ মনে করে টেনে তুলেছি সে আসলে মানুষ নয়, সেটা বড় আকারের একটা মাসিন মাছ।

যুদ্ধের কারণে মানুষেরা দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য প্রাণী পাখি, মাছ– এরা কী করেছে?

আমার আরেক ভ্রমণে শোনা আরেক নারীর ঘটনা। যুদ্ধের সময় তিনি মেডিক্যালের ছাত্রী ছিলেন। একবার তিনি যুদ্ধের ভেতর গোলার আঘাতে সৃষ্ট এক গর্তে টেনে নিয়ে আসেন অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকা এক আহত সৈনিককে। আড়ালে নিয়ে আসার পর দেখতে পান আহত সৈনিকটি জার্মান। লোকটির পা ভেঙে গেছে, প্রচণ্ড রক্ত ঝরছে বিভিন্ন ক্ষত জায়গা থেকে। সে তো শত্রু। তার জন্য কী করার আছে? ওই নারীর নিজের পক্ষের অনেকেই তো মারা যাচ্ছে! কিন্তু তিনি জার্মান সৈনিককে ব্যান্ডেজ করে দিলেন এবং ওখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে এলেন। বাইরে এসে দেখেন, এক রুশ সৈনিক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাকেও টেনে

আনলেন নিরাপদে। জ্ঞান ফেরার পর রুশ সৈনিক জার্মান সৈনিককে হত্যা করতে চাইল। জার্মান সৈনিকটিও জ্ঞান ফেরার পর মেশিনগান জাপটে ধরে রুশ সৈনিকটিকে মারতে উদ্যত হলো। ওই নারী বলেন, ওদেরকে থামানোর জন্য আমি একবার এর গালে আরেকবার ওর গালে চড় মারতে থাকি। ততক্ষণে আমাদের সবারই পা রক্তের ভেতর ডুবে আছে। তাদের দুজনের রক্ত মিশে এককাকার হয়ে গেছে।

এরকম যুদ্ধের কথা আমিও আগে শুনিনি। নারীর যুদ্ধ। এখানে কোনো বীরের কথা বলা হয়নি। একদল লোক আরেক দল লোককে বীরত্বের সঙ্গে হত্যা করছে তেমন নয়। নারীদের পৌনঃপুনিক বিলাপের কথা মনে আছে, যুদ্ধের পরে মাঠের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলে দেখতে পেতেন, ওরা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে আছে। সবার বয়স খুব কম। দেখতে খুব সুন্দর। ওখানে, মাঠের মধ্যে পড়ে আছে ওরা, চোখ আকাশের দিকে। দুপক্ষের ওদের সবার জন্যই আপনার দুঃখবোধ হতো।

এই যে এই দৃষ্টিভঙ্গি– দুপক্ষের ওদের সবার জন্য– এখান থেকেই আমি ধারণা পেয়েছি আমার বইয়ের। যুদ্ধ তো হত্যা ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবেই যুদ্ধ নারীদের স্মৃতিতে স্থায়ী হয়ে আছে। এই যে, এই লোকটা হাসি মুখে কথা বলছিলেন, ধুমপান করছিলেন; কিন্তু এখন আর তিনি নেই। মানুষদের চলে যাওয়া নিয়েই বেশি কথা বলতেন নারীরা। তাদের কথায় থাকত যুদ্ধের সময়ে সব কিছু কেমন করে নাই হয়ে যেতে পারে, মানুষ এবং মানুষের সময় কেমন করে নাই হয়ে যায়। হ্যাঁ, রণাঙ্গনের জন্য তাঁরা স্বেচ্ছাসেবা দিয়েছেন মাত্র সতেরো আঠারো বছর বয়সে। কিন্তু তাঁরা কাউকে হত্যা করতে চাননি। তবু তাঁরা মৃত্যুকে বরণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। মাতৃভূমির জন্য জীবন দিতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। স্টালিনের জন্য জীবন দিতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। ইতিহাস থেকে এইসব কথা আপনারা মুছে দিতে পারবেন না।

দুবছর আটকে ছিল বইটা, প্রকাশ হয়নি। পেরেসত্রয়কা এবং গর্বাচেভের আগে প্রকাশ হয়নি। সেনসর কর্তা জ্ঞান দান করার সুরে আমাকে বলেছিলেন, আপনার বই পড়ার পরে আর কেউ যুদ্ধ করবে না। আপনার বর্ণনায় যুদ্ধ তো ভয়াবহ। আপনার বইয়ে কোনো বীরের স্থান নেই কেন? আমি কোনো বীরের খোঁজ করতে চাইনি। যুদ্ধের এমন অনেক প্রত্যক্ষদর্শী এবং অংশগ্রহণকারী ছিলেন যাদের কথা কেউ শোনেনি; তাঁদের অভিজ্ঞতার গল্প শুনে ইতিহাস লেখাই হলো আমার উদ্দেশ্য। তাদের অভিজ্ঞতার কথা শোনার জন্য কেউ তাদের কখনও কিছু জিজ্ঞেস করেনি। মহান সব ধারণা সম্পর্কে মানুষেরা কী ভাবে? আমরা জানি না। যুদ্ধের ঠিক পরপরই একজন মানুষ এক রকম যুদ্ধের কথা বলবেন। কয়েক দশক পরে সেটা অবশ্য আরেক রকম যুদ্ধ হয়ে যাবে। ওই ব্যক্তিটির মধ্যেই কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটে যাবে। কারণ তাঁর সারা জীবনটাকেই তিনি নিজের স্মৃতির মধ্যে ভাঁজ করে রেখে দেবেন। তাঁর সামগ্রিক সত্তাকেই রেখে দেবেন স্মৃতির মধ্যে। তিনি ওই বছরগুলোতে কিভাবে জীবন যাপন করেছেন, কী কী পড়েছেন, দেখেছেন, কাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, তাঁর বিশ্বাসের মধ্যে কী কী আছে– সব জড়ো হবে তাঁর স্মৃতির মধ্যে। শেষমেষ, তিনি সুখি নাকি অসুখি সেটাও থাকবে। দলিল হলো জীবন্ত মানুষের মতো। আমরা বদলে গেলে সেগুলোও বদলে যায়।

আমি পুরোপুরি নিশ্চিত, ১৯৪১ সালের যুদ্ধের সময়ের আর কোনো অল্পবয়সী নারীকে পাওয়া যাবে না। 'লাল' মানুষদের বা কমিউনিস্টদের ধারণার সেটাই ছিল সর্বোচ্চ বিন্দু, রাশিয়ার বিপ্লব এবং লেনিনের চেয়েও উঁচু পর্যায়ের। তাঁদের বিজয় গুলাগকেও ম্লান করে দেয়। আমি এই নারীদের খুব ভালোবাসি। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে স্টালিন সম্পর্কে কিছু বলা যেত না। কিংবা যুদ্ধের পরে সবচেয়ে সাহসী ও স্পষ্টবাদী বিজেতাদের সরাসরি ট্রেন বোঝাই করে যে সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল– সে সম্পর্কে তাঁদের সঙ্গে কথা বলা যায় না। যারা সাইবেরিয়া থেকে ফিরে এসেছিলেন তারা সবাই চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের একজনের মুখে একবার শুনেছিলাম, আমরা শুধু যুদ্ধের সময়টাতেই মুক্ত ছিলাম। রণাঙ্গনেই কেবল মুক্ত ছিলাম আমরা। আমাদের মূলধন হলো দুর্ভোগ, আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ হলো দুর্ভোগ, তেল গ্যাস নয়। আমরা এই একটি জিনিসই অবিরাম উৎপাদন করে যেতে পারি। আমাদের দুর্ভোগকে কেন স্বাধীনতায় পরিণত করা যায় না? এ প্রশ্নের উত্তর আমি সব সময় খুঁজে বেড়াই। দুর্ভোগকে স্বাধীনতায় পরিণত করার প্রয়াস কি সত্যিই বৃথা? শাদায়েভ ঠিকই বলেছেন: রাশিয়া একটি স্মৃতি-বর্জিত দেশ। পুরোপুরি স্মৃতিবিলোপের একটা জায়গা, সমালোচনা আর চিন্তার জন্য চেতনার একেবারে অনভিজ্ঞতার একটি জায়গা। তবে বড় বড় বইপুস্তক আমাদের পায়ের তলায় স্তূপিকৃত অবস্থায় আছে।

১৯৮৯

আমি কাবুলে। আর যুদ্ধ বিষয়ে লিখতে চাই না। কিন্তু আমি এখানে একটা বাস্তব যুদ্ধের মধ্যেই আছি। খবরের কাগজ 'প্রাভদা'য় লেখা হয়েছে: সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আমরা ভ্রাতৃসম আফগান জনগণকে সাহায্য করছি। যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষ আর জিনিসপত্র সবখানে দেখতে পাওয়া যায়। এই হলো যুদ্ধের সময়।

গতকাল ওরা আমাকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যেতে চায়নি। বলেছে, ইয়াং লেডি, আপনি হোটেলেই থাকুন। পরে আমরা আপনার জন্য জবাবদিহি করব। আমি হোটেলে বসে আছি আর ভাবছি, অন্যদের সাহস আর ঝুঁকির কথা পর্যবেক্ষণ করার মধ্যে খানিকটা অনৈতিকতা আছে। আমি এখানে দুসপ্তাহ হলো আছি। যুদ্ধ যে পুরুষের পেশিশক্তিসম্পন্ন স্বভাবের ফল– সেকথা এখনও মন থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। আর পুরুষের এই স্বভাবটা মেপে দেখার ক্ষমতা আমার নেই। তবে যুদ্ধে প্রাত্যহিক আনুষঙ্গিক বিষয়াদি উঁচু মানের। আমি নিজেই বুঝতে পেরেছি মেশিনগান, মাইন, ট্যাঙ্ক– এগুলো দেখতে তো ভারী সুন্দর। অন্য মানুষদের কিভাবে সর্বোত্তম পন্থায় হত্যা করা যায় তার জন্য মানুষ তো বেশ চিন্তা ভাবনা ভালোই খাটিয়েছে। সত্য আর সৌন্দর্যের মাঝের বিবাদ চিরন্তন। আমাকে একটা ইতালিয় নতুন মাইন দেখানো হলো। আমি নারীসুলভ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বললাম, বাহ্ সুন্দর তো! এত সুন্দর কেন এটা? ওরা সামরিক কায়দায় আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল: কেউ যদি এটার ওপর গাড়ি চালিয়ে কিংবা একটা বিশেষ কোণাকুণিতে এভাবে পা ফেলে, তাহলে আধা বালতি মাংসের পিন্ড ছাড়া আর কিছু থাকবে না তার।

মানুষজন এখানে অস্বাভাবিক বিষয় নিয়ে অতি স্বাভাবিক সুরে কথা বলে যেন এই অস্বাভাবিক বিষয়গুলো বৈধ এবং এখানে এগুলো চলতেই পারে। তাহলে, জানেন তো, যুদ্ধ এমনই। এসব চিত্র দেখে কারো মাথা খারাপ হয় না। যেমন এখানে একজন মানুষ পড়ে আছে। সে কোনো প্রাকৃতিক শক্তির হাতে নিহত হয়নি। দুর্ভাগ্যবশত আরেকজন লোকের হাতে তার মৃত্যু হয়েছে।

আমি 'ব্ল্যাক টিউলিপ' বোঝাই করা দেখলাম (মানে যে বিমান দস্তার কফিনে যুদ্ধে নিহতদের দেশে নিয়ে যায়)। মৃত সৈনিকদের প্রায়ই চল্লিশের দশকের সামরিক পোশাক পরানো হয়, মানে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা জোধপুরস নামের পাজামা। এখন আর খুব একটা পাওয়া যায় না সেগুলো। এ প্রসঙ্গে সৈনিকেরা বলাবলি করছিল, এগুলোর কয়েকটা শুধু ফ্রিজে রেখে দেয়ার জন্য সরবরাহ করা হয়েছে। এজন্য এগুলো থেকে পুরুষ শুওরের পচা মাংসের গন্ধ পাওয়া যায়। আমি এসব সম্পর্কে লিখতে যাচ্ছি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আমার দেশের কেউ বিশ্বাস করবে না আমার কথা। আমাদের খবরের কাগজগুলো শুধু সোভিয়েত সৈনিকদের দ্বারা বন্ধুত্বের পথ তৈরি হওয়ার খবর লেখে।

তাদের অনেকের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। অনেকেই স্বেচ্ছায় এসেছেন। তারা এখানে আসতে চেয়েছেন। লক্ষ করেছি, তাদের বেশিরভাগই শিক্ষিত পরিবার থেকে এসেছেন। বুদ্ধিজীবী মহলের প্রতিনিধি তারা। শিক্ষক, চিকিৎসক, লাইব্রেরিয়ান– এরকম পেশা থেকে এসেছেন। এক কথায় বই পাগলের দল এখানে এসেছেন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তারা আফগান লোকদের সাহায্য করবেন– সত্যিকারের এমন স্বপ্ন নিয়েই তারা এসেছেন। আর এখন নিজেদের বোকামিতে নিজেরাই হাসেন তারা। বিমানবন্দরে একটা জায়গা আমাকে দেখানো হয়েছে; সেখানে দস্তার শত শত কফিন সূর্যের আলোয় কেমন রহস্যজনকভাবে চকচক করছে। ওখানে আমার সঙ্গে যে অফিসার ছিলেন তিনি না বলে পারলেন না, কে জানে, একদিন আমার কফিনও ওখানে থাকবে। কফিনের মধ্যে ওরা আমাকে আটকে রাখবে। কিসের জন্য যুদ্ধ করছি এখানে? নিজের কথায় নিজেই তিনি যেন ভয় পেয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি করে বললেন, একথাগুলো যেন লিখবেন না।

রাতে মৃতদেরকে স্বপ্নে দেখি। তাদের সবার চোখে মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন। বলেন কী! আমাকে হত্যা করা হয়েছে? সত্যিই আমাকে হত্যা করা হয়েছে?

একদল নার্সের সঙ্গে গাড়ি চালিয়ে একটা হাসপাতালে গেলাম। হাসপাতালটা সাধারণ আফগানদের জন্য। ওখানকার বাচ্চাদের জন্য আমরা খেলনা, চকলেট কুকিজ ইত্যাদি নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রায় গোটা পাঁচেক টেডি বিয়ারও নিয়েছিলাম। হাসাপাতালে পৌঁছে দেখলাম, এটা একটা লম্বা ব্যারাক। বিছানা হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটা কম্বলের বেশি কেউ পায়নি। কোলে বাচ্চা নিয়ে অল্পবয়সী এক নারী আমার দিকে এগিয়ে এলেন। কিছু একটা বলতে চাইলেন। গত দশ বছরে এখানকার প্রায় সবাই সামান্য রুশ ভাষা

বলতে পারে। তাঁর কোলের শিশুটির দিকে একটা খেলনা এগিয়ে দিলাম। শিশুটি দাঁত দিয়ে কামড় দিয়ে নিল খেলনাটা। বিস্মিত হয়ে আমি শিশুটির মাকে জিজ্ঞেস করলাম, দাঁত দিয়ে নিল কেন? শিশুটির ছোট শরীর থেকে কম্বলখানা একটু উঠিয়ে দেখালেন তিনি। বাচ্চা ছেলেটার হাত দুটো নেই। মা বললেন, আপনাদের রাশিয়ানরা বোমা ফেলেছিল। সে সময়ের ঘটনা। আমি পড়ে যাচ্ছিলাম। কেউ একজন আমাকে ধরে ঠেকাল।

আমি দেখেছি, আমাদের রকেটগুলো সেখানে গ্রামগুলোকে কিভাবে চষা জমি বানিয়ে ফেলেছে। আফগানদের একটা কবরস্থানে গিয়েছি আমি। কবরস্থানটা একটা গোটা গ্রামের সমান। কবরস্থানের মাঝখানে কোথায় যেন এক আফগান নারী চিৎকার করছিল। এরকম এক মায়ের কান্না শুনেছিলাম মিনসকের কাছের এক গ্রামে। বাড়ির ভেতর তখন একটা দস্তার কফিন আনা হচ্ছিল। এই চিৎকার কোনো মানুষ কিংবা জন্তুর নয়; এর সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছি কাবুলের এক কবরস্থানে শোনা কান্নার।

আমাকে স্বীকার করতেই হবে, হঠাৎ করেই আমি মুক্ত হয়ে গেছি– এমন নয়। আমার বিষয়ে আমি নিষ্ঠ ছিলাম। তারা সবাই আমার ওপরে বিশ্বাস রাখতে পেরেছিলেন। আমাদের প্রত্যেকেরই স্বাধীনতার দিকে নিজ নিজ পথ আছে। আফগানিস্তান যাওয়ার আগে আমি বিশ্বাস করতাম, সমাজতন্ত্রের ও মানুষের মতো মুখ আছে। আফগানিস্তান থেকে যখন ফিরে আসি, তখন আমার মনে আর কোনো ধরনের অন্ধবিশ্বাস নেই। ফিরে এসে বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ার মুহূর্তেই বললাম, আমায় মাফ করো, বাবা। আমাকে তুমি সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী করে বড় করে তুলেছ। তুমি আর মা যে সব ছেলেদের পড়াও (আমার বাবা মা দুজনই গ্রামের স্কুলশিক্ষক ছিলেন) তাদের মতো বয়সী ছেলেরা বিদেশ বিভূঁইয়ে মানুষ মারছে। যাদেরকে হত্যা করছে তাদেরকে ওরা চেনেও না। আমার এসব দেখার পর তোমার সব কথা এখন আমার মনের ভেতর ছাইভস্মে পরিণত হয়েছে। আমরা হত্যাকারী। বাবা, তুমি বুঝতে পারছ?

আমার বাবা কেঁদে ফেললেন।

মুক্ত হয়ে অনেকেই আফগানিস্তান থেকে ফিরে এসেছে। কিন্তু অন্য ধরনের দৃষ্টান্তও আছে। আফগানিস্তানের একটা অল্পবয়সী ছেলে একদিন চিৎকার করে বলেছিল, আপনি একজন নারী। আপনি যুদ্ধের কী বুঝবেন? আপনি মনে করেছেন বইয়ে কিংবা সিনেমায় মানুষের যেভাবে মহিমান্বিত মৃত্যু হয় সেরকম হয়ে থাকে যুদ্ধে, তাই না? গতকাল আমার বন্ধু নিহত হয়েছে। মাথায় গুলি নিয়ে সে আরো দশ মিটার এগিয়ে গিয়েছে। মাথায় হাত দিয়ে নিজের মগজ আটকে রাখার চেষ্টা পর্যন্ত করেছে।

সাত বছর পরে সেই ছেলেটাই একজন সফল ব্যবসায়ী হয়েছে। এখন তার আফগানিস্তানের গল্প বলতে ভালো লাগে। সে এখন আলাদা ব্যক্তি হয়েছে। মৃত্যুর মধ্যে দেখা সেই ছেলেটি আর নেই সে। মাত্র বিশ বছর বয়সে সে ছেলেটি মৃত্যুবরণ করতে চায়নি। এখন সে ছেলেটিই বড় হয়েছে। আমাকে টেলিফোনে জিজ্ঞেস করেছে, আপনার বই কিসের জন্য? আপনার বই অতিমাত্রায় আতঙ্ক জাগায়।

আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করি, যুদ্ধ সম্পর্কে আমি কোন ধরণের বই লিখতে চাই। যুদ্ধের ওপর এমন একজনকে নিয়ে লিখতে চাই যে মানুষটি গুলি ছোড়ে না। অন্য কোনো মানুষকে গুলি করে না। সে যুদ্ধের কথায় কাতর হয়ে পড়ে। কোথায় আছে এমন মানুষ? তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি এখনও।

১৯৯০–১৯৯৭

বিশাল এক দেশের ওপর পর্যবেক্ষণ চালানোর গল্প বলে বলেই রাশিয়ার সাহিত্য সবার কাছে ভালো লাগে। আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি সব সময় ট্র্যাজেডি নিয়ে লেখেন কেন? উত্তরে বলে থাকি, কারণ ট্র্যাজেডির ভেতরেই আমাদের বসবাস। আমরা এখন বিভিন্ন দেশে বাস করি। কিন্তু 'লাল' মানুষেরা সবখানে আছে। তারাও ওই একই জীবন থেকে এসেছে এবং তাদেরও স্মৃতি একই রকম।

চেরনোবিল সম্পর্কে লেখা অনেক দিন লিখিনি। জানতাম না, কিভাবে লিখব। বুঝে উঠতে পারিনি, কোন কৌশল ব্যবহার করে আমার বিষয়বস্তুর ভেতরে প্রবেশ করব। ইউরোপের এক কোণার ভেতরে ঢুকে থাকা আমার ছোট দেশটি সম্পর্কে পৃথিবীর লোকজন কখনও তেমন কিছু শোনেনি। কিন্তু এখন মনে হয়, তাদের সবার মুখে মুখে আমার দেশের নাম। আমরা বেলারুশের মানুষেরা চেরনোবিলের মানুষ। অজানা এক সাংঘাতিক ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি আমরাই প্রথম। তখন পরিষ্কার হয়ে গেছে, আমাদের ভাগ্যে সমাজতান্ত্রিক, জাতিগত, নতুন ধর্মীয়

চ্যালেঞ্জ ছাড়াও বৈশ্বিক আরো কোনো আদিম চ্যালেঞ্জ আছে। তখনও সবার দৃষ্টিগোচর হয়নি, তবু বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে ততদিনে। চেরনোবিলের পরেই কিছু কিছু বিষয় খোলাসা হয়েছে।

বৃদ্ধ এক ট্যাক্সি চালকের কথা মনে আছে। তাঁর ট্যাক্সির ইউন্ডশিল্ডের ওপরে একটা কবুতর এসে আছড়ে পড়ার পর তিনি শপথের ভঙ্গিতে বললেন, প্রতিদিন দুতিনটে পাখি গাড়ির সাথে আছড়ে পড়ে। কিন্তু খবরের কাগজ বলে সবকিছু নিয়ন্ত্রণে আছে।

শহরের পার্কগুলোর গাছের পাতা আঁচড়া দিয়ে জড়ো করে শহরের বাইরে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তেজস্ক্রিয়ার ছোঁয়া লেগেছে এমন সব জায়গার মাটি খুঁড়ে খাল করে অন্যখানের মাটি দিয়ে চাপা দেয়া হয়েছে। মানে মাটির নিচে মাটিকে চাপা দেয়া। জ্বালানি কাঠ, ঘাস– এগুলোও পুঁতে রাখা হয়েছে। সবাইকে কিছুটা অস্থির দেখাত তখন। এক বৃদ্ধ মৌমাছির রক্ষক আমাকে বললেন, সেদিন সকালবেলা বাগানে গেলাম। মনে হলো, পরিচিত কোনো শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছি না। দেখলাম, একটা মৌমাছিও নেই বাগানে। একটারও শব্দ শুনতে পেলাম না। কী, হচ্ছে কী এসব? দ্বিতীয় দিন গেলাম। দেখলাম, সেদিনও একটা মৌমাছি পর্যন্ত উড়ছে না। তৃতীয় দিনও না। তারপর শুনলাম, নিউক্লিয়ার স্টেশনে দুর্ঘটনা ঘটেছে। স্টেশনটা আমার ওখান থেকে তো খুব দূরে নয়। কিন্তু আমরা অনেক দিন পর্যন্ত জানতেই পারিনি কী ঘটেছে। মৌমাছিরা টের পেয়েছে। কিন্তু আমরা পাইনি।

চেরনোবিল সম্পর্কে খবরাখবর যেগুলো প্রত্রিকায় এসেছে, সব সামরিক ভাষায় লেখা– বিস্ফোরণ, বীর সকল, সৈনিকেরা, জনঅপসারণ ইত্যাদি। কেজিবির লোকেরা স্টেশনে কাজ করেছে। তারা অনুসন্ধান চালিয়ে দেখার চেষ্টা করেছে, কেউ শত্রুতামূলক দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে কি না। গুজব ছড়িয়েছিল, পশ্চিমা ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসেস সমাজতান্ত্রিক ক্যাম্পের দিকে সুড়ঙ্গ খুঁড়তে গিয়ে এ দুর্ঘটনার পরিকল্পনা করেছিল। এক সময় চেরনোবিলে সামরিক সরঞ্জামাদি আসতে শুরু করল। সৈনিকেরা আসতে লাগল। সব ব্যবস্থা দেখে মনে হলো, আবার যুদ্ধের সময় শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এই নতুন জগতে চকচকে পোশাক পরা সৈনিককে ট্র্যাজেডির চরিত্র ছাড়া আর বেশি কিছু মনে হলো না। তার করার কাজ একটাই ছিল– বেশি মাত্রায় তেজস্ক্রিয়া নিজের ভেতরে ধারণ করা এবং বাড়িতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করা।

আমার চোখের সামনে দেখলাম, চেরনোবিল-পূর্ব মানুষেরা চেরনোবিলের মানুষ হয়ে গেলেন।

তেজস্ক্রিয়া চোখে দেখা যেত না, ছুঁয়ে দেখার মতো ছিল না, তেজস্ক্রিয়ার গন্ধও ছিল না। চারপাশের জগত চেনা ছিল; আবার অচেনাও। দুর্ঘটনা এলাকায় আমি গিয়েছিলাম। আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলা হলো, ফুল তুলবেন না, ঘাসের ওপর বসবেন না, কোনো কুয়া থেকে পানি খাবেন না। মৃত্যু সবখানেই লুকিয়ে থাকে। কিন্তু এখানকার মৃত্যু একেবারেই আলাদা। নতুন মুখোস পরা, নতুন ছদ্মবেশে মৃত্যু ওঁৎ পেতে থাকত। যুদ্ধের সময় যারা বেঁচে গিয়েছিলেন এমন বয়স্ক মানুষদের আবারো সরিয়ে নেয়া হলো। যাওয়ার সময় তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, পরিষ্কার আকাশে সূর্যের আলো ছড়াচ্ছে; আকাশে ধোঁয়া নেই; গ্যাস নেই। কেউ তো গুলি ছুড়ছে না। এটা আবার কেমন যুদ্ধ? আমাদের আবারো শরণার্থী হতে হবে?

সকালবেলা পত্রিকা পড়ার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। খবরের লোভে সবাই তৎপর থাকত। তেমন কোনো খবর না দেখে আবার হতাশায় কাগজ সরিয়ে রাখত। কোনো গুপ্তচর ধরা পড়েনি। জনগণের শত্রুদের কথা কেউ লেখেননি। গুপ্তচর ছাড়া, জনগণের শত্রু ছাড়া যে জগত সেটা তো অপরিচিত জগত। নতুন কিছুর শুরু এখানেই। আফগানিস্তানের পথ ধরে চেরনোবিল আমাদেরকে স্বাধীন করে দেয়।

দুর্ঘটনার এলাকায় আমার জগত দুভাগ হয়ে যায়। নিজেকে বেলারুশিয়ান, রুশ কিংবা ইউক্রেনীয় ভাবতে পারিনি। বরং মনে হতো, আমি এমন এক প্রজাতির প্রতিনিধি যে প্রজাতি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। কাকতালীয়ভাবে সামাজিক স্তরে দুটো বিপর্যয় ঘটে যায়। একটা সমাজতান্ত্রিক আটলান্টিস ডুবে যায়; আর মহাজাগতিক স্তরে ঘটে চেরনোবিল। সাম্রাজ্যের পতন সবাইকে বিচলিত করে দেয়। প্রাত্যহিক জীবন নিয়ে মানুষেরা চিন্তিত হয়ে পড়ে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কী দিয়ে কিভাবে কিনবে? বেঁচে থাকা যাবে কিভাবে? বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে কিসে? এই সময়ে কোন ব্যানার অনুসরণ করা যাবে? কিংবা আমাদের কি কোনো মহান ধারণা ছাড়াই বাঁচতে শিখতে হবে? এরকম জগতও তো অপরিচিত জগতই। কারণ আগে এভাবে তো কেউ বেঁচে থাকেনি। 'লাল' মানুষকে এরকম শত শত প্রশ্নের মুখে

পড়তে হয়। কিন্তু সে নিজের মতোই থাকে। স্বাধীনতার প্রথম দিনগুলোর মতো এতটা একাকী সে কখনও ছিল না। দেখতাম, আমার চারপাশের লোকেরা সব আশাহত। আমি তাদের কথা শুনলাম।

আমার ডায়েরি এখন বন্ধ করছি।

সাম্রাজ্য পতনের সময় আমাদের কী হলো? আগে জগতটা ভাগ হয়েছিল এরকম– এক দিকে ঘাতক, আরেক দিকে তার শিকার; এরকমই ছিল গুলাগ; ভাইয়েরা, বোনেরা; আরেক ভাগে ছিল যুদ্ধ, আরেক দিকে ছিল নির্বাচকমণ্ডলী, আরেক অংশ ছিল প্রযুক্তি আর সমসাময়িক জগত। আমাদের জগত যারা বন্দি করেছে এবং যাদেরকে বন্দি করা হয়েছে– তদের মাঝে ভাগ হয়েছিল। আজকের দিনে আমাদের জগত ভাগ হয়েছে স্লাভিকদের সমর্থক এবং পশ্চিমাদের সমর্থকের মাঝে; ফ্যাসিবাদী বিশ্বাসঘাতক আর দেশপ্রেমিকের মাঝে; যারা জিনিসপত্র কেনার ক্ষমতা রাখে আর যাদের ক্ষমতা নেই তাদের মাঝেও। সর্বশেষ বিভাজনটাই সমাজতন্ত্রের পরবর্তী কঠিন পরীক্ষাগুলোর মধ্যে নিষ্ঠুরতম। কারণ সবাই সমান ছিল– সেটা তো খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। 'লাল' মানুষ তার রান্নাঘরে টেবিলের চারপাশে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে সে স্বাধীনতার রাজ্যে সে প্রবেশ করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত সে হয়েছে অপমানিত, হৃত, আগ্রাসী এবং বিপজ্জনক।

রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানোর সময় বিভিন্ন জনের মন্তব্য শুনেছি। এখানে সেরকম কয়েকটি মন্তব্য তুলে দিচ্ছি:

এখানে আধুনিকায়ন ঘটবে বিজ্ঞানীদের হাজত ক্যাম্প এবং ফায়ারিং স্কোয়াড *সেরাসকার*গুলোর মাধ্যমে।

রুশ লোকেরা আসলে ধনী হতে চায় না। ধনী হওয়ার ব্যাপারে তারা বেশ ভীতও। তাহলে কোনো রুশ ব্যক্তি কী চায়? সে চায় অন্য কেউ যেন ধনসম্পদ না পায়। তার চেয়ে ধনী যেন আর কেউ না থাকে।

এখানে কোনো সৎ লোক নেই; তবে এখানে বেশ অনেক ঋষিসুলভ মানুষ আছেন।

এমন কোনো প্রজন্ম আমরা দেখব না যারা চাবকানির শিকার হয়নি। রুশরা স্বাধীনতার অর্থই বোঝে না। তাদের দরকার সামরিক কায়দা জানা লোক আর চাবুক।

রাশিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটো শব্দ হলো 'যুদ্ধ' এবং 'কয়েদখানা'। কোনো কিছু চুরি করলে, কিংবা কিছু নিয়ে মজা করতে গেলেই কয়েদখানায় আটকাবে। একটু মতামত প্রকাশ করতে গেলেই জেলে ঢোকাবে।

রাশিয়ার জীবনকে কলুসিত এবং ঘৃণ্য হতেই হবে। তখন আত্মা উন্নীত হয় এবং বুঝতে পারে, সে এ জগতের অধীন নয়। সবকিছু যত বেশি ময়লা আবর্জনাপূর্ণ আর রক্তাক্ত হবে, সেখানে আত্মার জন্য জায়গাও তত বেশি পরিসরের থাকবে।

নতুন বিপ্লবের শক্তি কিংবা বাতিক কারো নেই। মানসিক শক্তিও নেই। রুশদের এমন কোনো ধারণা দরকার যেটা শুনে কারো প্রথমে মেরুদণ্ড বেয়ে ভয়ের হিম নামবে।

সুতরাং আমাদের জীবন পাগলাগারদ আর ব্যারাকের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। সমাজতন্ত্র আসলে মরেনি; সমাজতন্ত্রের শব এখনও জীবিত।

আরেকটি কথা না বলে পারছি না, ১৯৯০-এর দশকে আমরা যে সুযোগ পেয়েছিলাম সেটা হারিয়েছি। আমরা কোন ধরণের দেশ চাই– সে প্রশ্ন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আমরা শক্তিশালী দেশ চাই, নাকি এমন কোনো দেশ চাই যেখানে জনগণ ভ্রদ্রভাবে জীবন যাপন করতে পারে। আমরা প্রথমটা বেছে নিয়েছি। শক্তিশালী দেশ। আবারো আমরা ক্ষমতার যুগে বসবাস করছি। রুশরা তাদের ভাই ইউক্রেনীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। আমার বাবা বেলারুশের; আমার মা ইউক্রেনীয়। আমাদের অনেক মানুষেরই এরকম পারিবারিক সম্পর্ক। রাশিয়ার বিমান সিরিয়ায় বোমা ফেলছে।

আশায় ভরা একটা সময়ের জায়গায় চলে এসেছে হতাশার সময়। সময়ের যুগ পরিপূর্ণ হয়ে আবার পেছনের দিকে যাচ্ছে। আমরা এখন সেকেন্ডহ্যান্ড সময়ে বাস করছি।

মাঝে মাঝে মনে হয়, 'লাল' মানুষের ইতিহাস লেখার কাজটা আমার শেষ হয়নি।

আমার আবাস তিনটা: আমার বেলারুশীয় ভূমি, মানে আমার বাবার মাতৃভূমি যেখানে আমি সারা জীবন বাস করেছি; আমার মায়ের মাতৃভূমি ইউক্রেন যেখানে আমার জন্ম হয়েছিল এবং আরেকটা হলো রুশ সংস্কৃতি যেটা ছাড়া আমি নিজের সত্তার কথাই কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু এই সময়ে, এখনকার দিনে ভালোবাসা সম্পর্কে কথা বলা কঠিন।

দূর আমেরিকার দিনগুলো

খায়রুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

দিনক্ষণ নিয়ে কোন কালেই আমার কোন রকম বাড়াবাড়ি ছিলোনা। তবে দুই হাজার পনেরো সালের আগে কোন সোমবার আমার জন্য দীর্ঘ প্রত্যাশিত কিছু নিয়ে এসেছিল এমনটাও জোর গলায় বলা যাবেনা। শুধু এতোটুকু বলতে পারি, দুই হাজার পনেরোর প্রথম সোমবার অনন্য, অন্যরকম, অনেক আবেগের, অসাধরণ ভালোলাগার। এই দিনই খুব সকালে টানা বত্রিশ ঘণ্টার ক্লান্তিকর যাত্রা শেষে (দুবাইতে ১০ ঘণ্টা বিরতি সহ) আমি আমেরিকার অন্যতম বিমান বন্দর ওয়াশিংটনের ডালাসে উপস্থিত হই। স্বপ্নের দেশে পা রাখি।

এটা আমার প্রথম বিমান যাত্রা। সঙ্গতই, কিছু অজানা শঙ্কা, কিছু অহেতুক ভয় আমাকে ভিতরে ভিতরে তাড়া করেছিলো। এর বাইরে লাগেজের ওজনটাও ছিল গ্রহণযোগ্য মাপের থেকে প্রায় দুই থেকে আড়াই কেজি বেশি। আমি মূলতঃ শুরু থেকেই উপহার সামগ্রীর উপর জোর দিয়েছিলাম। আমার চিন্তাই ছিল যেকোনো ভাবেই হোক, আমি আমার দেশের মানুষকে, দেশের লোকজ-সংস্কৃতিকে সর্বপরি দেশকে আমার ক্ষুদ্র পরিসরে উপস্থাপন করবই। আর সেই চিন্তা থেকেই শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার আশপাশ, দোয়েল চত্বর, আড়ং-এর বিভিন্ন আউটলেট ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেছিলাম বেশ কিছু উপহার উপকরণ। ঢোল, একতারা, বাঁশি, চাবির রিং, পাল্কী, মহিলাদের ব্যাগ, নকশিকাঁথা আরও কত কি। এর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে উপহার হিসেবে দেয়ার জন্য নিয়েছিলাম Nymphia প্রকাশনীর দুটো বই, *Travel Through Bangladesh* এবং *Festivals in Bangladesh*। বই দুটি আমাকে এতোটাই মুগ্ধ করেছিলো যে আমি এর খানিকটা উঁচু দরকেও তোয়াক্কা করিনি। তবে প্রকাশনীও আমাকে বেশ সাহায্য করেছিলো। আমি বই দুটির সন্ধান পেয়েছিলাম আড়ং এর লালমাটিয়া বিপণন কেন্দ্রে। আমি ওগুলো ওখান থেকে সংগ্রহ না করে, আমার পরিচয় এবং বইগুলো ক্রয় করার হেতু জানিয়ে প্রকাশনীকে ইমেইল করি। সহসাই প্রকাশনীর একজন প্রতিনিধি ৩০% ছাড়ে আটাশ শত টাকার বিনিময়ে বই দুটি আমার বাসায় পৌঁছে দেয়। প্রতিটি বইয়ের ওজন ছিল এগারোশ গ্রাম করে। সব কষ্টই সার্থক মনে হলো যখন পঁচিশ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের Pop Culture বিষয়ক ত্রিশ মিনিটের একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপন শেষে আমি এবং ফারুক ভাই বই দুটিকে আমদের প্রোগ্রাম সমন্বয়ক Dr. Linda Robertson এবং উপ-সমন্বয়ক Dr. Marty Jencius এর হাতে তুলে দেই। সত্যিকার গর্বের ব্যাপারটা তখনই অনুভব করি যখন Dr. Linda আবেগ আপ্লুতকণ্ঠে বলে উঠেন-In the nine years history of ILEP scholars in the Kent State University these two Bangladeshies are the first to bring books as gifts for the library of the university. We feel honored. We feel overwhelmed. We are grateful to you, my dear scholars. তাঁর এই ঘোষণা, উপস্থিত দর্শকদের করতালি, দেশকে একটু সম্মানিত করতে পারার আনন্দ সব কিছু একাকার হয়ে মনে বয়ে গিয়েছিল এক অনাবিল আনন্দ।

Cultural presentation টা ভালো হোক এ ব্যাপারে শুরু থেকেই সচেষ্ট ছিলাম। আমাদের খুব ভালোকরেই জানাছিল যে দেশকে উপস্থাপনের এটা একটা মোক্ষম সুযোগ। তাই একমাত্র চিন্তাই ছিল কিভাবে দেশের এবং নিজেদের মুখ উজ্জ্বল করা যায়। কিভাবে দর্শকদের আন্দোলিত করা যায়। আমি ফতুয়া, লুঙ্গি, গামছা এবং চটি পরার পরিকল্পনা করেছিলাম। ফারুক ভাই পাঞ্জাবি। মূলতঃ এভাবে পোশাকের ক্ষেত্রে বাঙালী পুরুষদের সংস্কৃতির দুটো দিক উপস্থাপনের কথা ভাবলাম। আর আফসোস করতে লাগলাম একজন নারীর অনুপস্থিতির জন্য। আমাদের সাথে একজন বাংলাদেশী নারী অংশগ্রহণকারী থাকলে নিশ্চিতভাবেই আমরা আবহমান বাংলার নারীকুলের শাড়ী পরিধানের ঐতিহ্যকেও উপস্থাপন করতে পারতাম। বিধি আমাদের পক্ষেই ছিল। একদিন কেনো এক প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ঘাঁটছিলাম। হঠাৎ চোখ পড়লো ঐ সপ্তাহের সেরা শিক্ষার্থীর উপর। চোখ আটকে গেলো। এতো দেখছি এক বাঙালী মানে বাংলাদেশী। নাম সায়মা সুলতানা জবা। এবার ওঁকে খোঁজার পালা। সংগে সংগেই সুকান্তদাকে ফোন করলাম। সুকান্তদাই প্রথম বাংলাদেশী যার সাথে আমাদের কেন্টে প্রথম দেখা হয়। মূলতঃ ওয়াশিংটন থেকে কেন্টে পৌঁছার পর Dr. Linda এর সাথে আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর

জন্য আর যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে সুকান্তদাও একজন। সুকান্তদা ২০১১ সনে আমাদের প্রোগ্রামেই কেন্টে গিয়েছিলেন। আমরা থাকাকালীন সময়ে TESOL এ MA করছিলেন। পরবর্তীতে Indiana University of Pensylvania তে TESOL এ PhD প্রোগ্রামে ভর্তি হন। যাহোক, সুকান্তদা জানালেন যে, তিনি সায়মাকে চেনেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন দুই এক দিনের মধ্যে ওঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন। ব্যাপারটাতে যারপরনাই খুশী হলাম। মনে মনে ভাবলাম তাহলে এবার একটা পরিপূর্ণ উপস্থাপনা সম্ভব। জবার সাথে আলোচনায় এও জানতে পারলাম একটি সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা ওর ডিগ্রির জন্যও প্রয়োজন। সুতরাং আমরা পরিকল্পনা শুরু করলাম কিভাবে ভালো কিছু করা যায় এবং মনস্থির করলাম পাওয়ার পয়েন্ট এবং ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে দেশের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপন করব। বাংলাদেশে কীভাবে আমরা নববর্ষ উৎযাপন করি তা দেখাবো। এবং আমরা এমন একটা খেলা খুঁজছিলাম যার মাধ্যমে সম্মানিত দর্শকদেরকে সংযুক্ত করতে পারি। খেলা হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম পিলো পাসিং। কীভাবে আমরা নববর্ষ উৎযাপন করি তা দেখানোর পিছনেও মূল উদ্দেশ্য ছিল দর্শকদেরকে যত বেশি যুক্ত করা যায়। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, "আইলো আইলো আইলোরে রঙে ভরা বৈশাখ এবার আইলোরে" গানটির ভিডিও চিত্রের সাথে Mask পরে আমাদের সাথে যেসব বাদ্য যন্ত্র যেমন- ঢোল, একতারা, খঞ্জর, বাঁশি ইত্যাদি যা কিছু ছিল সেগুলো বাজিয়ে আমেরিকানদের অংশগ্রহণে নাচ করা।

কিন্তু Mask কোথায় পাই? ওটা ছাড়া বৈশাখ? অসম্ভব! ইন্টারনেট ঘাঁটলাম। amazon.com এ খোঁজাখুঁজি করলাম। নানা রঙের ও ঢঙের Mask দেখতে পেলাম। কিন্তু বাঙালীর বৈশাখের Mask একটাওনা। কি করা যায়? অবশেষে আমার স্ত্রীর শরণাপন্ন হলাম। সে পনেরটি Mask যোগাড় করে UPS মাধ্যমে আমেরিকাতে পাঠায়। যথা সময়ে ওগুলো আমার হাতে আসলে আমি নিশ্চিন্ত বোধ করি। যাহোক আমরা লক্ষ্য অর্জনে সম্পূর্ণ সফল হয়েছিলাম। অন্ততপক্ষে, দশজন আমেরিকান এই নাচে অংশ নিয়েছিলেন। এরপর পিলো পাসিং এ অংশগ্রহণ করেছিলেন আরো পনেরো জন আমেরিকান। এভাবেই আমরা আমেরিকানদেরকে আমাদের সংস্কৃতির একটু ছোঁয়া দিতে পেরেছিলাম।

এর বাইরে আমি পায়েস রান্না করার পরিকল্পনা করেছিলাম। এর আগে কখনও পায়েস রান্না করা হয়নি। তদুপরি পায়েসের ভালো স্বাদের ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। প্রশ্ন আসতেই পারে এতো আত্মবিশ্বাস আসে কোথা থেকে? একইভাবে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন ভারত থেকে যাওয়া প্রভা নায়ার এবং ডরলিনা তেরেসা। ওরা বলেছিল, "খায়রুল, দেখো ভারতীয় উপমহাদেশর সম্মান যেন থাকে"। সম্মান বেঁচেছিল কিনা জানিনা। তবে, সবার খাওয়া শেষে যতটুকু বেঁচেছিল তা একজন আমেরিকান খুবই আনন্দ চিত্তে তার নাতি-নাতনির জন্য নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে করলে আমি সানন্দ অনুমতি দেই। আর আমার আত্ম বিশ্বাসের মূল জায়গাটা আমার কল্পনা শক্তি। আমি খুব ভালোভাবেই কল্পনায় দেখে নিয়েছিলাম আমার মা কিভাবে পায়েস রান্না করতেন। মা আজ বেশ বয়স্ক। রান্না-বান্না করতে পারেননা। কিন্তু তাঁর হাতের পায়েসের স্বাদ আজও জিভে লেগে আছে।

ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক Dr. Rayan Miller কে আমাদের উপস্থাপনা দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ করেছিলাম। Dr. Miller এর সাথে second language writing কোর্সটি করার সুবাদে পরিচয় হয়। তাঁর মধ্যে আমি সত্যিকার ভদ্রতা দেখেছিলাম। একজন মানুষ এতোটা নম্র, বিনয়ী, ভদ্র, নিষ্ঠাবান হতে পারে তাকে না দেখলে হয়তো অজানা থেকে যেত। অনুষ্ঠান শেষে তিনি আমার উপস্থাপনার দারুণ প্রশংসা করেছিলেন। Dr. Linda Robertson এর একটা বিষয় খুব লক্ষণীয় ছিল। যেসব প্রোগ্রামগুলোতে সব দেশের অংশগ্রহণ ছিল সেসব ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কোন দেশের প্রশংসা করতেন না। তবে তাঁর মুগ্ধতার বিষয়টি জেনেছিলাম সুকান্তদার মাধ্যমে।

শুকান্তদা এবং জবার মাধ্যমে আমি আরও বেশ কয়েকজন বাংলাদেশীর সন্ধান পাই যারা ওখানে Masters কিংবা Doctoral Program এ অধ্যায়নরত। এদের মধ্যে খালেদ ভাই, সাইফুল ভাই, ছামিদ ভাই এবং Computer Science Department এর চেয়ারম্যান ডঃ জাভেদ স্যারের কথা বেশ মনে পড়ে। আমাদের উপস্থাপনার দিন খালেদ ভাই উপস্থিত ছিলেন। তাকে সুযোগ দিয়েছিলাম দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য। এভাবে তাকে সম্মানিত করার সুযোগ পেয়ে নিজেই সম্মানিত বোধ

করছিলাম। সুকান্তদারও উপস্থিত থেকে আমাদের উপস্থাপনায় অংশ নেয়ার কথা ছিল। এমনকি তার ধৃতি পড়ারও কথা ছিল। এটাও ছিল মূলতঃ বাঙালি সংস্কৃতির আর একটা অনুষঙ্গকে তুলে ধরার প্রয়াস। দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি ঠিক সময়ে আসতে পারেন নি। তিনি লাইব্রেরিতে একটি খণ্ডকালীন চাকরি করতেন আর একারণেই সময় বের করতে পারেননি।

Dr. Linda Robertson এর এমন প্রশংসার স্রোতে ভেসেছি আরও বেশ কয়েকবার। ILEP স্কলারদের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও Kent State University এর Deaprtment of Hospitality Trousim আয়োজন করেছিলে তাদের দেশের উপর poster এবং brochure তৈরির প্রতিযোগীতা। আমার এবং ফারুক ভাইর দায়িত্ব ছিল যে সব শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের উপর কাজ করছেন তাদেরকে বাংলাদেশ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া। যথারীতি আমরা তাদেরকে বাংলাদেশী সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে ধারণা দিলাম। আমরা যে বই দুটো লাইব্রেরীতে দিয়েছিলাম সেখান থেকে তাদেরকে ধারণা নিতে বললাম। অবশেষে আসলো poster এবং brochure প্রদর্শনীর দিন। বিভিন্ন দেশের ষোল জন ILEPers সহ উপস্থিত দর্শকদের মাঝে অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ জনকে নম্বর প্রদানের দায়িত্ব দেয়া হয়। দুই ক্যাটাগরিতে নম্বর দিতে বলা হয়- the Best Tourist Destination Ges the Best Presentation। প্রথম ও দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে যথাক্রমেঃ বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়া প্রথম হয়। পুরস্কার হিসেবে দেয়া হয় এই দুই দেশ ভ্রমনের বিমান টিকিট। পুরস্কার ঘোষণার সময় Dr. Linda Robertson খুব আবেগের সাথে বলেছিলেন যে, এবারই বাংলাদেশ নিয়ে কাজ করা শিক্ষার্থীরা কোন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতল। সাথে সাথে আমাকে এবং ফারুক ভাইকে ধন্যবাদ দিতে ভুল করলেননা। আবার সেই অনাবিল আনন্দ। আবার সেই নির্মল ভালো লাগা।

যাহোক প্রথম বিমান যাত্রার অনুভূতির কথা বলছিলাম। ঢাকা বিমান বন্দরে ইমিগ্রেশনের বৈতরনী পার হয়ে ভিতরে গিয়ে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক অপেক্ষার পর বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে এমিরেটসের বিমানে চেপে বসলাম। অজানা ভয়, অযাচিত শঙ্কা, আনকোরা অভিজ্ঞতার বাড়তি উত্তেজনা সবই যেন পেয়ে বসলো। দোয়া-দুরুদের ক্ষুদ্র ভাণ্ডার উজাড় করে দিলাম। মনে মনে ভাবলাম সারা পথ এভাবেই কাটিয়ে দিবো। অবশ্য সময়ের সাথে সাথে মনের জোর বাড়তে লাগলো। একটা সময়ে এসে মনে হলো যা হবার হবে। এভাবে সময় কাটানো যায়না। স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে ফিরে আসলাম। গানশোনা, মুভি দেখা এবং বিশেষকরে বিমানটা এখন কোন শহর কিংবা কোন দেশের উপর দিয়ে উড়ছে সেটা খেয়াল করা। মোটামুটি বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ আমরা দুবাই বিমান বন্দরে পৌঁছে গিয়েছিলাম। এবার United Air এ উঠার পালা।

আমেরিকাতে যাওয়ার পথে এর বাইরে আমরা একটু ভিন্ন রকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখী হয়েছিলাম। ইমিগ্রেসনের বিরক্তিকর, ক্ষেত্র বিশেষে আপত্তিকর ও অপমানজনক স্তরগুলো পার হয়ে বিমানে উঠারও প্রায় ঘণ্টাখানিক পরে রাত দেড়টার দিকে বিমান ছেড়েছিল। কিন্তু ওয়াশিংটনে অবতরণ করলাম ভোর ছয়টায়। অথচ আমরা বিমানে পার করে দিয়েছে প্রায় চৌদ্দ ঘণ্টা। মূলতঃ ক্রমাগত পশ্চিম দিকে যাত্রাই ছিল এর কারণ। ইমিগ্রেশনের ঐ যক্কির আগেই আমদেরকে আর এক দফা যন্ত্রণা পোহাতে হয়েছিল। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বিমান থেকে নামার সাথে সাথেই আমরা ব্যস্ত হয়ে পরলাম United Air Lines এর অফিস খুঁজে বের করার কাজে। US Embassy থেকে বলাই ছিল আমরা যেন দুবাই এয়ারপোর্টে প্রবেশমাত্র এই কাজটাই শুরু করি। অন্যথায়, বিমানে না উঠতে পারার মত চরম অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনিশ্চয়তার ব্যাপারটাও ঘটতে পারে। প্রথমে মনে হয়েছিল এ কাজটি জলের মত সহজ না হলেও, খুব একটা বেগ পেতে হবেনা। কিন্তু বাস্তবে ঘটলো পুরোপুরি উল্টা। পাকা চার ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর United Air Lines এর অফিসের খোঁজ মিলল। আরও প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষার পর হাতে পেলাম বিমানে উঠার অনুমতি পত্র। হাঁফছেড়ে বাঁচলাম। পেটের মধ্যে ঘণ্টা ধ্বনি শুনতে পেলাম, এবার তোমাকে কিছু খেতেই হবে। না হলে বিদ্রোহ, অসহযোগিতা। উপায়? রেস্টুরেন্ট খোঁজো। সহসাই একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট চোখে পড়ল। যেহেতু বিমানে উঠতে আরও পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা বাকি তাই সবাই মিলে এমন কিছু খাওয়ার পরিকল্পনা করলাম যা দীর্ঘ সময় পেটে থাকে এবং শক্তি জোগাতে পারে। আমরা রাইস, চিকেন ইত্যাদি বেছেনিলাম। তবে স্বাদ একটু ভিন্ন। সম্ভবত, সব মানুষের কথা মাথাই রেখে

রান্নাকরা। বরাবরই আমার রুচি ভাল এবং জঠর জ্বালা থাকলে আর আটকায় কে। পেট পুরে খেয়েনিলাম। এবার একটু বিশ্রাম নেয়া চাই। আমরা বিমানে চড়ার জন্য যে পথটা ব্যবহার করতে হবে সেখানে রাখা আসন গুলোতে বসে পড়লাম। চেষ্টা করলাম চোখ বন্ধ করে রাখার। কাছেই কিছ লোক কথা বলছিল। খেয়াল করলাম তাদের কথোপকথনের ভাষা ইংলিশ, এরাবিক কিংবা অন্য কোনো পরিচিত ভাষা নয়। চোখ খুলে বোঝার চেষ্টা করলাম তারা কারা। কিন্তু পরিষ্কার করে বুঝে উঠতে পারলামনা। তবে তাদের একজনের লাগেজের উপর চোখ পড়তেই বুঝে ফেললাম ওঁরাও আমাদের পথযাত্রী, ওঁরাও International Leaders in Education Program এ অংশ গ্রহন করতে যাচ্ছে, ওঁরাও আমেরিকান সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত অতিথি। ওঁরা এসেছে মালায়শিয়া থেকে। আমরা পারস্পরিক করমর্দনের মাধ্যমে পরিচিত হলাম। এর সাথে আত্ম বিশ্বাসটাও বেড়ে গিয়েছিলো। না আমাদের সাথে আরও কয়েকজন আছেন। বিমান যাত্রাটা তাহলে অতো ক্লান্তিকর হবেনা। ব্যাপারটাও তাই হল। ওদের আসন আমাদের ঠিক সামনেই ছিল। কথাবার্তা বলার তেমন কোন সুযোগ হলোনা কিন্তু ওদের উপস্থিতি আমাদেরকে বেশ চাঙ্গা রাখলো। তবে, ওঁদের মধ্য থেকে চোখে পড়ার মতো যে মেয়েটি ছিল সে আমার সাথে করমর্দন করলনা। বরং খানিকটা দূরত্ব রক্ষা করে চললো। প্রথমে, একটু ধাক্কা খেলাম। অবশ্য সাথে সাথেই সামলে নিলাম এবং নিজেকে বুঝালাম যে নিশ্চিতভাবেই এটা ওর সমস্যা আমার না। যাহোক ওয়াশিংটনের হোটেল পালামারে অবস্থানকালীন সময়ে বিভিন্ন পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠানের ফাঁকে জানতে পারলাম ওঁর নাম হলো মাইশারা আবদুল্লাহ। ওঁর সাথে করমর্দন, কুশল-বিনিময় ও দু-চারটে কথা-বার্তাও হলো। কিন্তু সবই হলো আমদের দ্বিতীয় সাক্ষাতে। আর এসবের সাক্ষী হয়ে থাকলো নায়াগ্রা জলপ্রপাত।

যদিও আমেরিকাতে প্রথমবার, মনে তেমন কোন শঙ্কা ছিলোনা। ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে, লাগেজ নিয়ে বাইরে আসতেই চোখে পড়ল ILEP প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একজন আমেরিকানকে। মনের গহীনে জমে থাকা অল্প কিছু শঙ্কা যা ছিল, তাও মুহূর্তেই পালাল। সামনে গিয়ে পরিচয় দেয়া মাত্র, সে হাত বাড়িয়ে তার নাম বলে পরিচয় দিলো এবং আমাদেরকে অভিবাদন জানালো। তার নামছিল 'আতিস' এবং পরবর্তীতে জানতে পারলাম, সেই ইথিওপিয়ার বংশোদ্ভূত। আস্তে আস্তে আমরা ও মালায়শিয়ানরা জড়ো হলে সে সবাইকে নিয়ে বিমান বন্দরের বাইরে চলে আসে। আচমকা হিমেল হাওয়ার প্রচণ্ডতা টের পেলাম। পুরো শরীরের মধ্যে অরক্ষিত অংশ বলতে ছিল শুধু মুখো-মণ্ডল। এবার তা-ই লুকানোর পালা। এর ফাঁকেই আবার কেউ কেউ মেতে উঠলো ছবি তোলার কাজে। কখনও বা অন্যের সাহায্যে, কখনও বা সেলফি। মিনিট আট-দশেকের মধ্যেই আমরা উঠে পড়লাম অপেক্ষারত চমৎকার একটি মিনিবাসে। এই স্বল্প সময়েই বুঝতে পারলাম আমেরিকানদের জীবনযাত্রা অত সহজ নয়। শীতকালীন সময়ে তাদেরকে আবহাওয়ার সাথে নামতে হয় এক কঠিন যুদ্ধে। পরবর্তীতে, আমেরিকাতে অবস্থানকালীন পুরা সময়টাই এ ব্যাপারটা অনুভব করেছি আরও নিবিড়ভাবে। ওয়াশিংটন, সেখান থেকে চার মাস দশ দিনের জন্য ওহাইওর Kent State University, এরই মাঝে সেমিস্টার বিরতিতে নিউইয়র্ক শহর, এপ্রিলের শেষ দিকে নায়াগ্রা জল প্রপাতসহ যেখানেই গিয়েছি দাপুটে শীত সবসময়ই মুখ্য বিবেচ্য বিষয় ছিল। এসবের মাঝেই জানুয়ারির শেষদিকে-২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মুখোমুখি হই। এমন আর্কটিক হিমের মাঝেই আমাদের একদিন আইস হকি দেখার দাওয়াত ছিল। প্রথম দিকে ভেবে ছিলাম যাবনা। পরক্ষণেই মনে পড়ে গেলো নিজের কাছে করা প্রতিজ্ঞার কথা। ঢাকাতে বসেই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে সবকিছুতেই ইতিবাচক থাকবো। বড় ধরনের কোনো ঝামেলা না হলে, কোনো কিছুতেই না বলবনা। সুতারং আইস হকি দেখতে যাওয়া চাই। কিন্তু যেতে হবে গণ- পরিবহনে চড়ে। হলিপার্ক এপার্টমেন্ট থেকে বাসস্ট্যান্ড পাঁচ-ছয় মিনিটের হাটা পথ। বাসের জন্য অপেক্ষা করা লাগতে পারে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট। তো মোটামুটি আধা ঘণ্টা ধরে ওরকম একটা ভয়াবহ তাপমাত্রার সাথে লড়াই করা। চাই সম্পূর্ণ প্রস্তুতি। এরই অংশ হিসেবে দুই জোড়া মোজা, দুই জোড়া ইনার, জিন্স, হ্যাট, জ্যাকেট, ওভারকোট এবং সবচেয়ে কার্যকরী জুতা পড়ে বেড়িয়ে পড়লাম। পূর্ব ধারণা অনুযায়ী, বাসস্ট্যান্ডে অনেক সময়

ধরেই অপেক্ষা করতে হলো। বারবারই মনে হয়েছে, বাস আসা পর্যন্ত টিকে থাকবতো! বারবার এপার্টমেন্টে ফিরে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আবার পরাজিত হতেও চাইনি। যাহোক দীর্ঘ অপেক্ষার পর বাস আসলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। খেলাটা দারুণ উপভোগ করলাম। এটি প্রচণ্ড গতির খেলা। মাঠগুলো নিঃসন্দেহে বহু যত্নে, লাখ লাখ ডলার খরচ করে তৈরি করা। শীতের এহেন দাপট মাঠে টের পেলামনা। ওখানেও আছে হিটার। শুধু আইস হকি নয়, বিভিন্ন সময়ে বাস্কেট বল, সকার ও বওলিং সহ বিভিন্ন খেলা উপভোগ করেছি। এসব জায়গাতেও হিটার দারুণভাবে কার্যকরী। সুপার মার্কেট, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস-আদালত সর্বত্রই হিটারের বদৌলতে চমৎকার উষ্ণ। কিন্তু এসবই বর্তমান। এসবই আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। কিংবা এটা একটা সুবিধা যা আমেরিকানরা ভোগ করছেন হয়তবা এক শতাব্দি ধরে। কিংবা আর একটু বেশি সময় ধরে। **তবে তার আগে যারা ওখানে প্রথম বসতি স্থাপন করেছেন তাঁরা কিভাবে বেঁচেছিলেন! নিশ্চিতভাবেই সেটা অনেক কষ্টের, অনেক বেদনার এবং নিরন্তর সংগ্রামের উপাখ্যান। পূর্বসূরীদের সেই মহাকাব্যিক ত্যাগ, দুঃসাহস এবং নিজেদের প্রতি অবিচল আস্থাই আজকের আধুনিক আমেরিকার মূলভিত্তি।** কথা প্রসঙ্গে আতিসও আমাকে এরকমটাই বলেছিল। ডালাস বিমান বন্দর থেকে হোটেলে যাবার পথে আমি ও আতিস পাশাপাশি বসে ছিলাম। আমি মূলত ইচ্ছা করেই ওর পাশে বসেছিলাম। উদ্দেশ্য একটাই, আমেরিকা সম্পর্কে একজন আমেরিকানের কাছ থেকে জানা। ও যা বলছিল তার মর্ম কথা হল, আমেরিকা অভিবাসীদের দেশ। কারা এই অভিবাসী? হয়ত তাঁরা স্ব স্ব সমাজে নিগৃহীত, অন্যায়ভাবে শোষিত অথবা দারুণভাবে দক্ষ। প্রথম শ্রেণির চেষ্টা ছিল, যে সমাজ তাঁদের বঞ্চনা করেছে তাদের দেখিয়ে দেয়া যে তাঁরা সত্যিই অবহেলিত হবার নয়, হারিয়ে যাবার নয় বরং নিজ গুণে, মেধায়, শ্রমে বিশ্ব মানচিত্রে নিজেদের নতুন ঠিকানাকে সবচেয়ে ধনী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। অন্য দিকে যারা দক্ষ তাঁরা পেয়েছেন দক্ষতাকে শানিত করার দারুণ ক্ষেত্র। এই দুই শ্রেণির মানুষের মিলিত সংগ্রামই আজকের স্বপ্নের ও ঈর্ষার আমেরিকা।

আজকের এই আমেরিকা গঠনের অনুঘটকগুলোর মধ্যে বোধকরি সময় সচেতনতাই সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। আমি যতজন আমেরিকানের সাথে পরিচিত হয়েছি, যতগুলো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি, কোথাও এক মিনিটের জন্যও সময়ের হেরফের চোখে পড়েনি। ওখানে দশটার অনুষ্ঠানে দশটায় উপস্থিত হওয়ার অর্থ হল আপনি পাঁচ মিনিট বিলম্ব। আর আপনি যদি নয়টা পঞ্চান্ন মিনিটে আসেন তাহলে আপনি যথা সময়ে আসছেন। এ বিষয়ক আরও দুই-একটি মুগ্ধতার বিষয় ছিল। Kent State University তে থাকা কালে আমি একটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট মহোদয় উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে যোগদানের উপলক্ষে আমি লিফটে উঠতেই প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের সাথে দেখা। কিন্তু তিনি একা। বুঝতে পারলাম, এটাই আমেরিকা। এটাই আমেরিকার আজকের এই গগনচুম্বী সাফল্যের আর একটি অনুঘটক। ওখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানের পথ চলার জন্য কারো প্রটোকল লাগেনা। ওঁনারা নিজেদের গাড়ি নিজেরাই চালান। নিজেদের হাতব্যাগ নিজেরা বহন করেন। তাঁদের অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যারযার নির্ধারিত কাজ নিয়ে ব্যস্ত।আর একারণেই কাজের স্তূপ জমে নেই। পড়ে নেই আজকের কাজ কালকের জন্য। অনুষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে আর একটা লক্ষণীয় বিষয় ছিল ওখানে সাধারণত ঘোষক থাকেনা। নির্ধারিত ব্যক্তি মঞ্চে আসেন, নিজের পরিচয় দেন এবং বক্তৃতা শুরু করেন। ইত্যাকার আড়ম্বরহীন বিষয়গুলো আমাকে বারবারই আন্দোলিত করেছে।

এই আড়ম্বরহীনতা আমেরিকার পার্লামেন্টেও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একবার আমদের যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও রাজ্যের রাজধানী কলাম্বাসের পার্লামেন্ট ভবনে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। এখানে পার্লামেন্ট ভবনগুলো House of People নামে পরিচিত। এবং এটা বাস্তবেও তাই। এটা জন সাধারণের জন্য উন্মুক্ত। বিশেষ করে শিশুদের জন্য। পার্লামেন্ট হাউসগুলো সামারে শিশুদের বিচরণে মুখরিত থাকে। তারা পার্লামেন্টের গ্যালারিতে বসার সুযোগ পায় এবং সদস্যদের ডিবেট উপভোগ করেন। নিশ্চিতভাবেই তারা সদস্যদের কঠিন ও জটিল আলোচনার মাথামুণ্ড কিছুই বোঝার কথা না। কিন্তু তারা ওখানে বসে, আলোচনা উপভোগ করে। তাহলে তাদের অর্জন কি? আত্মবিশ্বাস! সংসদীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া! পারস্পারিক মতামতকে শ্রদ্ধা করতে শেখা! সর্বোপরি, জাতির প্রয়োজনে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতকরা।

এসবের বাইরে ওঁদের দেশ প্রেমবোধও আমাকে মোহিত করেছে। মাঠ অভিজ্ঞতার অংশ হিসেবে আমাকে স্থানীয় Stow Munroe Falls High School এ বেশ কিছু দিন যেতে হয়েছিলো। ভোর ছয়টায় বের হয়ে যেতাম এবং বিকাল সাড়ে

তিনটায় ফিরে আসতাম। এর পরপরই আবার চারটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস থাকতো। বিষয়গুলো কখনো আনন্দময় ছিল। আবার কখনওবা বেশ ক্লান্তিকর। স্কুলে যাওয়ার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা ছিল। স্কুলে যাওয়ার দিনগুলোতে একটি বিলাসবহুল Mercedes-Benz যথা সময়ে এপার্টমেন্টের সামনে এসে অপেক্ষা করত। গাড়ি চালকেরা আমাদের ব্যাপারে বেশ কৌতুহলি ছিল। সম্ভবতঃ স্কুলে যাওয়ার দ্বিতীয় দিন আমি চালকের পাশের সিটে বসেছিলাম। স্বভাবতইঃ তার সাথে কিছু আলাপচারীতাও হয়েছিল। তাকে আমাদের ব্যাপারে বেশ কৌতুহলি মনে হলো। তার সাথে কথা বলে আমেরিকা সম্পর্কে আরও কিছু জানতে চেষ্টা করলাম। তাঁদের এবং বর্তমান প্রজন্মের চিন্তা-ভাবনা ও জীবনাচারের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করলাম। যতটুকু বুঝলাম তাতে মনে হল আমেরিকানদের সামাজিক এবং পারিবারিক সম্পর্ক আগের তুলনায় বেশ শক্ত। পঞ্চাশ কিংবা ষাটের দশকে পিতা-মাতাকে অমান্য করা কিংবা পিতা-মাতার চিন্তার স্রোতে তাল না মেলানোই ছিল সন্তানদের ফ্যাশান। ঐ সময়টাকে ওঁরা generation gap এর যুগ হিসেবে দেখে। কিন্তু বর্তমান সময়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের এই পার্থক্য অনেকাংশে কমেছে। পিতা-মাতা ও সন্তানেরা তাদের পারস্পারিক ভাষা কিংবা চাওয়া-পাওয়া বোঝেন। তারা আগের তুলনায় অনেক বেশি পারস্পারিক নির্ভরশীল। একই ব্যাপারে Dr. Linda Robertson এর সংগেও কথা হয়েছিলো। তিনি তার মেয়ের উদাহরণ টেনে বলেছিলেন যে, সে তাকে তার জামাইর সাথে Russia তে চলে যেতে বলেছিলেন। মূলত তার মেয়ের জামাই একজন রাশিয়ান এবং সেখানে তার খুব ভালো একটা চাকুরীর সম্ভবনাও ছিল। কিন্তু তার মেয়ে ও জামাই কেউই যেতে রাজি হয়নি। তার মেয়ের কথা ছিল যে সে তার মাকে ছেড়ে কোথাও যাবেনা। নিঃসন্দেহে তারা একই বাড়িতে থাকছেন না। তবে খুব কাছাকাছি থাকছেন। সহজাতভাবেই Dr. Linda এরও একটা চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, "তোমরাই এসবের জন্য পর্দার অন্তরালের নায়ক"। উনি মূলত এশিয়ান ও আফ্রিকান অভিবাসী এবং বিভিন্ন সময়ে আমেরিকাতে যাওয়া শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও ভ্রমণকারীদেরকে ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর দাবী অনুযায়ী আমাদেরকে দেখেই ওঁরা যৌথ পরিবার নাহোক কাছাকাছি থেকে সবাই মিলে পারস্পারিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে দুশ্চিন্তা মুক্ত জীবন যাপনে উৎসাহিত হচ্ছে।

গাড়ি চালকের কথা বলছিলাম। প্রায় আধাঘণ্টা পরে যখন স্কুলের সামনে গাড়ি থেকে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তখন তিনি অনেকটা আবেগঘন কণ্ঠে আমেদেরকে বললেন, "Please Sir, take care of our kids and try to give them ideas about your own countries. Those kids are our future". একজন গাড়ি চালকের এমন সচেতনতা ও চিন্তার গভীরতা আমাকে বিশেষভাবে মোহিত করেছিলো।

স্কুলে আমাদের কাজ ছিল ক্লাস নেয়া, আমেরিকান শিক্ষকদের ক্লাস পর্যবেক্ষণ করা। তারা কিভাবে ক্লাস নিচ্ছেন, কিভাবে শিক্ষার্থীদের সামাল দিচ্ছেন ইত্যাদিই ছিল আমাদের লক্ষ করার বিষয়। তাছাড়া, আমরা কথা বলেছি স্কুলের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষদ্বয় এবং আরো অনেক শিক্ষকের সাথে। ওখানে অধ্যক্ষ কিংবা উপাধ্যক্ষের নিয়োগ আমাদের দেশের প্রচলিত নিয়ম থেকে ভিন্ন। ওখানে শিক্ষক হওয়ার জন্য যেমন আগেই তিন বছরের প্রশিক্ষণ থাকতে হয়, অধ্যক্ষ হওয়ার জন্যও লাগে বিশেষ প্রস্তুতি। যখন কেউ একজন অধ্যক্ষ হিসেবে কেরিয়ার গড়তে চান, তাকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের বাইরেও শিক্ষানবিশ হিসেবে কোন একজন অধ্যক্ষকে বেশ কিছু মাস ধরে অনুসরণ করতে হয়। যে কারণে ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সেই একজন অধ্যক্ষ হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করতে পারেন। তারই অধীনে ষাট-বাষট্টি বছরের একজন শিক্ষক কাজ করছেন। কিন্তু নেই কোনো অসন্তোষ। কাজ পাগল জাতির এটাই বোধ হয় স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। ওখানে পদের চেয়ে কাজই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বেশি সম্মানের।

অধ্যক্ষত্রয় রুটিন করে প্রায় সব সময়ই ওয়াকিটকি হাতে ঘুরে বেড়াতেন। একবার কিছু শিক্ষককে একটা বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া দরকার ছিল। শিক্ষকরা আগে থেকেই লাইব্রেরিতে অপেক্ষা করছিলেন। অধ্যক্ষ মহোদয় নির্দিষ্ট সময়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যা কিছু বলার ছিল বলে চলে গেলেন। আবারও আমার কাছে মনে হয়েছে ওঁদের কাছে কাজই গুরুত্বপূর্ণ, আনুষ্ঠানিকতা নয়।

আমেরিকানরা যেকোনো কাজ সম্মানের মনে করে এমন কথা আমরা সবাই কমবেশি শুনেছি। শুনে আবেগে আপ্লুত হয়েছি বার বার। এটা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবো এমনটা ভাবিনী। সুযোগ পেয়ে সত্যিকার অর্থেই মোহিত হয়েছি। স্কুলে আমার সহশিক্ষক Miss Cathy I Lisa Mowls এর আমন্ত্রণে তাদের ছাত্রদের সাথে Acron University-তে সৃষ্টিশীল ব্যবসায়িক ধারণার উপর একটি প্রতিযোগিতা দেখতে যাই। আমার ঐ সহশিক্ষকদ্বয়ই উক্ত প্রতিযোগিতার সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন

করছিলেন। বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা শিক্ষার্থীরা বিশাল অডিটোরিয়ামে অপেক্ষা করছিলেন। তাদের নাম ঘোষণা হলে তারা অপেক্ষারত বিচারকদের সামনে গিয়ে তাদের ব্যবসায়িক ধারণার মডেল উপস্থাপন করতো। অনুষ্ঠান যখন শেষের দিকে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম Lisa Mowls একটি বড় পলিব্যাগ হাতে অডিটোরিয়ামে পরে থাকা ক্যান, প্যাকেট ইত্যাদি তুলে ব্যাগে ভরছেন। বিস্মিত হলাম আর আমাদের দেশের কথা ভাবলাম। একজনও কি শিক্ষক কিংবা অন্য পেশার কাউকে পাবো যে নির্দ্বিধায় এমন একটি কাজ করবেন? আর কেউ না পারুক আমি নিজেই কি কখনও পারব? সদুত্তর পেলামনা। শুধু নীরবে ভাবতে লাগলাম, যদি সত্যিই দেশের মানুষগুলো এমন হয় তাহলে দেশ নিশ্চিতভাবেই বহুদূর যাবে।

একইভাবে Dr. Marty Jencious এবং Dr. Linda Robertson তাঁদের কর্মের মাধ্যমে আমাদেরকে বারবারই মুগ্ধ করেছেন। আগেই বলাছিল যে Dr. Marty আমাদেরকে ওয়াশিংটন থেকে কেন্টে নিয়ে যাবেন। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা ৯ জানুয়ারি বিকেলে কেন্টের উদ্দেশ্যে বিমান যোগে রওনা হই। কেন্ট থেকে খবর এসেছিলো ক্লিভল্যান্ড ও কেন্টে প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছে। বিমানে বসেই ব্যাপারটা বেশ টের পেয়েছিলাম। তুষারপাতের কারণে বৈমানিককে বাড়তি সতর্কতার সাথে বিমান চালাতে হয়েছিল। বিমানের জানালা থেকে নিচে তাকালে তুষারে ঢেকে যাওয়া ছোট ছোট ঘর-বাড়ি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লোনা। যাই হোক এক ঘণ্টা বিশ মিনিটের মধ্যে আমরা ক্লিভল্যান্ড বিমান বন্দরে অবতরণ করলাম। এখানেও আগে থেকেই গাড়ি প্রস্তুত ছিল। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই তুষারপাত এবং বাতাসের তীব্রতাজনিত প্রচণ্ড শীতের কারণে স্ব-স্ব লাগেজ না তুলেই গাড়িতে উঠে পড়েন। আর তখনই পঁয়ষট্টি পেরোনো Dr. Mart গাড়িতে লাগেজ তোলা শুরু করে দিলেন। তাঁর বয়স ও সামাজিক অবস্থান দুটোই আমাকে বিস্মিত করেছিলো। পরবর্তী কোনো এক সময় তাঁর সঙ্গে এ প্রসঙ্গে কথা বললে সে যা বলেন তার মর্মার্থ হল, আমেরিকানরা কাজকে দায়িত্ব হিসেবে দেখেন এবং তারা গুরুত্ব দেন দায়িত্বটি শেষ করার উপরে। কে করলো সেটা অনেক সময়ই বিবেচ্য বিষয় থাকেনা। তিনি আরও বললেন যে এ কাজটি করে তিনি যথেষ্ট সম্মানিত বোধ করেছেন। ওঁদের এবং আমাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যটা আবারও প্রকটভাবে ধরা পড়ল। ওখানে যখন কাজকে নিজের করে দেখা হয়, তখন আমরা বিবেচনা করি বোঝা হিসেবে। মানসিকতার এই পশ্চাৎপদতাই বোধ হয় আমাদের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী।

স্কুলের শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও আমেরিকা ও আমাদের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। ওখানে ক্লাস প্রতি শিক্ষার্থীর সংখ্যা গড়ে ২৫ জন। এখানে শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুমে অবস্থান করে এবং আমরা শিক্ষকরা রুটিন অনুযায়ী ক্লাসে যাই। কিন্তু ওখানে শিক্ষার্থীরা এক ক্লাস শেষ হলে তাদের রুটিন অনুযায়ী অন্য ক্লাসে যায়। এক একটা শ্রেণি কক্ষ এক একজন শিক্ষকের নামে বরাদ্দ থাকে। যার ফলে, প্রতিটি শ্রেণি কক্ষ হয়ে উঠেছে বিশেষভাবে স্বকীয়। প্রতিটি শিক্ষক তাঁর ও শিক্ষার্থীদের মেধা, মনন, রুচি, আগ্রহ ও বিষয়ের প্রয়োজনকে বিবেচনায় রেখে কক্ষগুলোকে সজ্জিত করেন। স্কুলের শিক্ষকদের সাথে আলাপ কালে এই প্রক্রিয়ার আরো কিছু সুবিধার কথা তারা জানালেন। তার মধ্যে একটা হল, দীর্ঘক্ষণ এক কক্ষে একটানা বসে থাকতে হয়না বলে শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্লান্তি আসেনা। অন্যদিকে, শিক্ষকও পাঠ্য উপকরনে থাকেন সম্পূর্ণ। শিক্ষার ব্যাপারে প্রায়ই বলা হয় যে একটা ভালো বিদ্যালয়ের দেয়াল থেকেও অনেক কিছু শেখার থাকে। ওখানের স্কুলের শ্রেণি কক্ষ দেখে আমার সেটাই মনে হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণি কক্ষে পর্যাপ্ত বইয়ের তাক রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে উক্ত তাকগুলো একটার পর একটা বই জমে সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রতিটি কক্ষ সজ্জিত হয়েছে বিষয় ভিত্তিক পোস্টার, ফেস্টুন এবং নানা উপকরণে। সুতারং শিক্ষার্থীদের বই বহন করতে হয়না। আবার পড়ানোর জন্য উপকরণের কোন ঘাঁটতি থাকেনা। শ্রেণি কার্যক্রম হয় ফলোপ্রসূ। অথচ এখানে বই না থাকার কারণে আমাদের শ্রেণি কার্যক্রম প্রায়ই ব্যহত হয়।

এর বাইরে সিনেমা, থিয়েটার, কনসার্ট, পার্ক ইত্যাদি জায়গাতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। এই সব অভিজ্ঞতার মাঝে যে বিষয়টা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তা হলো আমেরিকানরা মূলতঃ উৎসব উৎযাপনে দারুণ পারদর্শী। উৎযাপনের মাঝেই তাঁরা জীবনের অর্থ খোঁজে। আমাদের মতো করে জীবনকে গুঁটিয়ে রাখা ওদের একদম পছন্দনা। এক্ষেত্রে আবহাওয়া, ব্যস্ততা, কিংবা বয়স কোনো কিছুই বাঁধানা। উৎসব-উদ্দীপনার মাধ্যমেই ওঁরা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা পরাভূত করেন।

প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে আমাদের সবাইকে এক একটা আমেরিকান পরিবারের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়। এরা মূলত অবসরপ্রাপ্ত পেশাজীবী। আমি Dave এবং Shiela দম্পতির সাথে সংযুক্ত ছিলাম। তাঁদের কাছে সন্তানের ভালোবাসা পেয়েছি। পেয়েছি অনেক অনেক নির্ভরতা।

আমাকে ঘিরে ওঁদের সব কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রীয় ভাবনাই ছিল কিভাবে আমাকে স্বল্প সময়ে আমেরিকার সর্বোচ্চ ধারণা দেয়া যায়। সে চিন্তা থেকেই আমরা মিলে একটা সূচী করে ফেললাম। পার্ক, রেস্টুরেন্ট, কনসার্ট, লাইব্রেরি, লেক, খামার, কৃষক বাজার ইত্যাদি সব কিছুই ছিল তালিকায়। অনেকগুলো রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া করার সুযোগ হয়েছিল। তার মধ্যে একটার কথা বিশেষ মনে পড়ে। ঐ রেস্টুরেন্টের বিশেষত্ব হল, আপনি ওখানে খেতে গেলে আপনাকে গাড়িতে বসেই খেতে হবে। গাড়ি থেকে নামার কোনো সুযোগ নেই। সেবা দানকারীরা গাড়ির কাছে ছুটে আসবেন, খাদ্যতালিকা আপনার হাতে দিবেন, আপনার পছন্দগুলো জেনে নিবেন, গাড়ির গ্লাসের সাথে ট্রে লাগিয়ে দিবেন এবং খাওয়া শেষে প্রয়োজনে বিল নেয়ার জন্য POS মেশিন নিয়ে আসবেন। এরই মাঝে হয়ত আর একটা গাড়ি এসে দাড়াবে, সেবা দানকারী ওখানে ছুটবেন ঊর্ধ্বশ্বাসে। আমরা যতক্ষণ ছিলাম সেবাদানকারীদের নিরন্তন দৌড় দেখেছি। আমার কাছে বারবারই মনে হয়েছে আর কতক্ষণ! কিন্ত ওরা ক্লান্তিহীন কারণ সাধারণ রেস্টুরেন্টের তুলনায় ওরা একটু বেশিই পায়।

অনেক অনেক ব্যস্ততার মাঝেই মার্চের শেষ সপ্তাহে স্বস্তির উপলক্ষ হয়ে আসে সেমিস্টার বিরতি। পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি এবং ফারুক ভাই নিউইয়র্ক গিয়েছিলাম। প্রায় বারো ঘণ্টা বাস যাত্রা শেষে আমরা নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটনে উপস্থিত হই। গাড়ি থেকে নেমে বেশ রোমাঞ্চিত বোধকরি। তাহলে আমি এখন গগনচুম্বী এমারতের শহরে! খুব মনে আছে, ছোট বেলায় একবার কোনো একটা ক্যাল্যান্ডারে ম্যানহাটনের পাহাড়সম উঁচু স্থাপনা দেখে যারপরনাই মুগ্ধ হয়েছিলাম আর মনে মনে ভেবে ছিলাম যদি কোন একদিন ওখানে যেতে পারতাম। সেই কিশোর বয়সের ভাবনার এরূপ বাস্তব রূপান্তর দেখে সত্যিই ভালো লাগলো। বন্ধু রিমন আগে থেকেই আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো। সাথে সাথে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল আর একটা নতুন অভিজ্ঞতা। পাতাল রেল ভ্রমণের প্রথম স্বাদ। পাতাল রেলে চড়েই ওঁর বাসা জামাইকাতে গিয়েছিলাম। নিউইয়র্কের পুরো সময়টাই ওঁর বাসাতে অবস্থান করছিলাম। তবে ওঁকে ছাড়াই অন্যের সহযোগিতায় কিংবা একা একাই নিউইয়র্ক সিটি ঘুরে দেখার চেষ্টা করেছি। মূলত কাজের কারণে ওঁর জন্য সর্বদা সময় বের করা সম্ভব ছিলনা। টাইম স্কোয়ার, জাতিসংঘ ভবন, ফ্রীডম টাওয়ার, ব্রুকলীন ব্রিজ ইত্যাকার সবকিছুই আমাকে ছুঁয়েছে। বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে স্ট্যাচু অব লিবারটি। ব্যক্তিগতভাবে আমি স্বাধীনচেতা মানুষ। ইতিবাচক স্বাধীনতার মাঝেই আমি জীবন খুঁজে পাই। খুঁজে পাই স্বস্তি এবং বেঁচে থাকার অর্থ। লিবারটি আইল্যান্ড-এ পা রাখার পর মনে হয়েছিল স্ট্যাচুটা যেন আমাকে তাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। সত্যিই এ ছিল এক অন্য রকম অভিজ্ঞতা। বাল্যকাল থেকেই যে স্ট্যাচুটা নিজের কাছে একটা বিস্ময়, আজ আমি তার পাদদেশে। সিঁড়ি বেয়ে স্ট্যাচুর উপরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম আর প্রতিটি পদক্ষেপে শুনতে পেয়েছিলাম স্বাধীনতার, স্বাধীন চিন্তার জয়ধ্বনি।

এভাবেই ক্লাস, পরীক্ষা, স্কুল, সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা, সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণ করা, বন্ধু পরিবারের সাথে ঘুরে বেড়ানো, নায়াগ্রারা জলপ্রপাত দেখে চক্ষু সার্থক করা এবং সেমিস্টার বিরতিতে নিউইয়র্কে বন্ধু ও স্বজনদের বাসায় ঘুরে বেড়ানোর মধ্য দিয়ে পার হয়ে যায় নির্ধারিত সময়। ঘণ্টা ধ্বনি বাজে ফিরে আসার। কেন্ট থেকে ওয়াশিংটনে আসি ১১ মে ২০১৫। এখানেই হবে বিদায়ের আনুষ্ঠানিকতা। আমাদেরকে উপস্থাপন করতে হয় কেন্টে বসে করা আমাদের প্রোজেক্ট ওয়ার্ক (PDM)। গ্রহণ করতে হবে এতো দিনের পরিশ্রমের কাগুজে স্বীকৃতি 'সনদ'। সনদ প্রদানের দিন প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রদূতকে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে এসেছিলেন একজন কনসুলার যদিও অন্য অনেক দেশের স্বয়ং রাষ্ট্রদূতই এসেছিলেন। যাই হোক, বিদায়ের সুর বেজে উঠলো। আর থাকা চলবেনা। এবার তোমাকে যেতেই হবে। বিভিন্ন দেশের বিমানের সময় অনুযায়ী ১৫ তারিখ দুপর থেকেই আমাদেরকে বিমান বন্দরে নেয়া শুরু হয়েছিল। প্রত্যেকটা প্রস্থানই হয়ে উঠেছিল বেদনা বিধুর। বিদায়ের সেই ক্ষণগুলোতে অনেকেই হাউমাউ করে কেঁদেছিলেন। এ যেন জনম জনম ধরে চেনা কোনো পরম আত্মীয়কে বিদায় দেয়ার কান্না। আমি নিজেকে একটু শক্ত মনের মানুষ মনে করি। কিন্তু কান্নার ঐ মিছিলে ভিজেছিল আমার চোখও। এরই ফাঁকে মনে হয়েছিল যদি থেকে যেতে পারতাম। পরক্ষনেই মনের পর্দায় ভেসে উঠে দেশে ফেলে যাওয়া অতি প্রিয় মুখগুলো যাদেরকে খুব কাছ থেকে দেখা হয়নি বহুদিন। বিশেষ করে খুব করে টানে সেই সন্তান দুটো, বিদায়ের সকাল বেলা যাদের চোখে চোখ কিংবা মাথায় হাত রেখে বলে যাওয়া হয়নি বাবারা ভালো থেকো।

The Pentagon of success: The Magic behind Success

Sabiha Afsari
Lecturer, Department of Marketing

Success! It's a dream to someone, or someone gets it without facing much straggle. But being a successful person in life is not always happened as a miracle; rather most of the successful persons have a long story of struggle to reach it.

Gaining success or reaching the absolute goal needs a long and thorn way to go. If anybody miraculously gets success without any effort it will not definitely be lasted for long time and it will not be so much pleasurable to that person as it could be. Success or valuable thing got by chance always diminishes away easily and suddenly. So every human being should try to gain success in life or reach his long cherished dream by exercising some rules.

Some magical rules can be stated which can easily take a person towards his shining successful future. The magic behind success can be pointed out by a success pentagon which consists of five magical rules, though success is not actually a magic at all.

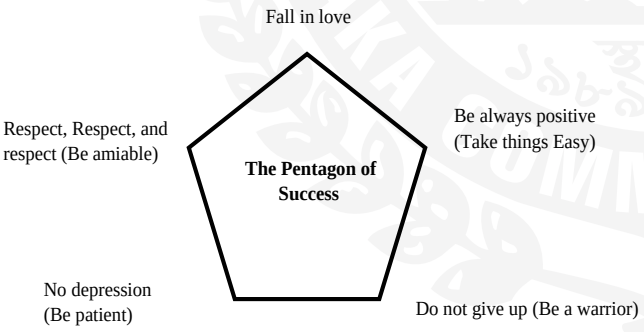

1. Fall in love:

You may be surprised to read this headline! Falling in love! Is it really a matter of being successful? Yes! It is. But this is not the love you actually mean! If you want to be successful or if you want to reach the peak in any area, you must have to fall in love with everything related to that area. A person has to fall in love with several things to gain success.

a) Love your parents, relatives, religion, country and other surroundings:

The first magic behind success is to love your surrounding persons and things. At first you must have to love your parents. Without loving your parents and other relatives you will never progress anyway. Beside this, you have to love your religion also. You also have to love the country you belong to.

b) Love your study:

You must have to fall in love with your study. If you can't love your subjects or courses of study, your discipline of study, your field of study, or your educational institution of study- you can never be a top scorer in your student life. If you do not find interest in any subject, discipline or area in study then try to change it if possible. If it is not possible to change, then take and think about it positively. Try to love. Give time in the subjects or courses you find hard or boring.

c) Love your job:

When you will enter the job sector after completing your study, you must have to fall in love with your nature of work and the organization you work with. If you can't do it, you can never be successful in your job field.

d) Love the way you are living in your life:

Always try to love the way of your life. Always try to love present condition and your havings, whether it is all good or mixed with good and ill things. Try to adapt everything you have in your life.

2. Be always positive (Take things easy):

Always try to be positive. If you can take everything easily in your life, then nothing can stand on the way of your success. Being a positive thinker is a matter of practice. Try to develop this virtue in your mind.

3. Do not give up (Be a warrior):

Success is not always easily comprehensible to everyone. Somebody needs much struggle and time to get it. Sometimes you may fall, you may cry, you may find it hard to reach your goal – never give up. Try to be a real warrior. Take the way and your straggle easily and just make it happen. After your rainy day, success will be only yours!

4. No depression (Be patient):

Depression is the most obvious obstacle to success. Your depression will never let you try to reach your goal. So discard your depression and be patient. The one and only defender against your depression is patience.

5. Respect, respect and respect (Be amiable):

Always respect the persons you surrounded by. Respect your parents, teachers, elders, younger, friends, classmates, relatives, bosses, superiors, subordinates and so on. Never be arrogant with anyone. Always try to be amiable. Your politeness is the indicator of your personality.

There will be ups and downs in everyone's life. You may fall, you may be alone in your way, or some incidents may make you cry. Never lose belief in you. Life cycle of a human being is a complex web and being on the peak or being successful is not an elusive thing. One can be successful by practicing this success pentagon. Best of luck!

ঢাকা কমার্স কলেজের স্বয়ংক্রিয় হিসাব পদ্ধতি ও হিসাব ব্যবস্থাপনা

মোঃ আশরাফ আলী
উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

ঢাকা কমার্স কলেজের হিসবারক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা করতে গেলেই একটি পূর্ণাঙ্গ হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ও হিসাব ব্যবস্থাপনার কথা বলতে হয়। কারণ কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কলেজের পরিচালনা পর্ষদ এবং অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষ হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ সচেতন থাকার ফলশ্রুতিতে ঢাকা কমার্স কলেজের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি শুরু থেকেই গোছালো একটা পদ্ধতিতে সংরক্ষণ হয়ে আসছে। কলেজের সূচনালগ্নে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা না থাকায় বেশি বেতনের অভিজ্ঞ হিসাবরক্ষক রাখা কলেজের পক্ষে সম্ভব ছিল না বিধায় তখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষককে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে কলেজের হিসাবকার্য পরিচালনা করা হতো।

ঢাকা কমার্স কলেজে হিসাব কার্যক্রমের জন্য আলাদা কোনো শাখা ছিল না। তখন কলেজের অফিস কক্ষেই হিসাবের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা হতো, যা ছিল খুবই অসুবিধাজনক। পরবর্তীতে এর প্রয়োজনীয়তার আলোকে কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজের ১নং ভবনের নিচ তলায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে হিসাব শাখাকে আলাদা শাখাতে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

কলেজে আলাদা হিসাব শাখা খোলার পর হিসাব শাখাকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাখা হিসেবে উন্নীতকরণের লক্ষে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। হিসাবপদ্ধতি ম্যানুয়াল থেকে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে রূপান্তরিত এবং পাশাপাশি দুইটি পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করায় কাজের পরিধি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়:

অটোমেশন পদ্ধতি: ২০১৩ সাল হতে হিসাব শাখা অটোমেশনের আওতায় পরিচালিত হয়ে আসছে। অটোমেশনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন বৃত্তান্তসহ অন্যান্য তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে প্রাপ্য ও বকেয়া পাওনাদি তাৎক্ষণিকভাবে এসএমএস করে জানিয়ে দেয়া হয়। হিসাব শাখার যাবতীয় বহিসমূহ সফটওয়্যার এ এন্ট্রির পাশাপাশি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতেও আপাতত রাখা হচ্ছে। এছাড়া কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের মাসিক বেতন-ভাতাদি, জীবন বৃত্তান্তসহ অন্যান্য তথ্যাদি Pay-Roll

Software এর মাধ্যমে আলাদাভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্যাটালগ পদ্ধতিঃ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কক্ষের ওয়ালসেলফকে ওয়াল আলমারিতে রূপান্তরিত করে ক্যাটালগ পদ্ধতিতে ফাইল রাখার ব্যবস্থা করা হয়, যার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ফাইল অতিসহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

কালেকশন পদ্ধতিঃ কোনো ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির পূর্বে প্রসপেক্টাস অনুযায়ী বিভিন্ন খাতের টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে আদায় করা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে একাডেমিক ক্যালেন্ডারের সঙ্গে মিল রেখে প্রতি তিন মাস অন্তর বেতনাদিসহ অন্যান্য চার্জ আদায় করা হয়ে থাকে। সাধারণত কলেজ থেকে সরবরাহকৃত নির্দিষ্ট পে-স্লিপ ছাত্র-ছাত্রীরা হিসাব শাখা হতে সংগ্রহ করে ঢাকা কমার্স কলেজের অভ্যন্তরে নির্ধারিত সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর কালেকশান সেন্টারে তাদের পাওনাদি পরিশোধ করে থাকে। এই স্লিপ টি তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা: ক. ছাত্র-ছাত্রীর কপি খ. ব্যাংকের কপি গ. কলেজের কপি। ব্যাংকে টাকা প্রদানের পর একই দিনে ব্যাংক থেকে কলেজের অংশ সংগ্রহ করে ছাত্র-ছাত্রীদের নাম, শ্রেণি এবং রোল নম্বর দেখে সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারের কালেকশন সফ্টওয়্যারে পোস্টিং দেয়া হয়। এছাড়া প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর পাওনাদি পরিশোধ হয়েছে কিনা তা সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে এসএমএস করে জানিয়ে দেয়া হয়।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের বিবরণঃ

উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (হিসাব প্রধান):

১. কলেজের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও অনুমোদনের জন্য নোট প্রদান।

২. দৈনন্দিন ভাউচার নিরীক্ষা থেকে শুরু করে হিসাব শাখায় সংগঠিত সকল আর্থিক লেনদেন নিরীক্ষা করা।

৩. কলেজের বাৎসরিক রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট প্রস্তুত ও অনুমোদন করানো।

৪. ব্যাংক এ্যাডভাইজ, বেতন বিল নিরীক্ষা ও অনুমোদন করানো, ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে বেতন ও অন্যান্য পাওনাদি আদায়ের নোটিশ তৈরি ও সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে এসএমএস দেয়া।

৫. কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাৎসরিক উৎসব বোনাস ও উৎসাহ বোনাস প্রদানের জন্য তথ্য-উপাত্ত নিরীক্ষা ও অনুমোদন করানো।

৬. প্রতিদিনের ক্যাশ বুক ও লেজার বুক যাচাইকরণ।

৭. কলেজের বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য অন্যান্য বিভাগকে সার্বিক সহযোগিতা ও বিভিন্ন কাজের সমন্বয় সাধন করা।

৮. কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন বিবরণী ও ট্যাক্স সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনে সহযোগিতা।

৯. হিসাব শাখার ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আর্থিক লেনদেনগুলো সফটওয়্যারে পোস্টিং দেয়া।

১০. হিসাব শাখার সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য অধীনস্থদেরকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান।

১১. কলেজের মাসিক ও বাৎসরিক প্রাপ্তি-প্রদান হিসাব, আয়-ব্যয় হিসাব ও উদ্বৃত্তপত্র তৈরি করা এবং সময়মত অডিট করানো।

১২. ফাইনান্স কমিটির মিটিং এর নোটিশ প্রদান, কার্যপত্র ও রেজুলেশন তৈরি এবং তা সংরক্ষণ করা ।

১৩. প্রত্যেক মাসের শেষে সমাপনী হাতে নগদ ও ব্যাংক জমা মিলানো।

১৪. জিবি'র চেয়ারম্যান, ফিন্যান্স কমিটির আহবায়ক ও অধ্যক্ষ এর সাথে ফান্ড (চেক) স্থানান্তরের অনুমতির জন্য যোগাযোগ রক্ষা করা ।

১৫. কলেজের প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ যখন যে বিশেষ কাজের দায়িত্ব প্রদান করেন তা যথাযথভাবে পালন করা।

উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (১ জন) :

১. পেটি ক্যাশ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় লেনদেন সংরক্ষণ ।

২. কলেজের বাৎসরিক রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট প্রস্তুত ও হিসাব নিরীক্ষা কাজে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সার্বিক সহায়তা করা।

৩. কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মাসিক বেতন বিবরণী তৈরি করে তা নিরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য প্রতি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে বিভাগীয় প্রধানকে জমা দেয়া।

৪. কলেজের দৈনন্দিন সংগঠিত লেনদেনের ভাউচারগুলো খাত অনুযায়ী সাজিয়ে তা নিরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য দিনের শেষে বিভাগীয় প্রধানকে জমা দেয়া ও অনুমোদনের পর তা সাজিয়ে সংরক্ষণ করা।

৫. সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাসিক ইনক্রিমেন্ট, শ্রান্তি বিনোদন, গ্রুপ বিমা, আয়কর প্রদানের জন্য বিবরণী এবং বিভাগীয় কর্মচারীদের নিকট থেকে বেতন ও ভাতাদি নিরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য বিভাগীয় প্রধানকে জমা দেয়া।

৬. কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাৎসরিক উৎসব বোনাস ও উৎসাহ বোনাস প্রদানের জন্য তথ্য-উপাত্ত নিরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য বিভাগীয় প্রধানকে জমা দেয়া।

৭. উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে হিসাব বিভাগের সার্বিক কাজে সহযোগিতা করা।

৮. কলেজের প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ যখন যে বিশেষ কাজের দায়িত্ব প্রদান করেন তা যথাযথভাবে পালন করা।

হিসাব সহকারী (৩ জন):

১. ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন আদায়ের নোটিশ করা ও পে-স্লিপ দেয়া।

২. ব্যাংক থেকে সংগ্রহকৃত পে-স্লিপ সফ্‌টওয়্যারে এন্ট্রি দেয়া।

৩. বিভিন্ন শ্রেণির সাপ্লিমেন্টারি টাকাসহ বিবিধ ক্যাশ আদায় করা।

৪. ভর্তি সংক্রান্ত টাকার বিবরণসহ অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য প্রদান।

৫. গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির বিল আদায় ও এগুলো ব্যাংকে জমা দেয়া ।

৬. নতুন ভর্তির তথ্য সংগ্রহ করা।

৭. ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করা।

৮. প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ, এটিএম বুথ সংক্রান্ত বিল ফরওয়ার্ড করা ও তথ্য সংগ্রহ করা, এমটিডিআর (ফিক্স ডিপোজিট) ভাঙানো ও চিঠি ড্রাফট করা এবং লেজার বুক এ পোস্টিং দেয়া

৯. পিএফ লোনের মুনাফা ক্যালকুলেশন করে কম্পিউটার শিট বের করা।

১০. বৃত্তির যাবতীয় কাজসহ সর্বোপরি কর্তৃপক্ষের দেয়া নির্দেশিত কাজ করা।

ঢাকা কমার্স কলেজের হিসাব দুই ধরনের। যথা: রাজস্ব হিসাব ও উন্নয়ন হিসাব। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে যাবতীয় লেনদেন এবং কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি প্রদানসহ অন্যান্য অভ্যন্তরীণ হিসাবসমূহ রাজস্ব হিসাবে রাখা হয়। কলেজের উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজের ব্যয় সংরক্ষণ করার জন্য উন্নয়ন হিসাব রাখা হয়। উন্নয়ন হিসাবের মধ্যে প্রধানত নির্মাণকার্যকেই বোঝানো হয়। এ ছাড়া নতুন কিছুর সংযোজনও উন্নয়ন হিসাবে রাখা হয়। রাজস্ব এবং উন্নয়ন হিসাব সংরক্ষণের জন্য আলাদা আলাদা ক্যাশ ও লেজার বহি রাখা হয়ে থাকে।

কলেজের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন লেনদেন, কেনাকাটা এবং অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদনের জন্য রিক্যুইজিশনের মাধ্যমে অধ্যক্ষের অনুমোদনের পর তা সম্পন্ন হয়ে থাকে। কলেজের প্রয়োজনে কিছু ছোটো-খাটো খুচরা ব্যয় ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করা যায় না, যা ক্যাশে লেনদেন করতে হয়। যেমন, যাতায়াত বিল, গাড়ির তেল ক্রয়, বিভিন্ন মনিহারী দ্রব্যাদি ক্রয় ইত্যাদি। এই ধরনের লেনদেনের জন্য প্রয়োজনে পেটি-ক্যাশ বহি সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া কলেজের সিংহভাগ খরচ উন্নয়ন খাতে করা হয় সেহেতু প্রতি চার মাস অন্তর ব্যয়কৃত উন্নয়ন ব্যয় পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ডেবিট কার্ড দিয়ে অতি অল্প সময়ে তাদের বেতন-ভাতাদিসহ অন্যান্য কার্যাদি কলেজে স্থাপিত এটিএম বুথের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, ঢাকা কমার্স কলেজের হিসাব বিভাগকে সর্বদাই যুগোপযোগী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ করতে কর্তৃপক্ষ সর্বদাই সচেষ্ট রয়েছেন। সুতরাং ভবিষ্যতে এই বিভাগের কর্মতৎপরতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

বিদেশের মাটি যত সচ্ছলতাই দান করুক, বিশ্বাস ও তৃপ্তি দিতে পারে না-ওয়াল্টার লিপম্যান

গল্প

বেলাশেষে

আবু তাহের মুহাম্মদ মহিহ্
বিভাগ: অর্থনীতি, রোল: ৩৪৮

১৯৮৬ সাল, সেদিন ছিল রবিবার; রবির আলোতে কাস্টমস কোয়ার্টারের চারিদিকে বিষাদের ছায়া। গত রাতে মারা গেছেন কমল সাহেবের স্ত্রী শ্রাবন্তী কর্মকার, সারা বাড়িতে শ্বাসরুদ্ধকর নীরবতা। ছেলে সুদীপকে হয়তো স্পর্শ করল না মা হারানোর বেদনা। কমল সাহেব সরকারি চাকুরিজীবী। তাই বিভিন্ন স্থানে পোস্টিংয়ের কারণে ছুটতে হয় সারাদেশে। তাঁর পোস্টিং এখন পটুয়াখালীতে, পরিবার থাকে ঢাকায়। অর্ধাঙ্গী হারিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়ে গেছেন কমল সাহেব। বাড়িতে তার একমাত্র ছেলেকে দেখভাল করার কেউই নেই। অতঃপর সমস্যা সমাধানে পরিবারের সদস্যদের শরণাপন্ন হলেন তিনি।

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুদীপের ভবিষ্যতের আলোচনা হওয়ার কথা থাকলেও আলোচনা বেশি হল কমল সাহেবের বিয়ে নিয়েই। সদ্য সহধর্মিনী হারানো কমল সাহেব যদিও নিজের বিয়ে নিয়ে চিন্তিত নন। তার সমগ্র চিন্তা গ্রাস করেছে ছেলে সুদীপের ভবিষ্যৎ-ভাবনা। তবুও ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার জন্য নতুন মা আনব কি? তুমি কি বল?" সুদীপ মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলেও প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারল না। কমল সাহেব ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। অবশেষে একক সিদ্ধান্তে পুত্রকে স্কুলেরই হোস্টেলে দেবার চিন্তাভাবনা শুরু করলেন। যদিও হোস্টেলের নিয়ম অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত হোস্টেলে থাকা যায়। স্কুলের হেডমাস্টার সাহেবকে বললেই যে সকল ব্যবস্থা হয়ে যাবে এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন।

সপ্তাহ খানেক পরই সুদীপকে নিয়ে স্কুলের হোস্টেলে ভর্তি করিয়ে দিয়ে আসলেন। হেডমাস্টার সাহেব সকল যাবতীয় বিষয় ও নিরাপত্তা নিয়ে কমল সাহেবকে আশ্বস্ত করলেন। সাত বছরের শিশুর যেখানে মাতৃসান্নিধ্যে দিন কাটানোর কথা, সেখানে সুদীপের শুরু হল নতুন জীবনের অভিজ্ঞতা। হোস্টেলের সবাই সুদীপের তুলনায় পাঁচ-সাত বছরের বড়। সুতরাং, মেলামেশার মত সহযোগীর ব্যাপক অভাব অনুভূত হয়। হোস্টেল কর্তৃপক্ষ প্রথম দিনে তাকে আসন সংকটের জন্য কোনো ব্যক্তিগত আসন ও কক্ষ দিতে পারল না। অফিস রুমে বসে থাকল সারাদিন। রাত এল। রাত কোথায় কাটাবে সুদীপ? অবশেষে ত্রাতা হয়ে আবির্ভূত হলেন আমজাদ ভাই। আমজাদ তার স্কুলেরই ছাত্র। হোস্টেলে থাকছে গত দুই বছর ধরে। শিশু বলে আমজাদ সুদীপকে নিজ কক্ষে আশ্রয়দান করতে ইচ্ছা পোষণ করলে কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই রাজি হয়ে গেল। সে থেকেই আমজাদের ঘরের বেড শেয়ার করে থাকত সুদীপ।

প্রথম কয়েকদিন বেশ ভাল কাটল। কিন্তু ক্রমেই মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীনম্মন্য আচরণ সুদীপকে কষ্ট দিতে লাগল। তারপর সে হোস্টেলে নানা ধরনের বাজে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে লাগল। একমাস আগেও তার মা সুদীপকে নিয়মিত খাইয়ে দিতেন। সুতরাং কিভাবে খেতে হয় সে সম্পর্কে কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা তার ছিল না। খাবার সময় তার কাপড়ে ঝোলের দাগ ছিল অনভিজ্ঞতার প্রমাণ। সে অনুভব করল যে তার কাপড় বেশ ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু কিভাবে কাপড় ধুতে হয় তা তার অজানাই ছিল। আমজাদ ভাইয়ের কাছে সাহায্যের প্রার্থনা জানালে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। পানিতে কাপড় ভিজিয়ে সে রোদে শুকাতে দিল। কাপড়ে রয়ে গেল ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। দেড়মাস পর একদিন কমল সাহেবের ফোন এল স্কুলের টেলিফোনে। এরমধ্যে হয়ে গেছে সুদীপের সাময়িক পরীক্ষা। কমল সাহেব সুদীপকে আশ্বস্ত করলেন যে রেজাল্ট দিলে সুদীপকে নিয়ে বাড়িতে যাবেন। আশ্বাস পেয়ে সুদীপের প্রাণে কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তবে সুদীপের মনে অন্য চিন্তা, পরীক্ষা তেমন ভাল দেয়নি সে। ফেল করলে নিশ্চিতভাবেই রেড টিসি দেবে।

সপ্তাহ খানেক পরই রেজাল্ট হলো। সকল বিষয়েই সে ফেল করল। হোস্টেলের পরিচালককে রেজাল্ট দেখাতেই তিনি পুরোপুরি অগ্নিশর্মা। অতঃপর পরিচালক সাহেবের বেধড়ক পিটুনি শুরু হলো। বেদম পিটুনি খেয়ে রাতে সুদীপের ভীষন জ্বর এল। সুদীপ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, আর বলছে, "মায়ের কাছে যেতে ভীষণ ইচ্ছা করছে, এই দুনিয়া আমার জন্য না।" হোস্টেলের ছাত্ররা সুদীপের অসুস্থতার কথা জানাল কর্তৃপক্ষকে। রাত বেশি হয়েছে এই অজুহাতে কর্তৃপক্ষ সকালেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে বলে আশ্বস্ত করল। উপায়হীন হয়ে ছাত্ররা সুদীপকে তার কক্ষে নিয়ে শুইয়ে দিল।

পরের দিন কমল সাহেবের কাস্টমস অফিসে ফোন এল

স্কুল থেকে। ফোনের ওপারে তিনি কি শুনলেন কে জানে? কমল সাহেবের চোখের কোণে নেমে এল অশ্রুধারা। জীবনদ্বীপ নিভে গেছে সুদীপের পরের দিন ঢাকায় এসে কমল সাহেব মৃত সন্তানের পাশে অব্যক্ত ভাষায় অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। জগতের সকল কিছু হারানোর যন্ত্রণা স্পর্শ করল তার মনের মানচিত্র।

পরিবারের ইচ্ছায় সপ্তাহ খানেক পরই আপন ফুফাতো বোনের সাথে কমল সাহেবের বিয়ে হলো। ঠিক এক বছর পর সুদীপের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে কমল সাহেব আবিষ্কার করলেন যে তার হৃদয়ে সুদীপের স্থান আজ শূন্য। সে স্থান দখল করেছে তাঁর তিন মাসের সন্তান বিমল। নিজেকে হারিয়ে হয়ত নতুন দীপশিখা জ্বালিয়ে দিল সুদীপ।

স্মৃতি পরীক্ষা

শিখিল ইসলাম
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩১৩০৮

সকাল ৫টা। সবাই ঘুমে। শুধু আমি ছাড়া। সারারাত চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারিনি। কারণ, আজ আমার এস.এস.সি পরীক্ষার রেজাল্ট। এই পরীক্ষা আমার দশ বছরের সাধনা। খুব ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে সবার রেজাল্ট ভাল হবে শুধু আমার রোলটাই পাওয়া যাবে না। কেন এই ভয়টা পাচ্ছি বুঝতে পারছি না।

অসহ্য মাথা ব্যথা আর খুব ভয় নিয়ে বিকেল সাড়ে তিনটায় স্কুলে গেলাম। বন্ধুদের সাথে দেখা হলো, কিন্তু তাও ভাল লাগছে না। প্রত্যেকটি মুহূর্ত যেন আরও দীর্ঘ মনে হচ্ছে। সময় একদমই যেতে চাইছে না।

অবশেষে বিকেল সাড়ে চারটায় রেজাল্ট ঘোষণা করা হলো। সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। রেজাল্ট শুনে কেউ খুশিতে চিৎকার করে উঠলো আবার কেউ কেউ খুব মন খারাপ করলো। আর মাত্র কয়েকজন পরই আমার রোল নম্বর। আমার রোল নম্বর বলার সাথে সাথে আমি আর কান্না চেপে রাখতে পারলাম না। কারণ আমার কাছ থেকে সবাই যে রেজাল্ট আশা করেছিল, আমি সে রকম করতে পারিনি।

আজ আমার জীবনে সবচেয়ে দুঃখের ঘটনা এই রেজাল্ট। আজ সবচেয়ে দুঃখের দিন। আমি কি পারব আমার এই দুঃখকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে সব রেজাল্টের দিনকে সবচেয়ে সুখের দিন করতে?

ভ্রমণ প্রকৃতি এবং আমরা তিনজন

খন্দকার রবিউল ইসলাম
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৩৯০৫

খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। এই তো এই সেপ্টেম্বরেই। চোখের সামনে এখনও জ্বলজ্বল করছে দৃশ্যগুলো।

সাজ্জাদ, আমি আর শোভন। বছর তিনেকের পরিচয় আমাদের। এর মধ্যেই বন্ধুত্ব নামের সোনার শিকলে বেশ শক্তপোক্তভাবেই বেঁধে নিয়েছি পরস্পরকে। তখন কলেজে পড়ি। তিনজনই ভিন্ন ভিন্ন কলেজে আছি। কিন্তু ঐ যে বললাম সোনার শিকল। তা কি আর ভাঙ্গা যায়। আমাদের বন্ধুত্বটা ঈর্ষণীয়ও বটে। এর একটি অন্যতম কারণ হয়ত আমরা তিনজনই ঘুরতে ভালোবাসি। অজানাকে জানতে, অদেখাকে দেখতে ভালোবাসি। ভালোবাসি নিজেদেরকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে। আচ্ছা, আর কথা না বাড়াই। এবার মূল ঘটনায় আসি।

কলেজ কোচিং, প্রাইভেট টিউটর, পড়াশোনা এসব নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। সবকিছু ছেড়ে একটু মুক্ত হয়ে বুক ভরে শ্বাস নেয়ার এক তীব্র ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়েছিল। মনটা কেবলই পালাই পালাই করছিল। সাজ্জাদ আর শোভনের ক্ষেত্রেও তেমনটাই ঘটেছিল। ব্যাস, শুরু হয়ে গেল চিন্তাভাবনা। কোথায় যাওয়া যায়? কলেজ থেকে ছুটি পাব কিনা। কত টাকা লাগবে। আরও কত কি! হঠাৎ করে একদিন দেখলাম, আমাদের তিন বন্ধুর ফেসবুকে যে চ্যাটগুলো আছে সেখানে শোভন বেশকিছু ছবি পাঠিয়েছে, সেই সাথে জায়গাটার বর্ণনাও। ছবিগুলো দেখে আমার মাথায় প্রথম যে শব্দটা নাড়া দিয়ে উঠল তা হল অসাধারণ। জায়গাটি হল বিরিশিরি। সুসং দুর্গাপুরের একটি সীমান্তবর্তী অঞ্চল। গারো পাহাড়, চিনামাটি, নীল আর সবুজ পানির

সংমিশ্রন, রাজবাড়ী, আদিবাসী, মালাই চা আর বালিশ মিষ্টির সমাহার পুরো এলাকাজুড়ে। জায়গাটা একদম পছন্দসই। সাজ্জাদ তো শোনামাত্রই এক পায়ে খাড়া। সমস্যাটা হল ছুটি নিয়ে। যেতে আসতে এবং থাকতে কমপক্ষে তিনদিন তো লাগবেই। অনেক গবেষণার পর সাজ্জাদ একটা পৈশাচিক হাসি দিয়ে ঘোষণা দিল, ৫ই সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমীর ছুটি আর ৪ তারিখ শুক্রবার। তাই আমরা যদি বৃহস্পতিবার রাতে রওনা দেই তাহলে শুক্রবার সকালে গিয়ে পৌঁছাব। শুক্র, শনি ঘোরাঘুরি করে শনিবার রাতে ফিরে আসব। আমরা বললাম, হুমম... তা করা যায়। বেশ আনন্দ পাচ্ছিলাম। ঠিক তখনই মাথার মধ্যে নতুন একটা চিন্তা এসে পড়ল। সাধারণত আমাদের এই বয়সটাতে বাইরে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার ব্যাপারটা পরিবার থেকে খুব একটা প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। আগেরবারও অনেক কষ্টে কোনোমতে বাসা থেকে অনুমতি পেয়েছিলাম। যথারীতি এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। কীভাবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করলাম সে ইতিহাসটা না হয় গোপন থাকুক। তবে অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন আমার বাবা। তিনি কখনোই চান না যে আমার ভ্রমণ পিপাসু মনটা নষ্ট হয়ে যাক।

৩ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা। আমি, শোভন, সাজ্জাদ তিনজন ফার্মগেটে এসে একত্র হলাম। তারপর বাসে চড়ে কমলাপুর রেল স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। অবশেষে বহু প্রতীক্ষার পর ঠিক রাত ১২টা ২০মি. এ আমাদের ট্রেনটা সুনামগঞ্জ এর উদ্দেশ্যে ছাড়ল। সারারাত ট্রেনে ভ্রমণের অভিজ্ঞতাটি ছিল এক কথায় অসাধারণ। সৌভাগ্যক্রমে আমি আর শোভন জানালার পাশে সিট পেয়েছিলাম। সাজ্জাদ প্রথমে আফসোস করলেও পরে ব্যাপারটা মেনে নিয়ে একটা উপন্যাস পড়া শুরু করে। জানালা দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ শীতল বাতাসের ঝাপটা লাগা, ঘুমন্ত স্টেশন দেখা, নদীর উপর দিয়ে ট্রেন যাওয়া আর সেই পানির ঢেউয়ের তালে তালে বাঁকা চাঁদ আর তারার খেলা কিংবা নিস্তব্ধ স্টেশনে স্বল্প বিরতিতে চা খাওয়া- এই প্রত্যেকটি বিষয় এতটাই অসাধারণ ছিল যে সারারাত আমরা তিনজন একবারের জন্যেও চোখের পলক ফেলিনি। তবে সবচেয়ে সুন্দর যে দৃশ্যটি ছিল তা হল রাত থেকে ভোর হওয়ার অপূর্ব এক কারুকাজ। দূর অজানা থেকে ভেসে আসা আযানের মৃদু ধ্বনির সাথে সাথে চারপাশটা আস্তে আস্তে আরো স্পষ্ঠ হয়ে ওঠার এ দৃশ্য আগে কখনও এত গভীরভাবে দেখা হয়নি।

অবশেষে সকাল সাতটায় আমরা সুনামগঞ্জ স্টেশনে গিয়ে পৌঁছালাম। ওখান থেকে বিরিশিরির দূরত্ব প্রায় ২০ কিলোমিটারের মত। ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করার পর বিরিশিরি'র একটি বাস পেলাম। এই ফাঁকে সকালের নাস্তাটাও সেরে নিয়েছিলাম। বাসে ওঠার কিছুক্ষণ পর টের পেলাম পৃথিবীর অন্যতম কঠিন রাস্তা হল ঐ রাস্তাটা। বাঁকা পথ, এবড়ো থেবড়ো অবস্থা। ইট বিছানো পথের যেখানে সেখানে গর্ত। একেকটি ঝাঁকি খাচ্ছিলাম আর মনে হচ্ছিল কেউ আমাকে আছাড় মারছে প্রবল আক্রোশের সাথে। প্রায় ৩০ মিনিট যাওয়ার পর বাস আর এগুলো না। জানা গেল আমাদের কিছুদুর সামনেই একটা ট্রাক গর্তে পড়ে গেছে। পুরো এক ঘণ্টা বাসের মধ্যে বসে থেকে বিরক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম হেঁটে যাব। মিনিট দশ হাটার পরই বিরিশিরির একটা টমটম গাড়ি পেয়ে গেলাম ভাগ্যক্রমে। বিরিশিরি পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেলা বেজে গেল প্রায় এগারোটা। সেখানে একটা স্থানীয় আদিবাসী বাসিন্দার রেস্ট হাউজে উঠে পড়লাম। রুমে গিয়েই তিনজন তিন বিছানায় ধপাস করে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর গোসল করে দুপুরের খাবার খেলাম।

বিকেল বেলা আমরা ঘুরতে বের হলাম। আমরা প্রথমেই যে দিকটায় গেলাম সেটাকে স্থানীয়রা বলে থাকেন গারো পাহাড়। আমাদের সঙ্গী হলো মনু মিয়া। স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ায় তার মোটামুটিভাবে সবগুলো স্পটই মুখস্থ। আমরা মনু মিয়ার বকবকানি শুনতে শুনতে পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে পৌঁছালাম। পাহাড়ের বাহারি সৌন্দর্য্য ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমার দুচোখ বারবার মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। প্রকৃতি যেন তার অপরূপ পসরা সাজিয়ে বসে আছে। মনু মিয়ার দক্ষতায় আমরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়টায় উঠতে সক্ষম হয়েছিলাম। এই পাহাড়টাতে যদিও ওঠা নিষেধ ছিল তবুও আমরা উঠেছিলাম। কোনো সাধই অপূর্ণ রাখতে নেই। পাহাড়টার বিশেষত্ব ছিল অনেক অনেক বেশি। এক পাশে মেঘালয়, অন্যপাশে আসাম, সামনে ইন্ডিয়ান বর্ডার। বিএসএফ এর নিরাপত্তা ঘাঁটিগুলোও ছিল। কাঁটাতারের বেড়ার এক জায়গায় ভাঙ্গা। সেখান দিয়ে অবাধে যাওয়া আসা করছে স্থানীয় আদিবাসীরা। যাই হোক, মেঘালয়, আসাম, গারো পাহাড় সব মিলিয়ে এতটাই সুন্দর লাগছিল যে আমরা আবোল তাবোল কথা বলছিলাম। নিজেদের মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ।

নেমে আসার সময় দেখা হল অপরূপ মায়াবী এক ঝর্ণার সাথে। ঝর্ণার শীতল পানিতে দুটি বাচ্চা মেয়ে খেলছিল, পানি ছিটাচ্ছিল আবার কাঁদা দিয়ে এক জায়গায় ঘরবাড়িও বানাচ্ছিল। আমরাও যোগ দিলাম তাদের সাথে। মনু মিয়া ছবি তুলছিল একটু পর পর। বোধহয় এতটা আনন্দ সে আগে কখনও পায়নি। ফিরে আসার সময় কয়েকজন আদিবাসীর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম। যেহেতু আমরা তাদের ভাষা বুঝিনা তাই মনু মিয়া আমাদের মাধ্যম হিসেবে সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল। সন্ধ্যা হয় হয় ভাব। আমরা দ্রুত পায়ে ফিরছিলাম। পথিমধ্যে আমরা বিরিশিরির বিখ্যাত মালাই চায়ের স্বাদ নিলাম। তারপর বাজার থেকে বালিশ মিষ্টি কিনে রেস্ট হাউজে চলে গেলাম।

পরদিন সকালবেলা, সাড়ে ছ'টার এ্যালার্ম বেজে চলছে। দ্রুত উঠে পড়লাম। বাকি দু'জনকেও অনেক কষ্টে টেনেটুনে ঘুম থেকে জাগালাম। সাতটার মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম, সাথে মনু মিয়ার রসালো গল্প।

ঘণ্টাখানেকের আধাপাকা রাস্তায় রিক্সা যাত্রা শেষে আমরা এক মুদি দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। হঠাৎ করে একদল বালক এসে উপস্থিত। এরা এখানেই থাকে। তাদের প্রধান কাজ হল অতিথিদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন স্থান দেখানো। মনু মিয়া বলল, "ভাইবোনেরা, আগে নিয়া যান। আমি একটু বসলাম।" আমরা সম্মতিসূচক মাথা দুলিয়ে রওনা হলাম। বালকদল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে শুধু একজনকে পাঠালো। নাম ফরিদ। আমি আর শোভন সামনে সামনে যাচ্ছিলাম। সাজ্জাদ ফরিদের সাথে একটা ভাব জমানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। এই যেমন "তোমার হাতে যে অক্ষরটা লিখেছ মেহেদী দিয়ে সেটা কি কোনো মেয়ের নামের প্রথম অক্ষর?" বালকটি হাঁ-না কিছু বলছে না। শুধু মিটিমিটি হেসে লাল হচ্ছে। সাজ্জাদও হাল ছাড়ছে না।

ও, আল্লাহ! এটা কি দেখতেছি! সত্যি তো? নাকি চোখের ভাবনাই কেবল! সাজ্জাদ বলল, দোস্ত অদ্ভুত সুন্দর। বড় বড় পাহাড়ের গা ঘেঁষে লেকের জলের মত বয়ে গেছে। রং ফিরোজা ধরনের। একে ঠিক কি বলা উচিত আমি জানিনা। ফরিদের কাছ থেকে জানা গেল শীতকালে পানির রং একদম নীল হয়ে যায়। বোঝাই যাচ্ছে অসম্ভব সুন্দর। অনেকগুলো ছবি তুললাম। এতক্ষণ আমরা নিচু পাহাড় দিয়ে হাঁটছিলাম, এখন উঁচু পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করলাম। খুবই দুর্গম পথ। অধিকাংশই পাথুরে মাটি, পায়ে ব্যাথা লাগে। আমরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট পড়ে অনেক কষ্টে পানির দিকটায় নেমে এলাম। আমি সাঁতার জানিনা। শোভন আর সাজ্জাদের আনন্দ দেখে কে! ওরা ঝাঁপ দিয়ে নেমে পড়ল। সাঁতরাচ্ছে, চিল্লাচ্ছে, সৃষ্টির প্রশংসা করছে, আরো কত কি! আমি ভয়ে ভয়ে কিনারার দিকেই রইলাম। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে মাথায় পানি দিচ্ছিলাম আর ওদের আনন্দ দেখছিলাম। ফরিদকে শোভন ছবি কীভাবে তুলতে হয় দেখিয়ে দিয়েছে। তাকে এ ব্যাপারে খুবই উৎসাহিত মনে হচ্ছিল। আমরা অনেকক্ষণ গোসল করার পর জামা-কাপড় ঠিক করে সেই দোকানের কাছে এসে মনু মিয়াকে নিয়ে রেস্টহাউজে ফিরলাম। পথিমধ্যে অবশ্য একটা রাজবাড়িও দেখেছিলাম।

আসার সময় টিকেট কাউন্টারে গেলাম। জানতে পারলাম পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাস ছেড়ে দিবে। আমরা দৌড় দিয়ে রেস্টহাউজে চলে গেলাম। দুই-তিন মিনিটের মধ্যে ব্যাগ গুছিয়ে, হাতমুখ ধুয়ে, ম্যানেজারকে বিদায় জানিয়ে বাসে উঠেছিলাম। কীভাবে এত দ্রুত এসব সম্ভব হয়েছিল তা আমার কাছে অজানা।

বাসে জানালার পাশে বসে ছিলাম। তখনও পুরো আকাশটা দেখা যাচ্ছিল। শোভন ঘুমাচ্ছে, সাজ্জাদ উপন্যাস পড়ছে, আমি ভাবছি, ফিরে যাচ্ছি কেন?

স্মৃতি বাগেরহাটে কাটানো একদিন

মোঃ আমিনুল ইসলাম আশিক
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৪০৩৬

রাত এখন প্রায় ৩টা। নিগূঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে সমস্ত নগরী, এরই মাঝে তিনটি প্রাণী বাসের মাঝের দিকের সিটে জড়োসড়ো হয়ে আছে। এদের মধ্যে একজন নিদ্রা মাতৃর কোলে শায়িত। আর অন্য দুজন নানা গল্প গুজবে পার করে দিচ্ছে সারাটা পথ। গন্তব্য বাগেরহাট।

- বাহ্ সাহেবের ঘুম দেখ
- জয়ের কথা বলছিস?
- হুম, ঘুমকাতুরে মানুষকে নিয়ে ঘুরতে আসতে নেই।
- শুধু কি ঘুম কাতুরে? বরং যথেষ্ট পরিমাণে বোরিং পারসনও বটে।
- হুম, তবুও ওর কথায় কখনো কখনো কেমন জানি আচ্ছন্ন হয়ে যাই। তাই না?
- হুম, ওর প্রতিটি কথা যেন জীবনেরই প্রতিচ্ছবি।

আরিচা ফেরী ঘাটের কাছে, খুব জ্যামের মধ্যে ঘুম ভাঙ্গল জয় এর। আশে পাশে তাকিয়ে দেখল সাহেদ আর অপূর্ব নিদ্রার অতল গভীর সাগরে ডুব দিয়েছে। একবারের জন্য ঘড়িটার ওপর চোখ বুলালো। সময় তখন ৪:৫৫। এত ভোরে ঘুম থেকে উঠে যদি শিশির, গাছ-গাছড়া বা প্রাকৃতিক কোন সৌন্দর্য চোখে পড়ে তবে এক প্রকার কবি কবি ভাব চলে আসে। কিন্তু জয়কে এখন যা দেখতে হচ্ছে, তাতে কবিতা তো দূরের কথা, গদ্য সাধনাও দুঃসহ বলে মনে হচ্ছে।

বাসের ভেতর তাকালে কিছু ঘুমন্ত ও আধো ঘুমন্ত মানুষ আর বাইরে তাকালে কিছু বাস আর ট্রাক ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বাস প্রায় কচ্ছপ গতিতে ফেরীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তাই জয় এবার বাস ছেড়ে রাস্তায় নামল। প্রকৃতির মহিমার খোঁজে। হঠাৎ রাস্তার পাশে একটা ছোট্ট ঘাসের উপর জমে থাকা শিশির চোখে পড়ল। মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি।

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দু'পা ফেলিয়া;
একটি ধানের শীষের ওপর,
একটি শিশির বিন্দু।

কিরে জয়! বাইরে কেন? ভেতরে আয়।

সাহেদ ডাকছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে জয়কে দেখতে না পেয়ে খানিক ভয়ই পেয়েছিল। বাস এতক্ষণে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে আবার চলতে শুরু করেছে। তিন বন্ধু পথ চলতে চলতে নানা ধরনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করল। যার বেশির ভাগটাই ছিল ভ্রমণ সংক্রান্ত। এক সময় ওরা বাগেরহাটে পৌঁছাল। হোটেলে মালপত্র রেখে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সকাল ১০:০০ টার মধ্যে তৈরি হয়ে ওরা চলল ষাট গম্বুজ মসজিদের দিকে। অপূর্ব এই স্থানে আগেও বহু বার এসেছে। কারণ এক সময় ওর বাবার কর্মক্ষেত্র ছিল বাগেরহাট। ওর বাবার সরকারি চাকরীর ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোরার অভিজ্ঞতা রয়েছে অপূর্ব-র। তাই অপূর্বই একমাত্র ওদের দু'জনকে গাইড করতে পারে।

হোটেল থেকে প্রায় ১৫ মিনিট এর দূরত্বে ওরা ষাট গম্বুজ মসজিদে এসে পৌঁছাল। প্রবেশ করার পর পরই সাহেদ আর জয় অপূর্ব-র কাছ থেকে এই অসামান্য ঐতিহাসিক স্থাপত্যর ইতিহাস জানতে চাইলে, অপূর্ব শুরু করল,

– 'ভৌগোলিক পরিমাপানুসারে এই মসজিদটি বাগেরহাটের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি অতি প্রাচীন মসজিদ। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে, এর গায়ে কোনরূপ শিলালিপি নেই, তাই কোন সময়কালে এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল তার সঠিক কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে, ধারণা অনুসারে ১৪৪০ সালে সুফী সম্রাট খান জাহান আলী এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। তিনি একজন সুফী সাধক ছিলেন। এই অঞ্চলে আসার মূল কারণ যদিও ইসলাম প্রচার ছিল, তবুও তিনি একজন সমাজ কর্মীরূপে বাগেরহাট জেলার যথাসাধ্য উন্নতি সাধন করে গেছেন। তিনি এই অঞ্চলে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক স্থাপনা নির্মাণ করেন। তিনি নিজ প্রচেষ্টায় দুটি দীঘি খনন করেন, যা এখনও এই অঞ্চলের মানুষের কাছে ঘোড়া দীঘি ও দরগা দীঘি নামে পরিচিত।'

এই সকল ইতিহাসের ব্যাখ্যা দিতে দিতে ওরা মসজিদ এবং মসজিদ সংলগ্ন বাগানে ঘুরছিল। এক সময় তারা মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে এসে উপস্থিত হতেই একটি দীঘি দেখতে পেল। অপূর্ব আবার ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করল,

– 'এই যে দীঘিটির সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এর নাম হচ্ছে দরগা দীঘি। ঘোড়া দীঘি অন্যস্থানে। দীঘি সংলগ্ন খান জাহান আলীর কবর ও দরবার শরীফও ওখানেই অবস্থিত, এবং সবচাইতে চমকপ্রদ ব্যাপারটি হচ্ছে, এ দীঘিতে কুমির

আছে। তা আরো বিস্তারিত ঘটনা। পরে আবার বলা যাবে।'

ওরা এবার ধীরে ধীরে মসজিদের ভেতরের অংশে প্রবেশ করল। সেখানে ওরা তিনজনই নামাজ পড়ে নিল। এবং নামাজ শেষে সম্পূর্ণ মসজিদের ভেতরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সাহেদ ও জয় যা দেখছে তাতেই কৌতুহলী হয়ে উঠছে। জয় একবার জিজ্ঞেস করল,

– আচ্ছা একে ষাট গম্বুজ মসজিদ বলার কারণ কি? এর গম্বুজ কি মোট ষাটটি?

– ভাল প্রশ্ন করেছ। এই মসজিদটির মূলতঃ কোনো নাম ছিল না। ধারণা করা হয়, ১৬০০ শতাব্দীর শুরুর দিকে কেউ এর গম্বুজ সংখ্যা আবিষ্কার করে এবং তা ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। এর গম্বুজ সংখ্যা ৭৭টি। এটিকে ১৯৮৩ সালে ইউনেস্কো একটি ঐতিহ্যবাহী স্থানের সম্মান প্রদান করে। এই মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে বাইরের দিকে প্রায় ১৬০ ফুট ও ভিতরের দিকে প্রায় ১৪৩ ফুট লম্বা। পূর্ব-পশ্চিমে বাইরের দিকে প্রায় ১০৪ ফুট ও ভিতরের দিকে প্রায় ৮৮ ফুট চওড়া। দেয়ালগুলো প্রায় ৮.৫ ফুট পুরু।

ইতিহাস বর্ণনা করতে করতে ওরা আরো কিছু খেয়াল করল, এই মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ১১টি বিরাট আকৃতির খিলানযুক্ত দরজা রয়েছে। মাঝের দরজাটি অন্যগুলোর চেয়ে বড়। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে আছে ৭টি দরজা। মসজিদের চার কোণে চারটি মিনার উপরের দিকে সরু হয়ে উঠে গেছে। এদের কার্নিশে বলয়াকার ব্যান্ড ও চূড়ায় গোলাকার গম্বুজ আছে। লোকমুখে শোনা যায় কোনো এক আমলে এগুলো আযান দেয়ার কাজে ব্যবহৃত হত। যে দুটি মিনারে আযান দেয়া হত তার একটির নাম আন্ধার কোঠা ও অন্যটি রওশন কোঠা।

সন্ধ্যা নেমে এল। ওদের আবার রাতের গাড়ী ধরতে হবে রাত ১০টার মধ্যে। তাই আবার হোটেলে ফিরে গিয়ে গোছগাছ করে নিল। বাস আবার চলতে শুরু করেছে। এবার গন্তব্যস্থল সেই অতি পরিচিত ঢাকা শহর। বসে বসে রাস্তার দুই ধারের সৌন্দর্য্য উপভোগ করার মজাই আলাদা। হঠাৎ জয় সাহেদ আর অপূর্বকে উদ্দেশ্য করে বলল,

– জানিস, ১০০ বছর বেঁচে থাকতে হলে, ১০০ বছরের আয়ুর প্রয়োজন পড়ে না। শুধু প্রয়োজন হয় এমন একটি কীর্তির, যা দ্বারা তুই মানুষের মনে যুগ যুগ বেঁচে থাকতে পার। খান জাহান আলী (রহ:) একজন ক্ষমতাবান নেতা ছিলেন। তিনি চাইলেই নিজের ভোগের জন্য সুবিশাল প্রাসাদ তৈরি করতে পারতেন এবং বিপুল পরিমাণে সম্পদ জমা করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি এসব পার্থিব বিলাস ত্যাগ করে মানুষকে ভালোবেসেছেন এবং মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন। মানুষকে ভালোবাসতে হলে তেমন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। শুধু প্রয়োজন হয়, একটি ভালো হৃদয় ও উন্নত চরিত্রের।

জয়ের এই অভূত-পূর্ব কথা শুনে সাহেদ ও অপূর্ব সমস্বরে বলে উঠল,

– ঠিক। আমরা অনেক আনন্দিত।

প্রবন্ধ

আক্ষেপ

মোঃ মেহেদি হাসান পুনম
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৩৬৫৩

"মধ্যবিত্ত হয়ে জন্মানোর চেয়ে ফকির হয়ে জন্মানো অনেক ভাল। ফকিরদের অভিনয় করতে হয় না, কিন্তু মধ্যবিত্তদের প্রতিনিয়ত সুখী থাকার অভিনয় করে যেতে হয়"

এই প্রশ্নের জবাবে এই নোটটি লেখা .....

এই মধ্যবিত্ত জীবনটা অনেক ভালই লাগে। অনেক আশা, অনেক চাওয়া আর অল্প কিছু পাওয়া। তারপরেও সেই অল্প পাওয়াতে অনেক আনন্দ। যখন দেখি পাশের কেউ বেশ মূল্যবান কিছু খাচ্ছে তখন মনে হয় আমিও একদিন খাবো। আবার কেউ ভালো কোন মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে মনে হয় আমিও একদিন আইফোন ব্যবহার করবো। প্রতি মাসে মা যখন হাত খরচের টাকাটা দেন, তখন যদি দেখি কিছু টাকা বেশি দিচ্ছেন তাহলে এক অপরিমেয় আনন্দের অনুভূতি হয়। সেই আনন্দের মুহূর্তটা আমরা মধ্যবিত্তরা ছাড়া আর কেউ বুঝে না, বুঝবেও না। আসলেই মধ্যবিত্ত জীবনটাই সেরা। অর্থ থাকলেই জীবনের আসল আনন্দ টের পাওয়া যায় না, আর অর্থ না থাকলে তো জীবন কি বুঝতে বুঝতে জীবনের ক্রান্তিলগ্নে এসে পড়তে অর্থাৎ জীবনের ইতি টানতে হয়। মধ্যবিত্ত হয়ে স্বপ্ন দেখাটাও এক রকম আনন্দ।

আমি মধ্যবিত্ত কারণ আমি ১০টা টাকা বাঁচাতে ৫ মাইল

হাঁটতে জানি, আবার রাস্তায় এক ভিক্ষুককে দেখলে তা দিতে দ্বিধাবোধ করি না। আমি মধ্যবিত্ত কারণ আমি নিয়মিত টিফিন করি না, পারলে সেই টাকাটা জমিয়ে ছোট বোনটার জন্য কিছু কিনে নিয়ে যাই। আমি মধ্যবিত্ত কারণ বড়লোকদের মতন ২-৩ হাজার টাকার প্যান্ট আমার নেই, ৫০০/১০০০ টাকার প্যান্ট দিয়ে আমি মাসের পর মাস পার করি। আমি মধ্যবিত্ত কারণ আমি বড় লোকদের মতন খাবার অর্ধেক খেয়ে বাকিটা ছুঁড়ে ফেলে দেই না, পারলে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো অনাহারে থাকা শিশুটিকে খাবারটি দেই। সেই মুহূর্তে শিশুটির যে আনন্দ তা আমরা মধ্যবিত্তরা ছাড়া কেউ বুঝি না, কেউ বুঝবেও না। আমি মধ্যবিত্ত কারণ আমি বাবার কাছে হাত পাততে সংকোচ বোধ করি, মায়ের পিছু পিছু ঘুরে আঁচলে বাঁধা টাকাটা আত্মসাৎ করি। আমি মধ্যবিত্ত কারণ আমি বড়লোক বন্ধুদের এড়িয়ে চলি। আমি মধ্যবিত্ত কারণ আমার টাকার পাহাড় নেই; রয়েছে আত্মসম্মানবোধ। মনটা খারাপ হয়ে যায় যখন দেখি কেউ "উদাস" ভঙ্গিতে টাকা উড়াচ্ছে। কই আমি তো পারি না। আমারও তো হাত, পা, মাথা আছে। **ওদের শুধু একটা জিনিসই বেশি আছে আমার থেকে, তা হল একটি স্বাস্থ্যবান মানিব্যাগ, আরও ভাল করে বললে, একজন ধনী পিতা যে কিনা খাবারের যোগান দেয় সেই মানিব্যাগটির।** আমরা মধ্যবিত্তরা বেঁচে থাকি এই না পাওয়ার যন্ত্রণাতে। তবে আমরা বিশ্বাস করি, দিন বদলাবে।

মধ্যবিত্ত জীবনটাই আমার অহংকার কারণ আমি জীবনকে অবলোকন করেছি যা বড়লোকদের কাছে বড়ই অচেনা।

প্রবন্ধ

প্রকৃতি

ইসরাত জাহান ইমা
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৩০৮৩

প্রকৃতি সত্যিই উদার। যখন অনেক খুশি হই, আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে তো ওর কাছেই যাই। মিষ্টি রোদ আর বাতাস যখন আমাকে ছুঁয়ে যায়, বুঝি ওরাও আমার আনন্দ ভাগ করে নিয়েছে। আর যখন কষ্ট পাই, তখন এ বাতাস যেন আমায় ধাক্কা দিয়ে বলে, এই বিশাল আকাশে কষ্ট ভাগিয়ে দাও। সবুজের মধ্যে সুখ খুঁজে নাও, দেখো মনের মধ্যে আর কোনো কষ্ট কি খুঁজে পাও!!

এই এক চিলতে রোদ, বিশাল আকাশ, মিষ্টি বাতাস আর সবুজের স্বাদ নেওয়ার সুখ আমি এক জায়গাতেই পেতাম। আমার ছোট্ট দুনিয়ার এক বিশাল অংশ হলো আমার ছাদ। মানে আমাদের বাসার ছাদ। স্কুল জীবনে তেমন বন্ধু-বান্ধব ছিল না বলে আর প্রকৃতির স্বাদ গ্রহণ করার মত দ্বিতীয় কোনো উৎস ছিল না বলে, এই জায়গাতেই প্রতিদিন এসে বসতাম। যেখানে আজ অনেকদিন পরে আবার বসে আছি আর লিখছি।

লিখছি, ব্যস্ততায় কীভাবে জীবনের সেই সুন্দর একাকী কাটানোর মুহূর্তগুলোকে ভুলে গিয়েছিলাম, আর যান্ত্রিক জীবনের ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। এস এস সি শেষ করে ভর্তি হয়েছিলাম নতুন কলেজ আর নতুন কোচিং-এ। সেখানে জুটেছিল অনেক নতুন মানুষ, সে মুহূর্তে যারা আপন হয়ে গিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিলাম অবসর সময়ে একত্রে কাটানো সেই চির পরিচিত বন্ধুটিকে। যার সাথে আমার সম্পর্ক চোখের পলকে একদিন দু'দিনে গড়ে ওঠেনি। অনেক বছরের পরিচয়ে যার সাথে সম্পর্ক মজবুত হয়েছিল। আমি সেই প্রকৃতিকেই ভুলে গেলাম নতুন মানুষের খোঁজে। কিন্তু আমি জানতাম না, যাদের সাথে অল্পদিনের সম্পর্ক গাঢ় গোলাপি রঙ ধারণ করেছে, তা ঠুনকো বাতাসেই উড়ে যেতে পারে। কলেজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাথে ছিল নিত্যদিনের আড্ডা। কোচিং-এর পর ঘোরাঘুরি আর খাওয়া দাওয়া করে বাসায় ফিরতেই রাত হয়ে যেত। তারপর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বন্ধুদের সাথে শুরু হত আড্ডা, কথোপকথন। কোনো কোনো রাতে তো ঘুমানোই হত না। পরীক্ষার আগে ব্যস্ত হয়ে পড়তাম পড়ালেখায়। এতো কিছুর মধ্যে আমি তো আমার সেই বন্ধুটিকে মিসই করতাম না। কারণ, ওর কথা আমার মনেই ছিল না। এইচ এস সি পরীক্ষা

ঘনিয়ে এলো। বন্ধুদের সাথে যোগাযোগও কমে গেল। দূরত্ব বাড়তে থাকলো। পরীক্ষা শেষ হলো। রেজাল্ট পেলাম। মনের মতো হয়নি রেজাল্ট। নিঃসঙ্গ ভাবতে শুরু করলাম নিজেকে। তখন পাশে ছিল না সেই আপন মানুষগুলোর একজনও। সবাই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। ঠিক তখনি আমার মনে পড়লো সেই বন্ধুটিকে। সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চলে গেলাম। দেখলাম টবের গাছগুলো কবেই শুকিয়ে মরে গেছে। এক কোণায় বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। **ভাবলাম মানুষের সাথে দূরত্ব বেড়ে গেলে যেমন সম্পর্ক ভালো থাকে না, তেমনি কি প্রকৃতিও? নাহ! আমার ধারণা ভুল। সেই মিষ্টি বাতাস এসে আমার কানে কানে সুখ খুঁজে নেওয়া বার্তা জানালো।** প্রকৃতি আমার মতো স্বার্থপর নয়। আমাকে সে আগের মতোই গ্রহণ করে নিয়েছে। হঠাৎ দেখলাম আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। বুঝলাম বৃষ্টি হবে। দেখে মনে হলো খুব অভিমান হয়েছে ওর। যেন অভিযোগ করছে এতোদিন কেন কোনো খোঁজ নেইনি। ঝুপঝুপ বৃষ্টি আমাকে ভিজিয়ে দিলো। অভিমান ভুলে ওরা আবার আমাকে আনন্দে ভাসিয়ে দিল। হ্যাঁ, এই ছোট্ট পৃথিবীর বিশাল অংশটাই এই প্রকৃতি, আমার সুখের সঞ্চারক!!

প্রবন্ধ

বই পড়ার অভ্যাস

মাহামুদুল হাসান নাবিল
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩২২২৬

চোখের সামনে ভেসে উঠে সেই দিনগুলো। ক্লাস থ্রিতে পড়ি। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। ঢাকায় ফুফির বাসায় বেড়াতে গেলাম। ফুফাত বোন আমার থেকে এক বছরের বড় কিন্তু আমরা দুজন একই ক্লাসে পড়ি। **দেখতাম প্রত্যেক দিনই ও স্কুল থেকে এসে বারান্দায় চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে অফসেট পেপারের ছোট ছোট বই পড়ছে।** আমি খুব অনুকরণপ্রিয় ছিলাম। ওর হাতে বই দেখে আমারও পড়তে ইচ্ছা করতো। কী বই, পড়ে কেমন লাগবে না জেনেই। তখন জানতাম ওর কাছে চাইলে পাব না, তাই ও যখন স্কুলে যেত আমি তখন ওর বইগুলো পড়তাম। বেশির ভাগই ছিল ছোট গল্প আর পড়ে অনেক মজা পেতাম।

ছুটি ফুরিয়ে গেলে গ্রামে চলে যাই। একদিন হঠাৎ করেই আবিষ্কার করলাম আমার ছোট চাচ্চুর কাছে অনেক বই আছে। আমি তা আগে জানতাম না। কারণ বইগুলো বস্তা ভর্তি করে ঘরের এক কোণে রাখা ছিল। এত বই দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এত বই কেনার টাকা কোথায় পান আপনি? হাসতে হাসতে তিনি গর্বের সাথে বস্তা ভর্তি বইয়ের রহস্য বলেছিলেন।

যখন তিনি ছাত্র ছিলেন তখন এমন একটা ছেলের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল যার হাত খরচটা একটু বেশি ছিল। ওকে দিয়ে তিনি সব বই কেনাতেন। বন্ধু পড়ার পর চাচ্চু সে সব বই নিয়ে আসতেন, তারপর আর ফেরত দিতেন না। তাছাড়া এখন তিনি একজন শিক্ষক। তাঁর বই পড়ার আগ্রহ দেখে অনেক ছাত্র-ছাত্রী তাঁকে নানা ধরনের বই উপহার দেয়। তাকে বিভিন্ন কাজে প্রায়ই আমি সাহায্য করতাম। সেই সুবাদে তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন বই নিয়ে পড়তাম। সময় পেলেই বসে পড়তাম তাঁর সেই বস্তা ভর্তি বই নিয়ে। যখন ক্লাস সিক্সে উঠি, আমার হাত খরচের পরিমাণ একটু বাড়ে। প্রতি মাসে হাত খরচের সেই টাকা থেকে কিছু টাকা বাঁচিয়ে বিভিন্ন ধরনের বই কিনতাম। যখন ক্লাস সেভেনে উঠি ঠিক তখনই সারা দেশে সেকায়েপ এর উদ্যোগে সকল স্কুল-কলেজে বিনামূল্যে বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার সুযোগ দেয়া হয়। আমার বই পড়ার উৎসাহ তখন আরও দ্বিগুণ হারে বেড়ে যায়। আমি, সাকিল, শান্তনা, রোকন সবাই পাল্লা দিয়ে বই পড়তাম। কে কার থেকে বেশি বই পড়তে পারে। কারণ যে সবচেয়ে বেশি বই পড়তে পারবে তাকে সেরা পাঠক পুরস্কার দেওয়া হবে। স্কুল লেভেলের বেশির ভাগ স্যার-ম্যাডাম আমাকে চিনতেন, এর কারণ হল বই পড়া আর চাচ্চু ছিলেন স্কুলের শিক্ষক। পড়ার বইয়ের ফাঁকে ক্লাসে রবিনসন ক্রুসো, গ্রিস ও ট্রয়ের উপখ্যান রেখে পড়ার সময় কত বকা খেয়েছি। আর মার খেয়েছি আম্মুর কাছে। এত মেরেও, বই ছিঁড়েও বই পড়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি আম্মু। নোকিয়া ১২০০ মডেল মোবাইল এর নীল আলোয় কত বই পড়েছি। আম্মু আমার বই পেলেই লুকিয়ে ফেলতেন কিংবা ছিঁড়ে ফেলতেন। আম্মু বাসা থেকে বের হলে তন্ন তন্ন করে ওগুলো খুঁজতাম। একবার ছেঁড়া বইয়ের পাতা খুঁজে পেয়ে কষ্টে বুক ফেটে গিয়েছিল। ওগুলো জড়িয়ে ধরে অনেক কেঁদেছিলাম। তারপর বহু কষ্টে স্কচটেপ দিয়ে জোড়া লাগিয়ে সেই বই পড়েছিলাম। এই গেল সেবারের কথা।

এস এস সি'র পর অন্যান্য লেখকদের বই পড়া শুরু করেছি। তখন আমার অবাধ স্বাধীনতা। আমার প্রিয় লেখকদের তালিকায় প্রথমে আসে মুহম্মদ জাফর ইকবাল স্যার। এখন খেতে খেতে বই পড়ি। বই পড়তে পড়তে ঘুমাই। বই না থাকলে রাতে ঘুম আসে না। নৌকা, বাস এমনকি রিক্সায় বসেও বই পড়েছি। সত্যি বলতে হাঁটতে হাঁটতেও বই পড়েছি। বই পড়া নিয়ে আমার জীবনে ছোট ছোট ঘটনা জড়িত আছে। আম্মু মাঝে মাঝে বাসায় অনেক ভালো খাবার তৈরি করতেন। একদিন খাবার খেতে গিয়ে আম্মুকে বলি খাবারটি এত মজা হয়নি। তখন আম্মু বলেছিলেন মনোযোগ দিয়ে খাও দেখবে ঠিক ভাল লাগবে। সত্যিইতো খাবারের ভিতর ও মনোযোগ আছে। মনোযোগ দিয়ে খেতে ভাল লাগে। মনোযোগের উপরই সব কিছু নির্ভর করে।

তাই আমি এখন যে কোনো বই পড়ার সময় খুবই মনোযোগ দিয়ে পড়ি। আমার জীবনে এমন বহুরাত গেছে যে আমি সন্ধ্যায় বই পড়তে বসেছি তা পড়তে পড়তে কখন ভোর বা সকাল হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি। আসলে কোনো বই একবার পড়া শুরু করলে তা শেষ না করে আর উঠতে পারিনা। আর তা যদি হয় কোনো ডিটেকটিভ বা অ্যাডভেঞ্চার বই তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। ডিটেকটিভ বা কল্পকাহিনী নিয়ে রচিত যে কোনো বই আমার পড়তে ভাল লাগে। আমাদের স্কুল কলেজের ভাল ভাল শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশুনাটাকে শুধু মাত্র পাঠ্যবই এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। অনেকেই বলে গল্পের বই পড়ে কি লাভ এসব তোমার পরীক্ষায় আসবে না। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা শুধু পাঠ্যবই এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। এর পরিধি অনেক বৃদ্ধি করতে হবে। তা না হলে স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া যাবে না। প্রমথ চৌধুরী তার বই পড়া প্রবন্ধে বই পড়ার উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, 'পাশ করা আর স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া এক নয়।' মহানবী (স:) বলেছেন, 'জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনে সুদূর চীন পর্যন্ত যাও।' অনেক বাবা-মা সন্তানকে এসব বই পড়তে বাধা দেন। কিন্তু এটা ঠিক কী?

বই মানুষের মনের খোরাক জোগায়। বই সব সময় বন্ধু হিসেবে আমাদের পাশে থাকে। জীবনে চলার পথে সকল কাজেই তা আমাদের সাহায্য করে। যে কোনো বাসার ড্রয়িং, রিডিং কিংবা বেড রুমে বই ভর্তি বুক সেলফের চেয়ে সুন্দর দেখতে কিছুই হতে পারে না।

তাই বলি বেশি বেশি বই পড়ুন। অন্যদের বই পড়তে উৎসাহিত করুন। সবাই বই পড়া কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করুন। আর সবাইকে বই উপহার দিন।

স্মৃতি থেকে ফেলে আসা দিনগুলো

মোশারব হোসেন (রানা)
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৩৯৫১

'ফেলে আসা দিনের কথা মনে হলে আজও চোখের সামনে স্মৃতিগুলো ছবির মতো ভাসে। ভবিষ্যতের ভাবনা নিয়ে চিন্তা করতে গেলে অতীত এসে অবিরত বেপরোয়া হাসে।'

সময় থেমে থাকে না। আর জীবনও সময়ের স্রোতে ভেসে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। ফেলে আসা দিনের কথা মনে করে শৈশবের স্মৃতির পথ ধরে এগিয়ে হৃদয়ে সাড়া জাগায় আনন্দময় দিনগুলো। চোখের সামনে তুলে ধরে বিচিত্র অভিজ্ঞতার ছবি। এসব স্মৃতি নিয়েই জীবন এগিয়ে যায় জটিল সংসারের দিকে। জীবনের হাজার বেড়াজালে আবদ্ধ থেকেও যখন অতীতের দিকে তাকানো যায়, সবচেয়ে বেশি আনন্দের উৎস হয়ে উঠে ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতি।

শিক্ষা শুরুর দিনগুলো অর্থাৎ একেবারে শিশুকালের কথা মনে পড়ে না। প্রথম যখন বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু হয়েছিল তখনের কথা বেশ মনে পড়ে। শহরের বড় বড় দালানকোঠার মধ্যেই সে জীবন বড় আনন্দের হয়ে উঠেছিল। বাসায় ছবি আর ছবির বই ছিঁড়ে শিক্ষা জীবন শুরু হয়। বর্ণমালা শেখার পর একদিন বাবা মায়ের হাত ধরে বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। প্লে গ্রুপের সবচেয়ে ছোট ছাত্র ছিলাম আমি। স্কুলে জুলাই মাসে ভর্তি হই। স্কুল কি সেটা তখনও ভালোভাবে বোঝা হয়ে উঠেনি। ভাবতাম স্কুল মানে বন্ধুদের সাথে খেলা করার জায়গা। হঠাৎ একদিন বার্ষিক পরীক্ষা শেষে বুঝলাম খেলার ছলেই আমার পড়াশুনা শুরু হয়ে গেছে। তারপর একদিন দেখলাম বিদ্যালয়ে প্রবেশের আগে জীবনে যেমন খেলাধুলার সুযোগ ছিল, বিদ্যালয়ের ফাঁকে ফাঁকে সে সুযোগ আরো বেড়ে গেল। হৈ চৈ আর আনন্দ হুল্লোড় এর ভিতর দিয়ে কেটে যায় আমার দিনগুলো। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দিনগুলোতে পড়ালেখা আর খেলাধুলা যেন একসাথে মিলে মিশে

একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাই বিদ্যালয়ের প্রতি আমার আকর্ষণও বেড়ে গিয়েছিল আশাতীতভাবে। বড় বেদনার সাথে বিদায় দিতে হয়েছিল আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জীবনকে। এর মধ্যে ভর্তি হলাম আমার পাশের এলাকার একটি স্কুলে। প্রথম প্রথম মায়ের সাথেই যাতায়াত করতাম। পরে অবশ্য একাই যাতায়াত শুরু করি। এ বিদ্যালয়ে আমি শুধু মাত্র শিক্ষাই নয় আরও অনেক কিছুই শিখতে পাই। কেননা এই বিদ্যালয়ে আমি ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৫ বছর পড়াশুনা করি। আর এই বিদ্যালয়ে এসে পাই বন্ধুদের ভালোবাসা। স্নেহের মধ্য দিয়ে এবং শিক্ষকদের আদর ও যত্নের সাথে কখন যে দশম শ্রেণিতে উঠে গেলাম টেরই পেলাম না। মনে হয় সেই দিন বাবা মায়ের হাত ধরে গুটি গুটি পায়ে ব্যাগ আর নতুন বই খাতা নিয়ে স্কুলে এসেছি। আর এখনই যেন বিদায় দিতে হবে এই স্কুল জীবনকে। তবে এই বিদায় যেমন বেদনার তেমনি নতুন এক জীবন শুরু করার জন্য আনন্দের।

আজও চোখ বন্ধ করলে মনে পড়ে যায় সেই দিনগুলোর কথা। সেই দিনগুলো যেখানে ছিল বন্ধুদের সাথে হাসি, কান্না, খেলার আনন্দ এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া। আজও মনে পড়ে যায় বিদ্যালয়ের সেই শিক্ষা সফরের কথা। সেখানে সকল বন্ধুরা এবং শিক্ষকরা মিলে অনেক আনন্দ করেছিলাম। এছাড়াও বিদ্যালয়ে আরও অনেক ঘটনাই রয়েছে যা বলে শেষ করা যাবে না। কিন্তু তা মনে পড়লে আজও হৃদয় বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য এবং বন্ধুদের সাথে কথা বলার জন্য ছুটে চলে। তাই নতুন জীবনের প্রতি মুহূর্তে স্কুল জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোর মধুর স্মৃতি আনন্দের প্রধান উৎস হয়ে থাকবে। জীবনের শেষ মুহূর্তেও ভুলতে পারবো না আমি আমার বিদ্যালয়ের স্মৃতিগুলো।

স্মৃতি থেকে

রবিনের সফলতার গল্প

মোঃ খালিদ হোসেন খান
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৩৯৬২

আমাদের বাড়ির পাশেই থাকত আমার প্রতিবেশী বড় ভাই আকিব। আকিব ভাই আর আমার বড় ভাই রবিন দুজনেই ছিলো ছোট বেলার বন্ধু। তবে ছোট কালেই মাকে বলতে শুনেছি আমার ভাইকে মা শাসন করার সময় আকিব ভাইয়ের কথা বলতেন, তার সাথে সর্বদা আকিব ভাইকে মিলাতে চাইতেন। বলতেন, 'আকিব যদি ভালো রেজাল্ট করতে পারে তবে তুই কেন পারিস না।'

সময়টা ছিল ২০০৬। আমি ২য় শ্রেণির ছাত্র। আমার ভাই রবিন এস এস সি পরীক্ষা দিয়েছে। রেজাল্ট এর দিন ভাই এর মনে খুব দুঃখ। সে তার রেজাল্ট দেখতে যায়নি। আর আকিব ভাইদের বাড়িতে প্রচুর উল্লাস হচ্ছিল। ভাইয়া দুপুরে রেজাল্ট দেখে আসল। বাসায় বাবা ছিলেন না। তিনি সিঙ্গাপুরে ট্যুরে ছিলেন। মা ঘরে ছিলেন। মা ভাইয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন তার রেজাল্ট কী। ভাইয়া একটা বিষের বোতল নিয়ে ঢাকনা খুলে কেঁদে উঠলেন। মা এদিকে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলেন। ভাইয়া রুমে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা লাগিয়ে দিল। আর আমি চিৎকার চেঁচামেচি করে তোলপাড় লাগিয়ে দিলাম। ভাইয়া বলছিল, 'আমাকে মাফ করে দিও। আমি আকিবের থেকে ভালো রেজাল্ট করতে পারিনি। তুমি তো ছোট থেকে বলতে আমার এই জীবনের কোনো মূল্য নেই। আম্মু আমি আর তোমাদের কষ্ট দিতে চাই না।' এদিকে আম্মু বললেন 'বাবা, তুই যদি এভাবে নিজেকে শেষ করে দিস তবে তুই তোর জীবনের কাছে হার মানলি। বাবা তুই দরজা খোল, আমি তোকে কিছু বলব না। আর কোনো দিন এসব কথা বলব না।' মা খুব কেঁদে কেঁদে দরজা পিটাতে লাগলেন। এই কথাগুলো বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ভাইয়া দরজা খুলে বের হল। পরের দিন বাবা বাড়িতে এসেছেন। ভাইয়া জিপিএ ৪.০০ পেয়েছিল। এদিকে আকিব ভাই গোল্ডেন A+ পেয়েছে। আকিব ভাইদের বাড়ি থেকে মিষ্টি এসেছে। ভাইয়ার মন খুব খারাপ ছিল। আকিব ভাইয়ের আম্মু আমাদের বাড়িতে এলেন। আর আম্মুর সাথে কথা বলতে বলতে আকিব ভাইয়ের বড়াই করলেন। ভাইয়াকে

মহৎ চিন্তা ভাবনা যার সারা জীবনের সাথী, সে কখনো নিঃসঙ্গ বোধ করে না-জনফ্রাউন

তাচ্ছিল্য করতে তিনি বাকি রাখেননি। বলছিলেন বার বারই, 'ভাবি এ হল কপাল'। আম্মুর চোখের জল দেখে ভাইয়া বিচলিত হল। সে রাতেই ভাইয়া মামাকে ফোন দিয়ে ঢাকায় যাবার প্ল্যান করল। আর দুদিন বাদে ভাইয়া ঢাকায় চলে গেল। ভাইয়া এইচ এস সি ঢাকা থেকে দেবে। বাড়ির সবাই ভাইয়াকে হাসি খুশি বিদায় দিয়ে দিলেও ভাইয়ার মুখে কেমন এক অজানা চাওয়া ও দুঃখ দেখতে পেলাম। ভাইয়া যাবার বেলায় মাকে বলল, 'মা আমাকে নিয়ে এখন আর কেউ তোমাকে বাজে কথা বলবে না। তুমি বলবে তাদের নিয়ে।' ভাইয়ার কথা শুনে মা কেঁদে উঠলেন। ভাইয়া কলেজে ভর্তি হয়েছিল।

তারপর বাকি ঘটনা ছিল ভাইয়ার জীবনের ঘুরে দাঁড়াবার জয়গান। ভাইয়ার মুখে বলতে শুনেছি তিনি তাঁর কলেজ জীবনে দিন রাতে ১৪-১৫ ঘণ্টা পড়ত। ভাইয়াদের অনেকগুলো সেকশন ছিল। ভাইয়া প্রথমে ৭নং সেকশন, পরে ৫ নম্বর, তারপর ৩ হয়ে ১ নম্বরে যেতে পেরেছিল। ভাইয়ার এই পথ চলার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল-'ওরা পারলে আমিও পারব। ওদের মা বাবারা যদি সমাজে সম্মান পায় তো আমার মা বাবা কেন নয়।' তার মনে এক আগুন ছিল। যে আগুনে সে তার পূর্বের ইতিহাস পুড়িয়ে দিতে পেরেছিল। ভাইয়া ২০০৮ সালে বাড়িতে এসেছে। কিছু দিন বাদে তার এইচ এস সি পরীক্ষার রেজাল্ট বের হবে। মাকে এসে বলেছে, 'আমি বাড়ি থেকে যাবার সময় কী বলেছিলাম, আমাকে নিয়ে এখন আর তোমাকে কেউ বাজে কথা বলবে না। তুমি বলবে তাদের নিয়ে।' ভাইয়া এবার গোল্ডেন A+ পেয়েছে। এদিকে বাড়িতে খুশির আমেজ ছেয়ে গেল। ভাইয়া পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ ও এমবিএ করে বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই লেকচারার হিসাবে যোগদান করতে চলেছে। তার এই ছুটে চলার স্পৃহা ভাইয়া নিজের মন থেকেই যুগিয়েছে।

ভাইয়া আমাকে প্রায় বলে, প্রত্যেক মানুষের মনে রয়েছে এক ঘুমন্ত আগুন। যা সে চাইলে তীব্র থেকে তীব্রতর করতে পারে। যার জন্য শুধুই ইচ্ছা শক্তি প্রয়োজন।

গল্প আমার বন্ধু সোহেল

আবীর হাসান
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩১৯৩৭

সবার জীবনেই ছোটবেলার খেলার সাথী থাকে, আমার ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম ছিল না। সোহেল ছিল আমার বন্ধু। ক্লাস থ্রি পর্যন্ত আমরা পাশাপাশি বাসায়ই থাকতাম। আমরা একই সাথে পড়ালেখা করেছি। ছাত্র হিসাবে আমি তেমন ভাল না হলেও সোহেল ছিল অত্যন্ত মেধাবী। ক্লাসে কখনো আমি তাকে সেকেন্ড হতে দেখিনি। সর্বদাই সে ছিল ফার্স্ট বয়। আমার পড়ালেখার বাজে অবস্থা দেখে বাবা ঢাকায় একটি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। ঢাকায় আমি আমার চাচার বাসায় থেকে পড়ালেখা করতাম। ঢাকায় থাকার সময় সোহেলের কথা অনেক মনে পড়ত। তবুও ওর সাথে তেমন যোগাযোগ করতে পারতাম না, কেননা তখন যোগাযোগ মাধ্যম আজকের মত এত উন্নত ছিল না।

তখন আমি ক্লাস ফোরে পড়ি। একদিন আমার চাচা আমাকে জানান গ্রাম থেকে খবর এসেছে সোহেলের বাবা মারা গিয়েছেন, কথাটি শুনে অনেক দুঃখ লাগল কিন্তু চাচাকে একবারও মুখ ফুটে বলার সাহস পেলাম না বাড়িতে যাওয়ার কথা, কারণ আমার স্কুলে তখন পরীক্ষা চলছে। যাই হোক আমার আর বাড়িতে যাওয়া হয়ে উঠলোনা। ঢাকা শহরের স্কুল কলেজের একটাই দোষ, সহজে কোনো বন্ধই দিত না। সারা বছর জুড়ে পরীক্ষা, এক পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই আবার নতুন করে আরেক পরীক্ষার সময়সূচি দেওয়া হত। এই কারণে বাড়ি যাওয়া তো দূরের কথা, বাড়ির কথা চিন্তা করার সময়টুকু পেতাম না। চতুর্থ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার পর ভেবেছিলাম বাড়িতে যাব তবে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার কথা বলে আমাকে গ্রামে যেতে দেওয়া হল না। এইভাবে চলছে আমার দিন। এবার আমি মোটামুটি ভালভাবে পাস করে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হলাম। খবর পেলাম সোহেল আবারও ফার্স্ট হয়েছে। তখন আমি ভাবতাম ও মানুষ না রোবট! একজন মানুষের দ্বারা কীভাবে সম্ভব এতগুলো বছর ফলাফলের ধারাবাহিকতা ধরে রাখা। আবার শুরু হল আমার বাধাধরা রুটিন অনুযায়ী ক্লাস, কোচিং এবং অন্যান্য কাজ। মাঝে মাঝে সময় পেলেই ভাবতাম বাড়ির কথা, সোহেলের কথা, আমাদের ছোটবেলার

দিনগুলোর কথা। অবশেষে আমার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা এসে পড়ল, পরীক্ষার সময় আমি আমার বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে অনেকগুলো টাকা সালামি পেলাম। এই পুরো টাকা দিয়ে আমি কিনেছিলাম অনেকগুলো খেলনা, বাড়িতে গিয়ে আমি আর সোহেল একসাথে খেলব বলে।

অবশেষে পরীক্ষার পর আমার গ্রামের বাড়িতে যাত্রা। মনে মনে যে কি খুশি লাগছিল তা ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়। বাড়িতে গিয়েছি, আমার বাড়িতে আসার খবর পেয়ে বিকালে সোহেল আমার সাথে দেখা করতে এল। প্রথমেই ও আমাকে জড়িয়ে ধরল। আজ প্রায় দুই বছর পর আমাদের দেখা হল। **তারপর আমরা যখন চেয়ার টেবিলে বসে গল্প করছিলাম তখন ও আমার খাতায় মস্ত বড় একটি "প্রশ্নবোধক চিহ্ন" আঁকল আর নিচে লিখল "তোমার খাতায় এঁকে দিলাম আলপনা, আমার ছবি কইবে কথা যখন আমি থাকব না"** আসলেই বাবার মৃত্যুর পর সোহেলের জীবনটা বিশাল একটি প্রশ্নবোধক চিহ্নে পরিণত হয়েছে। বাবার পেনশনের সামান্য টাকায় তাদের পরিবার চলে। তাছাড়া পরিবারে বাবা না থাকার দুঃখ যার বাবা নেই সে ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারবে না। অনেক দিন পর কিছু দিনের জন্য আমরা দুজন মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমরা দুজন সারাদিন খেলাধুলা করতাম। কখনো দুজন লাটাই হাতে ঘুড়ি ওড়াতাম, আবার কানামাছিসহ আরও কত ধরনের খেলা খেলতাম। একপর্যায়ে আমাদের পরীক্ষার রেজাল্টের সময় ঘনিয়ে এল। আমার মনে চিন্তা রেজাল্ট কেমন হবে কিন্তু, সোহেলের কোন চিন্তাই ছিল না, কারণ সে জানত বরাবরের মত এবারও ওর রেজাল্ট ভাল হবে। অবশেষে রেজাল্ট এর দিন, রেজাল্ট প্রকাশ হলে আমি জানলাম আমি GPA-5 পেয়েছি তবে মেধা তালিকায় ও পাসের তালিকায় সোহেলের নাম খুঁজে পেলাম না। তবে কি সোহেল ফেল করল? হ্যাঁ। যে সোহেল বড় হয়ে একজন বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখত, সে কিনা সাধারণ বিজ্ঞানে ফেল! ব্যাপারটি আমি নিজেও মেনে নিতে পারছিলাম না।

সেদিন সোহেল কোনো কথা না বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে যেভাবে কান্না করেছিল, তা ভোলা সম্ভব নয়। অবশেষে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাতে সোহেলকে বাড়ি পাঠালাম। ভোরবেলা খবর এল সোহেল আর বেঁচে নেই। কাল রাতেই ও ইঁদুর মারা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। কথাটি শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কিছুতেই ব্যাপারটি মেনে নিতে পারছিলাম না। সেদিন ছিল শুক্রবার, সোহেলকে তার বাবার পাশেই কবর দেওয়া হল। বিকেলে আসরের নামাজের পরে আমি ঘরে বসে কোরআন শরীফ পড়ছিলাম। তখন ক্যামেরা হাতে কিছু লোক সোহেলদের বাড়িতে এসেছে। ব্যাপারটি জানতে পেরে আমি দৌড়ে সোহেলদের বাড়ি গেলাম এবং গিয়ে জানতে পারলাম ওনারা সাংবাদিক। আসলে সোহেল সমাপনী পরীক্ষায় জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং গতকাল স্কুলের নোটিশবোর্ডে প্রকাশিত ফলাফল ছাপানোর ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ভুল ছিল। সাংবাদিকরা সোহেলের স্বাক্ষাৎকার নিতে এসেছিল। আগামীকালের পত্রিকায় সোহেলের সুন্দর একটি ছবিসহ সাক্ষাৎকার ছাপানোর কথা ছিল তবে তা আর সম্ভব হল না। হয়তবা পত্রিকায় সোহেলের মৃত্যুর খবরই ছাপা হবে আগামীকাল। আমার যখনই সোহেলের কথা মনে পড়ে তখন সোহেলের লিখে দেওয়া সেই বড় প্রশ্নবোধক চিহ্নের দিকে তাকিয়ে থাকি, নির্বাক চিত্তে পুরোনো সেই দিনের কথাগুলো চিন্তা করি।

স্মৃতি

কেন এমন হলো

মোঃ পারভেজ দেওয়ান
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৩৫৫৬

সেদিন খুব অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম। যদিও অবাক হওয়ার বিষয়টা সুখের ছিল না। সময়টা ছিল ২০০৯ সালের ১৬ মে। মাত্রই তো মাকে দেখে এলাম সম্পূর্ণ সুস্থ। ফিরে এসে বাবাকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন বাজে রাত ৩.৫০টা। হাসপাতাল থেকে মামা ফোন করল। মা আর নেই। আমি তখন ঘুমিয়ে ছিলাম। তাই বাবা আমাকে কিছুই জানায়নি। পরদিন সকালে খবরটা আমি জানতে পেরে পুরো স্তব্ধ হয়ে গেলাম। কি করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তখন আমি ক্লাশ ফাইভের ছাত্র। মারা যাওয়ার মানে আমি বুঝতাম। মার বড় একটা ছবি ছিল। সেটা ধরে আমি কাঁদতে লাগলাম। আর ভাবলাম মার শেষ সময়ে পাশে ছিলাম না। মাকে শেষ বারের মতো দেখতেও পেলাম না। কারণ মাকে ভোরেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলায়। বাবাকে বলব নিয়ে যেতে সে পরিস্থিতিও ছিল না। কেননা বাবা ছিলেন আগে থেকে অসুস্থ। তার পর ছোট মামা এসে আমাকে ও বাবাকে নিয়ে

যায় গ্রামের বাড়ি। গিয়ে দেখি মার দাফন সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। এরপর মামিরা ও খালারা আমাকে সান্তনা দিতে লাগলেন। কিন্তু আমার মনে একটিই প্রশ্ন জেগেছিল-আগে কি ছিল আর এখন কি হলো?

কিছুদিন গ্রামে থাকার পর আবার বাসায় চলে এলাম। তারপর থেকে শুরু হলো দুর্বিষহ জীবন। সেখানে সবাই থাকলেও মা নেই। মার অনুপস্থিতি সব সময়ই অনুভব করতাম। আর ভাবতাম কেন এমন হলো। তবুও নতুন করে বাঁচতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু মা না থাকার কারণে বাবা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নিজেকে আবিষ্কার করলেন নতুন এক রোগের সাথে–আলসার। আস্তে আস্তে বাবার অবস্থা খারাপ হতে থাকে। এবার আমি ভেঙে পড়িনি।

বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। ডাক্তার বলল, সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বাবাকে হাসপাতালেই থাকতে হবে। এ কথাটা শোনার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কারণ বাবা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। বাবাকে ছাড়া আমি ঘুমাব কী করে। তবুও নিজেকে মানিয়ে নিলাম। থাকতে শুরু করলাম বড় মামার বাসায়। এ অবস্থায় নিজেকে অবহেলিত মনে হলো। আমি বুঝতে পারলাম মা বাবা ছাড়া বেঁচে থাকা কতটা কষ্টের ও যন্ত্রনাদায়ক। মামাকে প্রতিদিন বলতাম বাবাকে দেখতে যাব। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তিনি আমাকে নিয়ে যেতে পারেন নি।

একদিন তার সময় হলো। দিনটি ছিল ২০০৯ সালের ২৩ জুন। আমার কাছে মনে হচ্ছিল আজ আমার ঈদের দিন। ঈদের দিন সবাই যেমন আনন্দ করে, তেমনিভাবে অনেক দিন বিষন্ন থাকার পর বাবাকে দেখতে যাওয়াও ছিল সেইরকম আনন্দের। মামা আর আমি হাসপাতালে গেলাম তখন ঠিক দুপুর ৩.১৫টা। বাবার কাছে গেলাম। বাবাকে দেখে মনে হলো বাবা অনেক কষ্টে আছেন। তাঁর দিকে তাকাতেই বুঝলাম বাবা আমাকে ডাকছেন। আমি দৌড়ে গেলাম বাবার কাছে। বাবা নিজ থেকে আমার ডান হাতটা ধরলেন আর আমার কপালে একবার চুমো খেলেন। আমি শুধু বললাম, 'বাবা'। আর কিছু আমার মুখ থেকে বের হলো না। কারণ **এতদিন পর আমি আমার সেই মানুষটিকে দেখছি যাকে আমি ভালবাসি। বাবা আমাকে দেখছেন, আমি বাবাকে দেখছি। বাবা কি জানি বলতে চাইলেন** কিন্তু বললেন না। হঠাৎ করেই বাবার বুকে ব্যাথা শুরু হলো। বাবা আমার হাতটা শক্ত করে ধরে ছিলেন। তখন ডাক্তার আসলেন এবং বললেন, বাবা না ফেরার দেশে চলে গেছেন। কথাটা শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লাম। মা মারা যাওয়ার ঠিক ১ মাস ৭ দিন পর বাবাও চলে গেলেন আমায় ছেড়ে। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস। যাকে ছাড়া আমি ঘুমাতে পারি না সে কিনা চলে গেল ঘুমের দেশে। কেন এমন হলো?

গল্প

এবং একদিন

তাজনীন ইসলাম
শ্রেণি: বিবিএ প্রফেশনাল, রোল: ৩৬১

-"মা, এ মা, দেইখা যাও আব্বায় আইজ কত্তো বাজার পাঠাইছে। সুগন্ধি চাইল রান্তে কইছে আইজ"। রমিলা তার জমানো টাকায় কয়েকটা নারিকেল কিনেছিলো- ছেলে নাড়ু খেতে খুব পছন্দ করে। নারিকেল কোড়ানোর মধ্যেই ছেলের ডাক শুনে ছুটে এলো আর এতো বাজার দেখে নিজের উত্তেজনা চেপে মুখে বিরক্তি ভাব এনে বললো

- তোর বাপ কি জমিদারের প্যাটের থিকা আইছিলো, নাকি জমিদার বইনা গেছে? এডি পাঠাইছে ক্যান, কইছে কিছু?

– না তো। আমারে খালি বাজার হাতে দিয়া কইলো তর মারে কবি আইজকা মাংস পুলাও রান্তে।

– রান্তে কইলেই হইলো? সাথে আরো মশল্লাপত্তর দেয়া লাগবো। এডি কে দিবো? যা যা তোর বাপরে যায়া ক আমি ডাকি।

সবুজ এক গাল হেসে ছুটে দৌড় দিলো ওদের দোকানের দিকে। ওদের ছোট্ট দোকান। যে দোকানে বিক্রি হয় মৃত্যুর পরে লাশকে কবরস্থ করার যাবতীয় সামগ্রী- কাফনের কাপড়, খাটিয়া, গোলাপ জল, আগরবাতি, সুগন্ধি। ক্রেতার সমাগম খুব একটা হয় না এই দোকানে। সবুজ দিনের বেশির সময় ওর বাবার সাথে থাকে। সেখানেই নতুন স্কুলের পড়া সারে সবুজ। বাবাকেও শেখায়। দোকানের আশপাশ দিয়ে কেউ হেঁটে গেলে সবুজের বাবা গর্ব করে তার ছেলের বিদ্যে জাহির করেন।

–আব্বা, মায় তোমারে ডাকতাছে। আমি বইলাম এয়ানে, তুমি যাও। মায়ে আইজ নাড়ুও বানায় জানো! আমি আইজ

ম্যালা খামু।" হাঁপাতে হাঁপাতে একটানা বাবাকে বলেই সবুজ বসে পড়ে দোকানে। রমিলা বেগমের ওইদিকে উদ্বেগ, হয়তো ঘরে মেহমান কেউ আসবে। কতটুকু রাঁধবে, কতটুকু মশলা বাজার থেকে কিনে আনবে। এরই মধ্যে নিজের স্বামীকে দেখে ছুটে গিয়ে বললো,

–বাসায় কি কেউ আইবো? আইজ এতো কিছু ক্যান?

–আরে কেউ আইবো না। আমরাই পেট ভইরা খামু। দোকানের সামনের বাড়িত এক বাসার সবডি মানুষ মরছে। আমার দোকান থিকাই সব গেছে বুঝলা! আইজ ম্যালা কামাইছি! দামও হাকাইছি ভালোই।

–সবডি! কন কি? ক্যামনে মরলো?

–এত জাইনা কি করবি? তোরে রাস্তে কইছি রান্ধ। কাইলো ইনকাম খারাপ হইবো না মনে অয়।

–আইচ্ছা আপনে যাইয়া সবুজরে পাঠান। বাজারে যাওন লাগবো।

কথা শুনেই রওনা দিলো হেলাল। মনে মনে ভাবছে রোজ রোজ এমন বেচাকেনা হলে ভালোই হইতো। একজনের জিনিসপত্র বিক্রি করতে পারলেই চলে যাবে প্রতিদিন। কিন্তু প্রতিদিন একজন পাওয়াই যায় না। যদি তার ইনকাম কিছু বাড়ে তাহলে দোকানটাকে একটু সাজাবে। বড় করে নেমপ্লেট লাগাবে 'শেষ বিদায়'। ভাবতে ভাবতেই দোকান এসে গেলো হেলালের। ছেলেকে ডেকে বললেন,

–তর মায় ডাকে তরে যা। একদিন না পড়লে কিচ্ছু হইবো না। যা বাপ!

সবুজ আবারো একগাল হেসে দৌড়ে চলে যাচ্ছে। **হেলাল ছেলের দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে আর মনে মনে প্রার্থনা করছে দোকানে ক্রেতা যাতে বাড়ে একটু, ছেলেটাকে ভালো স্কুলে ভর্তি করতে হবে। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েই আছে।** এরই মধ্যে শুধু দেখলো একটা মাইক্রোবাস চলে গেলো সবুজের উপর দিয়ে। একটা চিৎকার! আর এক খন্ড ভিড় এখন হেলালের চোখে! আরেকটি মৃত্যু, যে মৃত্যু হেলাল চায়নি!

স্মৃতি

নানা রঙের দিনগুলো

সিফাত রাব্বানী
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৪০৫৭

সোনার খাঁচার দিনগুলো পেরিয়ে আজ আমি একটা বিশেষ বয়সে অবস্থান করছি। মাঝে মাঝে যখন পেছন দিকে তাকাই তখন জীবনের স্মৃতিগুলো সুখ হয়ে ধরা দেয় মনের রূপালী পর্দায়। সেই দিনগুলি ছিল বড় সুন্দর, বড় রঙ্গিন, বড় মধুময়। জীবন থেকে খসে যাওয়া সেই দিনগুলি আজো ভুলতে পারছি না। যখনই মনে পড়ে তখনই মন পুলকে ভরে ওঠে। স্মৃতির পাতায় বিভিন্ন স্মৃতির কথা উল্লেখ করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে বাবা-মায়ের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও তাদের সাথে কাটানো জীবনের সেই আনন্দঘন দিনগুলির কথা। বাবা-মা আমার শৈশব, কৈশোর, এমনকি আমার পুরো অস্তিত্ব জুড়ে বিরাজমান। সত্যিকথা বলতে আমার বাবা-মা ই আমার সবকিছুর মূলে। তাঁরা যে আমাকে কত ভালোবেসেছেন তা বর্ণনা করার মত ভাষা আমার নেই। বাবা শুধু জনকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমার অকৃত্রিম বন্ধু। আমার লেখাপড়া, চলাফেরা সম্পর্কে নানা উপদেশ দিতেন। কীভাবে প্রকৃত মানুষ হওয়া যাবে তাও বলতেন তিনি। বাবার এ উপদেশগুলো আমার চলার পথের পাথেয় হয়েছে। বাবার কথার পাশাপাশি মনে পড়ে আমার মায়ের কথা। দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে আমার মায়ের হাসিমাখা মুখখানি। এতটুকু বলতে পারি মা আমাকে তাঁর জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। মায়ের সমুদয় স্মৃতি আজ মনে হলে আমার পক্ষে আবেগ সামলানো কষ্টকর হয়। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমি তাদের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি, কিন্তু তারপরও আমার প্রতি তাদের যে গভীর ভালোবাসা রয়েছে তা আমি এখনও অনুভব করছি আমার হৃদয়ে। বিভিন্ন স্মৃতি থাকলেও আমার অবিস্মরণীয় স্মৃতিগুলো হল বন্ধুদের সাথে কাটানো দিনগুলি, **আজও মনে পড়ে বন্ধুদের সাথে বড়শি দিয়ে পুকুরে মাছ ধরার দিনগুলো। মনে পরে শরীয়তপুরের বৃহত্তর পদ্মা নদীর তীরে নৌকায় বসে পানিতে পা দুলিয়ে সূর্যাস্ত দেখার দৃশ্য।** আজও দোলা দিয়ে যায় সে স্মৃতিগুলি। বিদ্যালয়ের স্মৃতিগুলো ছিল আরও বেশি আনন্দদায়ক। সেখানেই আমি কাটিয়ে দিতাম দিনের অর্ধেকটা সময়। মনে পড়ে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা ও জে এস সি পরীক্ষায় স্কলারশিপ অর্থাৎ সরকারি বৃত্তি অর্জনের দিনগুলোর কথা। তাছাড়া দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হওয়া এবং বার্ষিক বিতর্ক

প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে যখন পুরস্কার গ্রহণ করছিলাম সেই দিনটির কথা মনে পড়ে। যদিও স্মৃতির পাতায় সকল স্মৃতি তুলে ধরা সম্ভব না, তারপরও ফেলে আসা দিনগুলির কথা স্মরণ করতে গিয়ে বুঝলাম অনেকটা সময় পেরিয়ে এসেছি। যখনই ভাবি, ইচ্ছে হয় দিনগুলোকে ফিরে পেতে। তাইতো কবি গুরুর মত আমারও বলতে ইচ্ছা হয়-

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না, রইল না
সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।

প্রবন্ধ ক্ষমা করে দিও বাবা

কুতুবুল আলম
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৪০১৩

এখন আমি বাসে চড়ে যাচ্ছি। রাতের প্রকৃতি নীরব, যেমনটা আমার জীবন। হঠাৎ দেখলাম আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে শুধুমাত্র বাবার জন্য। আজ আমার জীবনে সাফল্যের জন্য বাবার কৃতিত্ব মনে পড়ছে। অমানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শুধুমাত্র নিজের স্বার্থের কথা ভাবা। আমি এতদিন নিজেকে মানুষ মনে করতাম। কিন্তু আমার ধারণা সম্পূর্ণভাবে ভুল ছিল। আসলে আমি হলাম একটি অমানুষ। রঙিন কাপড় আর উচ্চ পদমর্যাদার চাকরি আমাকে মানুষ বানাতে পারেনি। আমি পড়াশোনা শেষ করেই একটি বড় প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছি। এক মাস হল চাকরির। আজ বেতন পেলাম। জীবনের প্রথম বেতন পেয়ে মহাখুশি। তাই ভাবলাম সরাসরি বাসায় না গিয়ে কাপড়ের দোকানে যাব। কারণ ছোট বেলা থেকে একটি শখ ছিল জীবনের প্রথম বেতন পেলেই বাবাকে একটি দামি শার্ট কিনে দিব। কিন্তু পথের মধ্যেই গ্রাম থেকে আমার ছোট কাকার একটি ফোন এলো। জানতে পারলাম যে আমার বাবা এ দুনিয়ায় আর নেই।

আকাশ যেন আমার মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়ল। আমি দেরি না করে বাস স্টেশনে উপস্থিত হয়ে গ্রামে যাওয়ার বাসের টিকিট কেটে যাত্রা শুরু করলাম। আজ আমার কাছে সব আছে কিন্তু বাবা নেই। আমি জানি এখন কোন কিছুর বিনিময়েও বাবাকে আর পাব না। আমার ৪ বছর বয়সে মা মারা গেছেন। মায়ের আদর কি তা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু বাবা আমাকে এতটাই ভালোবাসতেন যে কখনই মায়ের আদরের অভাব বুঝিনি। **আমিও অনেক ভালোবাসতাম তোমাকে, কিন্তু চক্ষু লজ্জার কারণে বলতে পারিনি। কারণ তোমাকে সমাজের মানুষ খুব নিঁচু চোখে দেখতো। তুমি ছিলে একটি বিদ্যালয়ের পিয়ন।** আমার বিদ্যালয়ের সহপাঠীরা সবাই তোমার পোশাক নিয়ে হাসাহাসি করতো। তাই আমি অপমানিত হতাম। সেজন্য বাবা আমিও তোমাকে অল্প পরিমাণ এড়িয়ে চলতাম। তোমাকে যখন বলতাম এই পিয়নের কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজ করো তখন তুমি আমাকে বলতে "বাজান আমি তো চুরি করে জীবিকা নির্বাহ করছি না, আমি তো শুধু আমার কর্তব্য পালন করছি।" যখন কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করতো "তোমার বাবা কি করে?" তখন আমি লজ্জাবোধ করতাম। কিন্তু কখনও ভাবিনি যে, এ পৃথিবীতে বাঁচার জন্য আমার মুখে যে অন্ন এনে দেয় সে ব্যক্তি তুমি ছিলে। সুতরাং তোমাকে অবহেলা করা উচিত হয়নি। পড়াশোনা না করলে তুমি আমাকে বকা দিতে কিন্তু কখনও ভাবিনি আমি পড়াশোনা না করলে তোমার কি ক্ষতি হতো। তোমার কোনো ক্ষতি হতো না বরং আমি পড়াশোনা না করলে এ শিক্ষিত সমাজে স্থান পেতাম না। আজ ভিক্ষুকও শুধু তার জন্যই দোয়া করে যে ব্যক্তি তাকে ভিক্ষা দেয়। আমি তোমার কি উপকারে আসবো তা কখনও ভাবোনি। শুধু তোমার সাধ্য অনুযায়ী নিঃস্বার্থভাবে আমার চাহিদা পূরণ করতে। সারা জীবন বাদামী তিনটা শার্টই তোমাকে পরিধান করতে দেখতাম। যখন বলতাম নতুন শার্ট কিনো না কেন? তুমি বলতে, 'বিদ্যালয়ে পিয়নদের বাদামী শার্ট পরে উপস্থিত হতে হয়।' তুমি মিথ্যা বলতে কারণ আমার খরচ চালাতে গিয়ে তোমার নতুন শার্ট কেনার মতো সামর্থ্য ছিল না। তাই মনে মনে ভেবেছিলাম জীবনের প্রথম বার বেতন পেলেই তোমাকে একটি দামি শার্ট কিনে দিব। কিন্তু এখন দামি শার্টের স্থানে কাফনের কাপড় কিনতে হবে। আমি গ্রামের প্রায় কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি। সামনে বাজার। আমি ভাবলাম কাফনের কাপড় কিনে বাড়িতে যাব। ড্রাইভারকে থামাতে বললাম। গাড়ি থেকে নেমে কাপড়ের দোকানে যাই। সবচেয়ে দামি কাফনের কাপড়টা দোকানদারকে দিতে বলি। আমি বিস্মিত হলাম, যখন পকেটে হাত দিয়ে দেখি পকেটের টাকা নেই। টাকা চুরি হয়ে গেছে। মনে পড়লো বাসে যে আমার পাশে বসে ছিল

তার কথা। আমার বোঝার আর বাকি ছিল না যে ঐ সহযাত্রীই পকেটমার। এবার আর নিজেকে থামাতে পারলাম না। আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলাম। আর বললাম –

"ক্ষমা করে দিও বাবা, আমি তোমার জন্য কাফনের কাপড়টুকুও কিনতে পারিনি। যদি পারতাম তাহলে এ কাফনের কাপড়ই হতো তোমাকে আমার দেয়া সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ পোশাক। আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারিনি।"

স্মৃতি

প্রেরণা

ফারিয়া জান্নাত ঝুমা
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩২৬৭৩

মানুষের জীবনে এমন কিছু অনুভূতি থাকে যার বহিঃপ্রকাশ কখনোই সম্ভব নয়। নিজের অনুভূতিগুলো হৃদয়ের মণিকোঠায় চির অম্লান করে রাখার উদ্দেশে আমার এই লেখা।

স্বপ্নটা ছিল আমার বাবার, আমাকে মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াবেন। সময়টা ছিল ২০০৬ সাল। তখনকার ছোট্ট আমার হয়ত এতটুকু বোধ হয়নি যে, কী সুবর্ণ সুযোগ পেলাম আমি। নতুন রূপে, নতুন স্কুলে যেতে পারব। এই ছিল আমার আনন্দ। স্কুলে যখন প্রথম এলাম, মনে হত স্কুলটা বুঝি সহজ, সরল কিন্তু নিয়মগুলো বড্ড কঠিন। লম্বা করিডোর দিয়ে যখন ক্লাসে ঢুকতাম, মনে হত ক্লাস রুমটা বুঝি খুব অচেনা। কিন্তু যত সময় যেতে লাগল তত ভালোভাবে আমি বুঝতে পারলাম এই স্কুল আমার কত চেনা। যত বড় হতে লাগলাম, তত বিরক্তিকর হয়ে উঠতে লাগল এই স্কুলের নিয়ম কানুন। খুব সকালে এ্যাসেম্বলি। একটু late হলে late line এ দাঁড়ানো, লিলি মিস এর বকা খেয়ে যখন একঘেয়ে হয়ে উঠতাম, তখন বন্ধুরা মিলে ভাবতাম কেন এই স্কুলে ভর্তি হলাম? কিন্তু, এখন যদি কেউ আমার স্কুলের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরে, খুবই গায়ে লাগে। কখনো ভাবিনি, স্কুল নিয়ে কেউ কিছু বললে এতটা খারাপ লাগবে। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, আমার স্কুল আমার কাছে কতটা প্রিয়।

ক্লাসে যে শিক্ষকদের এক সময় খুব অচেনা লাগত, সেই শিক্ষকরাই ধীরে ধীরে আমার খুব প্রিয় হয়ে উঠতে লাগলেন। আগে ভাবতাম "অমুক শিক্ষকের ক্লাস কখনও মিস করবো না, তমুক শিক্ষককে ভালো লাগে না"। বিদায় বেলায় বুঝতে পেরেছিলাম সব শিক্ষকদেরই খুব মিস করব। অনেক সময় কোনো শিক্ষক রেগে গিয়ে বলতেন "আমরা কবে চলে যাব? তখন স্কুলটা শান্ত হবে", খুব অভিমান হত তখন। ভাবতাম, যে স্কুলকে এতটা ভালবাসি সে-ই চায় না আমরা থাকি। কিন্তু, আমি জানি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এখন আমরা না থাকলেও নতুনদের ভিড়ে শিক্ষকদের মনে আমাদের মুখগুলো কখনো না কখনো নিশ্চয় ভেসে ওঠে। এত সহজে এই স্কুল আমাদের ভুলে যাবে? কখনোই না।

নিজের অজান্তেই একের পর এক ক্লাস টপকিয়ে দশটি বছর কাটিয়েছি এই প্রাঙ্গণে। **সৃষ্টিকর্তা খুব যত্ন নিয়ে আমার জন্য দশটি সুন্দর স্বপ্ন তৈরি করে রেখেছিলেন। এক এক করে স্বপ্ন দেখা শেষ!** সত্যিই স্বপ্নের মতো দশটি বছর কাটিয়েছি আমি। তাই বিদায় বেলায় যখন বিদায় বাঁশি বাজছিলো, তখন আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে আমি কী হারাচ্ছি। নতুনদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে সত্যি সত্যি আমরা চলে এসেছি। কিন্তু, আমার স্কুল থেকে আমি যা পেয়েছি তা আমার সারা জীবনের সঞ্চয়। জানি না কেমন হবে আমার পরবর্তী স্বপ্নগুলো। এবার আমাকে নতুন কোন পথে এগুতে হবে। আর সেই অচেনা পথে তুমি সর্বদা থাকবে আমার সাহস হয়ে, আমার স্মৃতি হয়ে এবং আমার প্রেরণা হয়ে। কারণ, এখন আমি স্বপ্ন পথের যাত্রী। তাই নির্দ্বিধায় বলতে চাই-

"মনিপুর
তোমায় অনেক ভালবাসি।"

ভ্রমণ

নয়নাভিরাম সিলেট

নাঈম খন্দকার
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৩৫৫২

আজ থেকে প্রায় ৫ মাস আগের কথা। সবেমাত্র এস এস সি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আমাদের পরিবার ঠিক করল দূরে কোথাও বেড়াতে যাবে। সাথে যাবে বড় খালা ও ছোট মামার পরিবার।

আমরা সবাই আনন্দে নেচে উঠলাম। তারপর থেকে অপেক্ষা যেন শেষ হয় না কবে-আসবে সেই দিন। অবশেষে অপেক্ষার প্রহর শেষে সেই কাঙ্খিত দিনটি এলো। সেদিন ছিলো ১লা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন।

আমরা সবাই ও মামার পরিবার চলে গেলাম একদিন আগে বড় খালার বাড়িতে। বড় খালার বাড়ি হবিগঞ্জে। আমরা খালার বাড়িতে পৌঁছানোর পর রাতটা সেখানেই কাঁটালাম।

খালাতো ভাই সোহেল, জুয়েল, রাসেল ও খালাতো বোন নিপাসহ আমরা সবাই পরিকল্পনা করলাম সিলেট গিয়ে কিভাবে কাটাব।

একেকজনের মাথা থেকে বেরিয়ে আসে একেক ধরনের বুদ্ধি। এই চিন্তা ভাবনা করতে করতে রাত পোহাল।

অবশেষে সবাই তৈরি হয়ে হৈ হুল্লোড় করতে করতে ছুটে গেলাম স্টেশনের দিকে।

এখন অপেক্ষা কবে আসবে সেই স্বপ্নের ট্রেন। যে ট্রেন দিয়ে পাড়ি জমাব স্বপ্নরাজ্যে। দু চোখ ভরে দেখব নয়ানাভিরাম সিলেটকে।

অবশেষে সেই স্বপ্নরাজ্যের ট্রেন ভেঁপু বাজাতে বাজাতে এসে ঢুকলো স্টেশনে।

ট্রেনটি ছিল পাহাড়ীকা এক্সপ্রেস। ট্রেন দেখে খুশিতে চিৎকার দিয়ে উঠলাম আমি। আর আমার ছোট ভাই বাঁশির আওয়াজে ভয় পেয়ে গেল।

আমরা সবাই একে একে উঠে বসলাম ট্রেনে। গার্ড বাঁশি বাজিয়েছে এবং পতাকা নাড়ছে। ট্রেন ছেড়ে দিল।

আমরা সবাই জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্যপট দেখতে দেখতে এগোচ্ছি সামনে। ট্রেনের ভেতর হকারদের চেঁচামেচি, কাওয়ালি গান, মুর্শিদি গান সবকিছু আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে। এ যেন অন্যরকম এক অভিজ্ঞতা।

ট্রেন তার নিজস্ব গতিতে ভেঁপু বাজিয়ে তার মত করে সামনে এগোচ্ছে। আর আমরা বাইরের চা-বাগান, পাহাড়, উঁচু-নিঁচু টিলা, আনারস, লেবু গাছ দেখতে দেখতে বিস্মিত।

বিধাতা কত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন এই লীলাভূমি। আমি মা-কে ট্রেনে বিরক্ত করে ফেলছি, 'মা, কখন আসবে সিলেট স্টেশন?'

মা বলেন 'আসবে বাবা, আসবে, আর একটু।' এইভাবে আমরা এসে গেলাম সিলেট স্টেশনে। সিলেট স্টেশন কত না সুন্দর! দু-চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না।

বেলা বাজে ১ টা। এখন আমরা দুপুরের খাবার খাব। খাওয়ার পরে রওনা দিব সেই স্বপ্নরাজ্যে। অবশেষে রওনা দিলাম সেই স্বপ্নময় গন্তব্যে।

তামাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার। কেউ যদি দু'চোখে না দেখে তাহলে বিশ্বাস করতে পারবে না। তামাবিল ভারতের আসাম রাজ্যের সীমান্তবর্তী।

সিলেটের তামাবিলের পাহাড় আর ভারতের পাহাড় যেন একসাথে মিশেছে। আমরা সবাই যার যার মত করে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়লাম।

আমি, আমার খালাতো ভাই বোন একদিকে, আম্মু, মামানি, বড় খালা খালু একদিকে, সবাই যেন হারিয়ে গেছি প্রকৃতির মাঝে। ইচ্ছেমত ছবি তুললাম সবাই।

ঐ দিনটা পহেলা বৈশাখ হওয়াতে আনন্দ হয়েছে অনেক বেশি। ছবি তোলার পরে দেখলাম বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের চেকপোষ্ট।

এই দুই দেশের স্থলসীমান্ত দিয়ে দুই দেশের পণ্য আনা নেওয়া করা হয়। কী সুন্দর ছিল ঐ পরিবেশটা! বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি কত সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করছে তা আমাদের অবাক করে।

এই সবকিছু দেখতে দেখতে আমরা একটু সামনে এগুলাম, যেয়ে দেখি উঁচু এক পাহাড়। হুড়োহুড়ি করে সবাই উঠলাম পাহাড়ে। চেয়ে দেখি কি সুন্দর চা বাগান! চা বাগানের মাঝ থেকে সুন্দর, সুললীত আওয়াজে ভেসে আসছে গানের সুর।

আমরা অবাক হলাম। আর একটু সামনে গিয়ে দেখি কতগুলো যুবক সাউন্ড বক্স বাজিয়ে গান শুনছে এবং নাচছে। কী সুন্দর না লাগছে তখনকার পরিবেশ! আমরা তাদের নাচ দেখলাম, অন্যরা হয়তো ভুলে গেছে কিন্তু আমি এখনো ঐ নাচ ভুলতে পারিনি।

আজও আমার চোখের পর্দায় ভেসে আছে ঐ দিনের দৃশ্যটি।

তারপর সন্ধ্যা গড়িয়ে এল। এখন যাওয়ার পালা। আমাদের মন যেতে চাইছে না তবুও যেতে হবে সময়ের প্রয়োজনে।

সবাই যদিও রাজি হয়েছে এবং যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে কিন্তু আমি বায়না ধরে বসলাম। কিছুতেই আমি যাব না। তারপরে আমার মামানি আমাকে নানা ধরনের মন ভুলানো কথা বলেন। অবশেষে আমি রাজি হই।

তারপর সবাই একসাথে গাড়িতে চেপে বসি এবং ছুটে চলি আমাদের গন্তব্যে। পাহাড়ী রাস্তার মাঝে চলার মজাই আলাদা। এভাবেই নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দিনটি অতিবাহিত হল। যা আজও আমার জীবনের একটি অংশ জুড়ে আছে।

গল্প একটি নিরব আর্তনাদ

খন্দকার আবিদুর রহমান
শ্রেণি: একাদশ, রোল : ৩৩৪৬৪

রিমি তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। বাংলা সাহিত্যে অনার্স করছে। ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের বুথ থেকে টাকা তুলেই বাবাকে ফোন করত। বাবা হেসে বলতো, বুঝেছি মা টাকাটা উঠিয়েছ এই মাত্র, তাই না?

মেয়েটি বড্ড রাগ করে বাবাকে বলতো, 'কী ভাবো বাবা তুমি আমাকে? আমি কি শুধু টাকার জন্যই তোমাকে ফোন দিই?'

এই মাত্র টাকা তুলে ফোনটা হাতে নিয়েছে রিমি। এখানে তার পুরো মাসের খরচের চেয়ে একটু বেশিই আছে। বাড়ি থেকে অনেক দূরে অন্য শহরে থাকে বলে একটু বেশি করে টাকা পাঠায় বাবা।

কন্ট্যাক্ট লিস্টে 'এ' দিয়ে সেভ করা আব্বু লেখা দেখতে পেয়েও রিমি ডায়াল করতে পারে না। চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে আসে। বাবার নম্বরে আর কল দেয় না রিমি। মাকে ফোনে জানিয়ে দেয় টাকা পাবার কথা। চোখ মুছতে মুছতে হলের দিকে এগিয়ে যায় রিমি। বাবাকে আর কল করা হয় না। হবেও না আর কখনো কারণ তার বাবা যেখানে আছেন, সেখানে এখনো কোন অপারেটর তাদের নেটওয়ার্ক দিতে পারেনি, পারবেও না কখনো। তবুও রিমি নাম্বারটি মোবাইলে সেভ করে রেখে দিয়েছে। কিছু নাম্বার যে মুছে ফেলা যায় না...

হুট করে ভার্সিটি বন্ধ হয়ে গেল। হলে থেকে কী লাভ। তার চেয়ে বাড়ি থেকে ঘুরে আসা যাক।

ব্যাগ গুছিয়ে রেডি হয়ে গেছে রিমি। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে সেই কত আগে, কিন্তু এখন পর্যন্ত একবারও বাবা ফোন দিল না। ফোনের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছুড়ে দেয় রিমি। এই দীর্ঘশ্বাসটি ঠিকই পৌঁছে যাবে, বাবাও ঠিক দোয়া করে দেবে সেখান থেকে। এই দোয়া আর আশীর্বাদগুলো পাঠাতে কোন নেটওয়ার্কের প্রয়োজন হয় না, এগুলো ঠিকঠাকভাবেই পৌঁছে যায় প্রাপকের কাছে।

তার ভাবতে ইচ্ছে করছে বাবা হয়তো ব্যস্ততার কারণে ফোন করতে পারে নি। কিন্তু স্টেশনে এসে ঠিকই চমকে দেবে রিমিকে। রিমি গাল ফুলিয়ে থাকবে তখন, বাবার সাথে কথা বলবে না। যাত্রা পথে একবারও ফোন না দেয়ার অপরাধে। বাবা বকবক করে যাবে পাশ থেকে, কিন্তু রিমির তো সেই ট্রেনে উঠা থেকেই রাগ।

-আইসক্রিম নিবো মা?

-না

-এতো ব্যস্ত ছিলাম যে তোকে ফোন দিতে পারিনি। আরেকটু আগে এলে তো নিতেও আসতে পারতাম না।

-না আসলেই পারতে .....।

গাড়ি থামতেই রিমি কল্পনার জগত থেকে বেরিয়ে আসে। স্টেশনের পাশে ছোট ভাই বাদল দাঁড়িয়ে আছে, সে এসেছে তাকে নিয়ে যেতে। ঠিক এখানটায় দাঁড়িয়ে থাকতো তার বাবা। বাদল এগিয়ে এসে ব্যাগটা হাতে নেয়।

-কেমন আছো আপু? এতো দেরি হলো যে?

রিমি হুঁ হা করে এদিক ওদিক তাকায়। এই বুঝি বাবা এসে বলবে, মা আমার দেরি হবে জানতাম। তাই বাদলকে আগে থেকে রেখে গিয়েছিলাম। কোন সমস্যা হয়নি তো? পথে খেয়েছিস তো?

না, কেউ আসে না।

দুই ভাইবোন ট্যাক্সিতে উঠে রওনা দেয় বাসার দিকে। গাড়িতে দুজনই চুপচাপ। বাসায় পৌঁছেই বাবার রুমের দিকে যায় রিমি। না, রুমেও নেই বাবা। থাকবেনই বা কীভাবে? তার বাবা যে শহরে গেছে, সে শহরের রাস্তাগুলো যে ওয়ান ওয়ে। সে দেশে শুধু যাওয়া যায়, ফিরে আসা যায় না। কোন ব্যবস্থাও নেই ফিরে আসার।

একদম নেই।

রিমি বাবার বিছানায় বসে পড়ে। রিমি চোখের পানি ফেলতে ফেলতে চিৎকার করে বলছে, 'বাবা, তুমি ফিরে এসো।

একটি বার তোমাকে দেখি। সেই কত দিন আগে তোমার সাথে দেখা হয়েছিল। তোমার উপর আর কোন অভিমান নেই, ফিরে এসো বাবা ফিরে এসো ...।'

রিমির আর্তনাদে সবার চোখে পানি এসে যায়। রিমি তার মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে।

ছোট গল্প

হাওয়া

লিমা ইসলাম
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩২৭২৭

বছর দশেক বয়সের স্মৃতি এমনিতেই কিছুটা ঝাপসা, সব ভাল মনে পড়ে না। তার ওপর তা যদি হয় পাঁচ বছর আগেরকার কথা। মনে আছে, সে সময় হাওয়া বদল করতে যাওয়ার একটা কথা চলছিল।

ওই উদ্দেশ্যেই আমরা সবাই মিলে সেবার বেরিয়েছিলাম। উত্তরবঙ্গের ঠিক কোন জায়গায় তা অবশ্য মনে নেই। একটা মনের মতো বাড়ি পেয়ে গিয়ে বাবা তো মহাখুশি। ভাড়াটাও বলতে গেলে বেশ সস্তা। ধারে কাছে কোনো বাড়ি নেই। হাওয়া বদলের পক্ষে এরকম নিরিবিলি জায়গাই নাকি ভাল। স্থির হলো মাস খানেক আমরা সেখানেই থাকবো। মাঝে-মধ্যে আশেপাশে দূরে-কাছে যা দেখার আছে দেখে আসবো। তারপর আবার ঘরে ফিরে শুয়ে-বসে বিশ্রাম। এই বাড়ির কেয়ারটেকার সব ব্যবস্থা করে দেবেন, গাড়ি ডেকে এনে দেওয়া থেকে শুরু করে দোকান-বাজার সব। সে হিসেবে এত কম ভাড়া, ভাবাই যায় না!

যেদিন যেমন খুশি মা রাঁধবে, আমরা খাবো। গল্প করবো, ঘুরবো। লুডো, ক্যারাম আমরা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেই সঙ্গে দরকারি ওষুধপত্র, গল্পের বই, এমনি সব টুকিটাকি। সেদিন বেরোবার কথা, কেয়ারটেকার গাড়ি ডেকে এনেছেন। কিন্তু রাত থেকেই আমার শরীর ভাল ছিল না, সকালে দেখা গেল গা গরম হয়েছে। বাবা বললেন, 'গাড়ি যখন এসেই গেছে আমরা বরং একটু ঘুরে আসি। বেশি দূরে যাব না, দুপুরের আগেই ফিরে আসবো। খুকী তোর গিয়ে কাজ নেই, দরজা বন্ধ করে বাড়িতেই থাক। কেয়ারটেকার এসে দেখে যাবে। আমি বলে যাচ্ছি।'

আমি রাজি হলাম। মা-বাবার সঙ্গে বোন দুইটি চলে যাবার পর আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম। খানিকক্ষণ গল্পের বই নাড়াচাড়া করলাম, মন বসল না। তারপর খাবার আর ওষুধ খেয়ে নিলাম। একা আছি। কেমন ছমছমে নির্জনতা, গা ভারী হয়ে আসে।

একটু পরেই ঠুক ঠুক আওয়াজ হলো দরজায়। স্বস্তি পেলাম। যাক, কেয়ারটেকারের সঙ্গে কথা বলা যাবে। কিন্তু জানালা দিয়ে উঁকি মেরে অবাক হলাম। না উনি আসেন নি। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আমারই বয়সী একটা ছেলে। চোখাচোখি হতেই ইশারায় ডাকল। হাতে একমুঠো মার্বেল, আমার সঙ্গে খেলতে চায়।

গুলি খেলতে আমি ভালোই বাসি কিন্তু বাবা পছন্দ করেন না। আমি আবার ছেলেটার দিকে তাকালাম। বুঝলাম ছেলেটা বোবা। মুখ-চোখের ভঙ্গি করছে কিন্তু শব্দ নেই। কষ্ট হলো ওর জন্যে। আহারে! এই বয়সেই-

বাইরে বেরোতেই ছেলেটা এক অদ্ভুত কাজ করল। আমাকে পাশ কাটিয়ে পাঁই পাঁই ছুটে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আমিও ছুটলাম ওকে ধরবার জন্যে। কিন্তু ঘরগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ওকে দেখতে পেলাম না। আশ্চর্য! রান্নাঘর, বাথরুম, খাটের নিচে, সোফার পিছনে কোথাও নেই। এমন সময় সাইকেলের ঘন্টি। সদরের দিকে আসতেই কেয়ারটেকার মুখোমুখি। দরজা খোলা দেখে অবাক হয়ে উনি ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

কেয়ারটেকার বললেন,'কী ব্যাপার! দরজা খুলে রাখতে নিষেধ করা হয়েছিল যে?
–ওকে দেখে দরজা খুলেছিলাম।
–কে? কার কথা বলছো?
–একটা ছেলে, আমার বয়সী।
–ছেলে! এখানে ছেলে আসবে কোত্থেকে?
কোথায় সে?
–ভেতরে ঢুকেছে।
–তো, ডাকো তাকে, দেখি কেমন ছেলে!
–ছিল, কিন্তু এখন নেই।
–তাজ্জব! না না, তুমি ভুল দেখেছ। জ্বরের ঘোরে অমন একটু-আধটু ভুল দেখে কেউ কেউ।

–ঘোর কি বলেছেন! সামান্য গা গরম হয়েছিল সকালে,

এখন বোধ হয় তাও নেই। আমি বলছি আপনাকে- মোটেই ভুল দেখিনি।

–বেশ, ভুল দেখনি-ঠিক আছে! কী নাম জিজ্ঞেস করেছিলে?
–না
–করা উচিত ছিল।
–কি করে করবো?
–মানে?
–ছেলেটা যে বোবা।

–অ্যাঁ!' আঁতকে উঠলেন কেয়ারটেকার, 'বো-বা!'
–আপনি চেনেন এমন কাউকে?

ওঁর মুখ কেমন ফ্যাকাশে দেখাল, 'না না! আমি কী করে চিনব! এরকম কেউ নেই এ অঞ্চলে।' বুঝলাম উনি মিথ্যা বলেছেন। আসলে কিছু চেপে যাচ্ছেন। ভয়ও পেয়েছেন।
–আপনি সত্যি বলছেন?
–মিথ্যা কেন বলবো! যাকগে, আমি চলি। দরজা বন্ধ করে দাও। আর হ্যাঁ, এসব কথা কাউকে বলার দরকার নেই।

আমি কিছু বলার আগেই সাইকেল চেপে উনি সরে গেলেন। দরজা বন্ধ করতে করতে মনে হলো, বোবা ছেলেটাকে উনি নিশ্চয় চেনেন। ছেলেটা হয়তো এ বাড়িতেই অপঘাতে মারা গিয়েছিল। তাই চেপে যেতে চাইছেন কারণ ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে এ বাড়ির বদনাম হয়ে যাবে। কেউ আর ভাড়া নিতে চাইবে না। বিনা পয়সায় দিলেও না!

দরজা বন্ধ করে পিছনে ফিরতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। একমুঠো মার্বেল কেউ যেন আমার সামনে সাজিয়ে রেখেছে। অথচ একটু আগেও এখানে কিছু ছিল না। ব্যস, আর কিছু মনে নেই। নিশ্চয় মেঝের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম।

ডাকাডাকিতে ধরমড় করে উঠে বসে দেখি বাবা-মা দুজনেই আমার মুখের ওপর ঝুঁকে দাড়িয়ে আছেন। চমকে গেলাম। দরজা খুলে দিল কে? আমি নিজ হাতে বন্ধ করেছিলাম, স্পষ্ট মনে আছে!

গল্প

আকাশ ফেলেছে ছায়া

নাফিস ইসলাম তাশিক
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৩৯৪৪

বিরক্তিকর! পুরো জিনিসটাই বিরক্তিকর! সকাল সাড়ে ছ'টায় ঘুম থেকে ওঠো, নিজের ওপর অত্যাচার চালাও নাস্তার টেবিলে, তারপর ঘুম ঘুম চোখে রেডি হয়ে সাড়ে সাতটায় স্কুলে দাও দৌড়! কোন মানে হয়? আহা! এমন যদি হতো যে কখনো সকালে ওঠে স্কুলে যেতে হবে না। কিন্তু মানুষ যা চায়, তা সে পায় না; আর যা চায় না, তাই খুব সুন্দর করে পেয়ে যায়। এলার্ম ঘড়িটার উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে করতেই এমনই এক দার্শনিক তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে ফেলল অপু।

ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র অপু। পড়াশোনাতে বেশ ভালো। খেলাধুলাও পারে মোটামুটি। এগুলো নিয়েই তার জীবনটা সুন্দর করে পার হয়ে যেত যদি না স্কুল নামক এই ভয়াবহ জিনিসটা তার পিছনে লাগত। নাস্তার টেবিলে বসতে বসতেই 'চিরসত্য ঘটনা' (ইংরেজিতে যা ইউনিভার্সাল ট্রুথ) হিসেবে মা'র ধমক খুব সুন্দর করে খেল অপু ''এই বাঁদর, উঠতে এতক্ষণ লাগে নাকি? মনে হচ্ছে স্কুল তোর জন্য অপেক্ষা করে আছে যে কখন নবাব সিরাজউদ্দৌলা অপু এসে পৌঁছাবেন আর তারপর স্কুল শুরু হবে! চিরদিনই গর্দভ থেকে যাবি নাকি তুই? তোর বন্ধু-বান্ধবেরা বড় হয়ে তোকে দেখে বলবে, দেখ্ দেখ্ গাধা অপু আসছে!'' অপুর এই ধমক খাওয়া দেখে অমি আপু খিল খিল করে হেসে ওঠে। একদিন এই দুষ্টু আপুটার মাথা ফাটাতে হবে। কলেজে পড়েও যদি হুঁশ-জ্ঞান বলে কিছু থাকে। আপু বলল,''আম্মু, তুমি অপুকে শুধু শুধু বকাবকি করছ। ও যদি এতদিনে ঠিক হতো, তহলে আজকে সূর্য পশ্চিম দিকে উঠে যেতো। হি হি হি!'' আপুটা যে কি হয়েছে!

শুধু আব্বুই অন্য রকম। অপুকে খুব ভালোবাসেন। কক্ষনো অপু তাঁর কাছ থেকে কড়া কথা শোনেনি। অপুর আব্বু বললেন,'আরে তোমরা তো অপুকে শান্তিমতো খেতেও দেবে না, অপু চটপট খেয়ে ফেল। তোর জন্য একটা গুড নিউজ আছে।'' অপু মনে মনে নেচে উঠল। তখনই বলল,''কি নিউজ, আব্বু? এখনই কিন্তু বলতে হবে।'' অপুর আব্বু বললেন,'' আচ্ছা। কাল আমরা সবাই মিলে

আমরা মানুষের সম্পর্কে কী জানতে চাই, সেটি প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো, মানুষ তাদের সম্পর্কে কতটুকু জানাতে-চায়-মার্ক জাকারবার্গ

আমার ফুফুর বাড়ি জয়পুরহাটের কানপুরে বেড়াতে যাচ্ছি। গ্রামে গিয়ে তোরা খুবই মজা পাবি।'' অমি আপু বলল,''তাহলে তো খুবই মজা হবে। গ্রাম আমার ভালো লাগে!'' অপুকে তেমন খুশি মনে হলো না। শেষ পর্যন্ত গ্রামে? তার চেয়ে ফ্যান্টাসি কিংডম কিংবা স্বপ্নপুরী টাইপের কিছু হলে তাহলে না মজা হতো। অপুর বিমর্ষ ভাব দেখে অপুর আব্বু বললেন,''কিরে অপু, যাবি না?'' অপুর আম্মু বললেন,'' যাবে না মানে! বাংলাদেশের ছেলে জন্মের পর গ্রামে কখনো যায়নি, গ্রাম কি জানে না, আর গ্রামে যাবে না মানে? একশবার যাবে।'' অপু আমতা আমতা করে বলল,'' না আব্বু, ইয়ে মানে হয়েছে কি, গ্রাম বাদ দিয়ে অন্য কোথাও গেলে হতো না? ফ্যান্টাসি টাইপের....?'' অমি আপু বলল,''আমি কি শুধু শুধু অপুকে গাধা নাম্বার ওয়ান বলি! গ্রামে না গিয়ে উনি যাবেন ফ্যান্টাসি কিংডমে।'' অপুর আব্বু বললেন,''অপু, তুই শুধু একবার গ্রামে চল। দেখবি কত মজা হবে! ফ্যান্টাসির চেয়েও হাজার গুণ মজা হবে ওখানে গেলে। একবার গেলে আর দশদিনেও আসতে চাইবি না।'' অপু আর কিছু কী বলবে ভেবে না পেয়ে শুকনো মুখে বলল,'আচ্ছা'।

স্কুল ছুটির পর বাসায় এসে হাত-মুখ ধুয়ে ভাত খেতে বসল অপু। আপু কলেজে, আব্বুও অফিস থেকে এখনো ফেরেননি। অপু আম্মুকে বলল,''আম্মু গ্রামে কী আছে?'' অপুর আম্মু বলল,''উহু, এখন কিচ্ছু বলব না। তুই নিজে গিয়ে দেখবি কী আছে। তবে এতটুকু বলব, গ্রামে গেলে তোর মনে হবে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর জায়গা হচ্ছে বাংলাদেশের গ্রাম। রাতে সবাই একসাথে খেয়ে-দেয়ে প্ল্যান পাকা করে ফেলল। তারা সকাল পাঁচটায় বাসা থেকে রওনা হয়ে ট্রেনে করে সেখানে যাবে। বারোটার মধ্যেই পৌঁছানোর কথা। তারা থাকবে দুইদিন। কারণ অপুর স্কুলে মিস দেয়া চলবে না।

সকাল বেলা সবাই খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করে ঝটপট তৈরি হয়ে পাঁচটার মধ্যে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। সাড়ে পাঁচটায় ট্রেন। ট্রেন ছাড়ার সময় অপুর মনে হলো- সত্যিই কি গ্রামে গিয়ে মজা হবে? গ্রামে এমন কী আছে? এরকম শত প্রশ্ন আর ট্রেনের দুলুনির মাঝেই ঘুমিয়ে পড়ল অপু। তার ঘুম ভাঙ্গল সকাল নয়টায়। আম্মু বলছেন, 'অপু বাবা নাস্তা খেয়ে নে তো। সকাল হয়ে গেছে।' আরে তাই তো আপুটা বিজ্ঞের মতো চশমা পরে কবিতার বই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছে। কি যে আছে ঐ বইয়ে কে জানে!

দেখতে দেখতে পৌনে বারোটায় ট্রেন এসে থামল। স্টেশনে একজন লোককে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই আব্বু হুড়মুড় করে তার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, 'আরে রশিদ, কত দিন পর তোর সাথে দেখা। তোর মোবাইল না থাকলে তো ভালই হতো। তোকে খবর না দিয়ে হুট করে ফুফুকে দেখতে চলে আসতাম। ফুফুর শরীর কেমন?' রশিদ চাচু বলল, "আম্মার আর শরীর! হাঁটা চলা সবই করতে পারেন। আর দুনিয়ার সমস্ত কাজ নিজে করবেনই। মানা শুনবেনই না। ... আরে এটা তোর ছেলে নাকি? এত বড় হয়ে গেছে? নাম কি তোমার?' অপু নাম বলল। তখন রশিদ চাচু বললেন, "তোমি. অপু ওয়েল কাম টু কানুপুর। চল বাড়িতে যাবে।"

কিছুদূর যেতেই হকচকিয়ে গেল অপু। ওমা কি সুন্দর গ্রাম। চারদিক যেন ছবির মত গোছানো সুন্দর। ব্যস্ত লোকজন কৌতুহল ভরে তাদের দেখছে। ছোট বাচ্চারা খেলাধুলা করছে। কিছুদূর এগুতেই বাড়িতে এসে পড়ল। অপু ভিতরে ঢুকলো। ইস! কি সুন্দর বাড়ি-ঘর। গ্রামে এসে যে খুবই মজা হবে সেটা টের পেতে শুরু করেছে অপু। দুপুরে তারা একসাথে খেতে বসল। নানা গল্পে ইয়া বড় পাঙ্গাস মাছের পেটি আর মাসকলাইয়ের ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে ফেলল। রান্নাটাও অসাধারণ। অনেকদিন অপু এত সুন্দর করে ভরপেট খায় নি।

সেদিন সন্ধ্যা বেলা অপূর্ব গা ছমছম পরিবেশ নেমে এলো চারিদিকে। পেছনেই বাঁশবন। সেখানে বাঁশবনের পাতায় ঝিরঝির শব্দে সুর তুলেছে অশরীরি বাতাস, মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে ঝিঁ ঝিঁ পোকা। ভাগ্যিস এদিকে কারেন্ট আছে, না হলে তো ভয়েই ফিট হয়ে যেত অপু। রাতে খেয়ে দেয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল তারা সবাই। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে কিছুক্ষণ সময় লাগল অপুর সে কোথায় আছে তা বুঝতে। সেটা বুঝতেই পেরে তড়াক করে উঠে বসল সে। চারিদিকে হাজারো পাখির ডাক। সকাল সাড়ে নয়টা, তবুও যেন পাখির ডাক শেষ হতে চায় না।

সকালে নাস্তা করে তাদের রশিদ চাচু সবাইকে গ্রামের আশপাশ দেখাতে নিয়ে গেল। গ্রামের অপূর্ব সব মাঠ। সেখানে মাঠে কাজ করছে কৃষকেরা, ছোট ছোট ছেলেরা লাটিম খেলছে, এরকম হাজারো দৃশ্য। তবে অপু যেটা দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাড়িয়ে রইল সেটা হচ্ছে যে একটা বিরাট বড় গাছগাছালিতে ঘেরা 'দীঘি'। টলটলে পরিষ্কার পানিতে আকাশ ফেলেছে ছায়া। কী সুন্দর! এত সুন্দর যে বলার মত নয়। এভাবে কখন যে বেলা গড়িয়ে গেছে বোঝাই গেল না। দুপুরে খেতে বসল ওরা। পোলাও, মাংস, কোরমা হুলস্থুল ব্যাপার। অমি আপুতো রীতিমতো গোগ্রাসে গিলছে। সবার মনে এক রকম চনমনে ভাব।

সে রাতে তারা অনেক কিছু নিয়ে গল্প শুনল রশিদ চাচুর কাছে, কত যে ভয়ঙ্কর সব গল্প। এই গ্রামে নাকি এক অত্যন্ত জ্ঞানী মৌলানা ছিলেন। তিনি মারা যাবার পরও নাকি তাঁর বাড়ির ভেতর থেকে এখনো কুরআন পাঠের আওয়াজ আসে! কি ভয়ঙ্কর! রাতে ঘুমাতে গেল অপু। অপু আম্মুকে বলল, "কাল সকালেই কি আমরা চলে যাব? একটা দিন থাকলে হতো না?" অপুর আম্মু বলল, "না রে অপু, কালই সাতটার দিকে বেড়িয়ে পরব আমরা। সামনে তোর গরমকালের ছুটিতে আবার সবাই মিলে বেড়াতে আসবো। তখন দেখবি আসল মজা কাকে বলে!"

সকাল সাতটায় বেরিয়ে পড়ল অপুরা। বেরুনোর আগে অপুর দাদু কান্না-কাটি শুরু করলেন। অপুরও কেন যেন কান্না পেতে লাগল। ইস কত্ত সুন্দর গ্রামটা! চারদিক ছবির মত গোছানো। হাঁটতে হাঁটতে অন্য পথ দিয়ে তারা এগোল ষ্টেশনের দিকে। পথে পড়ল সেই দিনের বিশাল অপূর্ব 'দীঘি'। তার স্বচ্ছ পানিতে 'আকাশ ফেলেছে ছায়া' ...। এই বিশাল আকাশের ভাবটা যেন এমন যে সে নিজের ছবি দেখতেই ব্যস্ত। এটা দেখে অপুর মন মুহূর্তের মধ্যেই ভাল হয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে থেকে তার মনে হল- জীবনটা খুব একটা খারাপ না

প্রবন্ধ বলা গল্প আবার বলা

দিদারুল আলম হিমেল
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩২৩০৪

একটি কৃষকের একটি গাধা ছিল। গাধাটি একদিন অগভীর একটি কুয়ায় পড়লো কিন্তু কুয়াটার গভীরতা গাধার উচ্চতা থেকে বেশি হওয়াতে অবলা প্রাণীটি উঠে আসতে পারছিল না। গাধার ত্রাহি চিৎকারে কৃষক এবং আশেপাশের মানুষ ছুটে এলো। কিন্তু ওরাও বুঝে উঠতে পারলনা কী করবে। ঘণ্টাখানেক চেষ্টা করার পরও যখন গাধাকে উপরে তুলে আনা গেল না, কৃষক তখন চিন্তা করল, কুয়াটা আগে থেকেই বিপদজনক, বেশ কয়েকটি বাচ্চা কুয়াতে পড়ে বার বার আহত হয়েছে। কুয়াটা এমনিতেই ভরাট করতে হবে, তার উপর গাধাটা অনেক বুড়ো এবং দুর্বল হয়ে গেছে। তাই কৃষক সিদ্ধান্ত নিল গাধাসহ কুয়াটা ভরাট করে ফেলবে। কৃষক সবাইকে ডাক দিয়ে সাহায্য করতে বলল। সবাই হাতে বেলচা এবং কোদাল দিয়ে পাশ থেকে মাটি কেটে কুয়াতে ফেলতে লাগল। কিছু মাটির দলা গিয়ে গাধাটার উপরেও পড়ল। ওদের মাটি ফেলা দেখে গাধাটি বুঝতে পারল কী ঘটতে চলেছে, প্রাণীটি ভয়ে দুঃখে নিরবে কাঁদতে লাগল। **কিছুক্ষণ মাটি ফেলার পরে সবাই হঠাৎ চমকে গেল, কারণ গাধাটি অদ্ভুত একটি কান্ড করে বসেছে। সবাই যখন গাধাটির উপরে মাটি ফেলছে, গাধাটি তখন গা ঝাড়া দিয়ে মাটি নিচে ফেলে দিচ্ছে এবং এক পা, এক পা করে ভরাট হওয়া জায়গাতে অবস্থান নিচ্ছে।** সবাই এবার দ্রুত গাধার উপরে মাটি ফেলতে শুরু করল। গাধাটিও তত দ্রুত মাটি গায়ের ওপর থেকে ঝেড়ে ফেলে ভরাট হওয়া জায়গাতে এসে দাঁড়াল। এভাবে কিছুক্ষণ মাটি ফেলার পর সবাই অবাক হয়ে লক্ষ্য করল কুয়াটা প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে, অবশেষে গাধা কুয়া থেকে বেরিয়ে আসলো।.....

জীবনে চলার পথে এমন অসংখ্য কুয়াতে আপনি পড়বেন, যা থেকে উঠে আসার মতো সক্ষমতা হয়তো আপনার থাকবে না। আশেপাশের লোকগুলো আপনাকে টেনে তোলার পরিবর্তে আপনাকে আরো ডুবিয়ে দিতে চাইবে। কিন্তু এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে আপনাকে ওই গাধাটির মতই গা থেকে আবর্জনাগুলো একটু একটু করে ঝাড়া দিয়ে ফেলতে হবে। যতক্ষণ না ওই আবর্জনাতে কুয়াটা পূর্ণ হয়ে যায়। যখনই সমস্যা এসে আপনার শরীর এবং মনের উপরে চেপে বসবে, প্রতিবার একটু একটু করে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া সমস্যার উপর গিয়ে দাঁড়াবেন। প্রতিটি সমস্যা-ই আবর্জনার মতো। আপনি থেমে থাকলে আবর্জনার পাহাড় এসে আপনাকে জীবন্ত কবর দিয়ে দেবে। তাই কখনোই হাল ছাড়বেন না। থেমে থাকবেন না।

গল্প

লাবনীর গল্প

আসিনা রহমান হুমা
শ্রেণি: একাদশ, রাল: ৩২৬৬৬

একটি পাঁচ বছরের মেয়ে লাবনী। মেয়েটি তাদের পরিবারের প্রথম সন্তান। তার বাবা মায়ের একমাত্র আদরের মেয়ে। তাই সে তার মা-বাবা থেকে প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি ভালবাসা ও আদর পেয়েছে। তার বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী ও মা গৃহিনী। সবকিছুই ঠিক ঠাক চলছিল। একদিন সে জানতে পারলো যে তার ছোট আরেকটি ভাই/বোন হবে। শুনে সে খুবই খুশি হলো। কেননা সে তার সাথে খেলা করার জন্য একজনকে সবসময় পাবে। যতই দিন যেতে লাগলো এইটুকু মেয়ে তার মাকে ঠিক ততটাই যত্ন করতে শুরু করলো।

অবশেষে একদিন তার একটি ছোট্ট বোন হলো। লাবনী তার ছোট বোনটির নাম রাখলো মাহি। সে তার বোনটিকে খুব আদর করতো, খুব ভালোবাসতো। লাবনী সর্বক্ষণ তাকে দেখে শুনে রাখার চেষ্টা করে। যদিও সে নিজেই খুব ছোট। তবে তার এইসব আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যখন তার বোনটির বয়স মাত্র দুই, তখন তার মায়ের একটি চাকরি হলো। চাকরিটা হয় কুমিল্লায়। তাই তার মাকে ঢাকা ছেড়ে চলে যেত হয় কুমিল্লা। তার মা তার বোন মাহিকেও সাথে নিয়ে যান। তখন লাবনী মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়তো। তার মায়ের অনুপস্থিতি দিন দিন তাকে মনমরা করে ফেলতে থাকে। তার মা প্রায়ই তাকে ফোন করতেন। ছুটি পেলেই ঢাকা চলে আসতেন।

তবুও সবসময় তো আর থাকতে পারতেন না। সব শিশুরাই চায় তাদের মা সব সময় তাদের সাথে থাকুক। সে তাই দিন দিন অন্যরকম হয়ে যেতে থাকে। পরিবারের বাকি সবাই যদিও তাকে খুব দেখে শুনেই রাখতো তবুও তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করে না। ঘুমায় না। সবকিছুই তার এলোমেলো হয়ে যায়। এভাবে কয়েক বছর কেটে যায়। অবশেষে বড় মেয়ের এমন অবস্থা দেখে তার মা চাকরির স্থান বদল করে ঢাকা চলে আসেন। আর তাই লাবনী তার মা ও তার আদরের বোনটিকে পেয়ে আবার মানসিকভাবে সুস্থ হয়ে উঠে। লেখাপড়ায় তার অনেক উন্নতি দেখা যায়। খাওয়া দাওয়া সবকিছু ঠিক হয়ে যায়। এমনি করে করে ভাল দিন কাটছিলো তার। সে এখন স্কুল জীবন পার করে কলেজ জীবনে। এখনো তার মা চাকরি করেন। তাই সে এখন মোটামুটি সবকিছুর দায়িত্ব নিয়েছেন। সবকিছুর খেয়াল রাখে। বড়দের সম্মান আর ছোটদের স্নেহ করে। আবার মাঝে মাঝে ছোট বোন মাহির সাথে দুষ্টুমিও কম করে না। হঠাৎ একদিন সে তার মা-বাবাকে ঝগড়া করতে দেখলো। ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত সে তার মা-বাবাকে ঝগড়া করতে দেখেনি। তাই কেন তার মা-বাবা এভাবে ঝগড়া করছেন তা জানতে সে উদ্বিগ্ন হয়ে গেল। তখন বাড়িতে আর কেউই ছিল না। সে লুকিয়ে লুকিয়ে ঝগড়ার মূল কারণটি জানতে চেষ্টা করলো। সে জানতে পারলো এমন একটি সত্য, যা শোনার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। সে জানতে পায় যে সে তার বাবা মায়ের আপন সন্তান না। তাঁরা তাকে জন্ম দেয়নি, বরং তাকে দত্তক নিয়েছেন। এখন তার বাবা এই কথাটি লাবনীকে জানানো প্রয়োজন বলে মনে করছেন, কিন্তু তার মা তার বাবাকে বলতে নিষেধ করছেন। তার মায়ের ধারণা লাবনী এই সত্যটি মোটেও মেনে নিতে পারবে না। তাই লাবনীর মা চান যেন লাবনী সত্য না জানতে পারে। কিন্তু তার বাবার রায় এই যে, এখনই লাবনীকে এই সত্যটি বলে দেওয়া উচিত। এদিকে লাবনী এত বড় সত্যটি জেনে দিশেহারা হয়ে যায়। সে নিজের অজান্তেই এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে বাড়ীর বাইরে রাস্তায় চলে যায়। এমন সময় তার মা-বাবা তাকে সত্য বলার সিদ্ধান্ত নিয়ে তার রুমে যান। কিন্তু তাঁরা লাবনীকে না পেয়ে সারা বাড়ি খুঁজতে থাকেন। অবশেষে তাঁরা লাবনীকে খুঁজতে বাইরে যান। তাঁরা লাবনীকে রাস্তায় উদভ্রান্তের মত হাঁটতে দেখলেন। ঠিক ঐ মুহূর্তেই লাবনীর সামনে একটি ট্রাক চলে আসে। কিন্তু লাবনী তা খেয়াল করে না। আর ট্রাক আসতে দেখে তার মা দৌড়ে এসে লাবনীকে ধাক্কা দিয়ে নিজে সরে গেলেন। ট্রাকটি চলে যায়। লাবনী অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিজের জীবনের কথা চিন্তা না করে যে মানুষটি তার জীবন বাঁচিয়েছে, সে আবার তার মা নয় কিভাবে? ভাবতে ভাবতে লাবনী তার মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে। আর অন্যদিকে মেয়ের এই রকম আচরণে অবাক হয়ে লাবনীর মা লাবনীকে অনেক বকা দেন। কিছুক্ষণ পর লাবনী তার মাকে বলে যে সে জেনে গিয়েছে যে তারা লাবনীকে দত্তক নিয়েছে। এটা শুনে লাবনীর মা-বাবা অবাক হয়ে যায় ও পুরো ঘটনাটি বুঝতে পারে। তার লাবনীকে সান্তনা দিতে যায়। কিন্তু লাবনী বলে যে, সে খুব ভাগ্যবান, এমন বাবা মা পেয়ে, যারা তাকে নিজেদের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসেন। লাবনী তাদেরকে বলে দেয় যে আজ থেকে আমি তোমাদেরই মেয়ে। তোমরাই আমার সত্যিকার অর্থে মা-বাবা। সন্তানকে ভালোবেসে আগলে রাখাই সত্যিকার মা-বাবার পরিচয়।

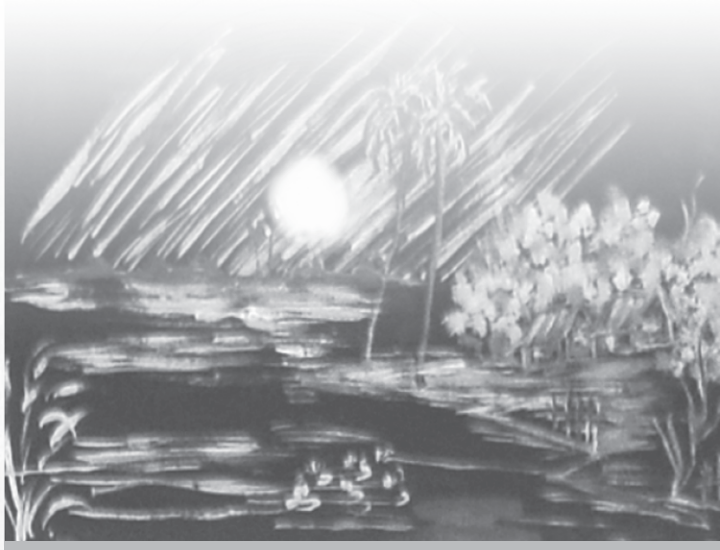

কবিতা

সূচিপত্র

- পরিচয় / মুহাম্মদ আশরাফুল করিম / গ্রন্থাগারিক
- অর্জিত / মেহেদি বিন ইসমাইল
- কম / মুস্তাফিজ সুবহান
- ধন্য করো জীবন / মাহমুদুল হাসান ইজেল
- স্বপ্ন / শাহরিন হোসেন
- মাকে খুঁজি/ সাদিয়া বিনতে ইসলাম প্রমি
- প্রকৃতির খেলা / নাজমুন নাহার সোনিয়া
- কী পেলাম / এ. কে. এম আরিয়ান
- বসন্ত এখন / শাদমান সাকিব
- বিজয় মানে / আশিকুল ইসলাম রাকিব
- শরতের মেঘ / মারিয়া বকুল মুমু
- জোনাকির আলো / হোসেইন হারিম
- আমার পৃথিবীতে আমি / মাহিয়া সুলতানা
- ইচ্ছে করে / মোঃ রিদোয়ান খন্দকার
- Night / নাভিদ ফারাবী
- মা / মোঃ কবির হোসেন
- নিশির জন্য / খাদিজা আক্তার স্বর্ণা
- স্বাধীনতা কী / নাহিদ হোসেন
- মা / মোঃ হেলাল হোসেন
- প্রিয় জন্মভূমি / জি এম অনির্বাণ
- বইকে সবাই বন্ধু কর / মাহবুবুর রহমান প্রিন্স
- বৃষ্টি তুমি এলে / জান্নাতুল ফেরদৌস হিরা
- পদ্ম পুকুরের গল্প / মোঃ রাকিবুল ইসলাম হিরা
- স্মরণে দুই জননী / শবনম শারমীন
- নির্জনে শূন্য মনে / সিথি আক্তার
- It’s Raining / Md Tanjeeb Khan Saad
- আমার বাংলা / তাসফিক নাজিম আসার
- Memories / Fariha Mutahara

পরিচয়

মুহাম্মদ আশরাফুল করিম
গ্রন্থাগারিক

যদি প্রশ্ন করি কী তোমার পরিচয়?
হয়তো বলবে তুমি তোমার ঠিকুজি
মোঘল সালতানাতের অধিশ্বর
অথবা বলবে আমি তো সম্রাট নই,
নিতান্তই একজন সাধারণ মানুষ,
বলবে তোমার ঠিকানা।
এভাবেই দিনে দিনে
ঠিকানার আবর্তে ম্লান হয়ে যায় পরিচয়।
তুমি কি ভুলে গেছ তোমার অতীত
তোমারই ভূমিতে তারা তোমার নামকরণ করলো অসুর-বায়স্য
অথচ কী নির্লজ্জের মতো বুকের ছাতি ফুলিয়ে
বলো আমি আর্য বংশোদ্ভুত।
লড়কে লেংগে পাকিস্তান' বলে
স্লোগানে-আন্দোলনে
যে পাকিস্তান অর্জন করলে, কী পেলে?
– অনেক দাম দিয়ে বুঝলাম
ধর্মের ভিত্তিতে জাতি হয় না, হয় সম্প্রদায়।
আর সেই সাম্প্রদায়িকতা উসকে দিয়ে
ফায়দা লুটেছে একদল লুটেরা
এবং এখনও লুটছে।
দেখো তোমার শহরে
ক্রিকেটের মাঠে পত পত করে উড়ে
চাঁদ তারা পতাকা।
তুমি কি এখনও গাও–
পাক সার জমীন সাদবাদ।
কেন মিছে পরিহাস করো,
এখনও বুটের চিহ্ন মুছে যায়নি বুক থেকে
ত্রিশ লক্ষ তাজা প্রাণ
আর দুই লক্ষ নারীর সম্ভ্রমে
শোধ করেছি সে দায়।
আমি ভুলিনি আমার পরিচয়
আমি জানি আমি মানুষ,
আমার জাতিসত্তা বাঙালি।
ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীর রক্ত ধারা বইছে
আমার শিরায়।
হাজার বছরের ঐতিহ্য
বায়ান্ন উনসত্তর একাত্তর
এখনও সজীব আমার চেতনায়।
তুমি কী দেখনি নব্বইয়ের গণ আন্দোলন,
শাহবাগের উত্তাল জনস্রোত?
নতুন প্রাণে নতুন করে আবার ফিরে এসেছে
সেই স্লোগান
'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা'
তবে কেন মিথ্যে প্রলাপ
এসো বজ্র কণ্ঠে স্লোগান ধরি
'তুমি কে? আমি কে?
বাঙালি বাঙালি'

অর্জিত

মেহেদি বিন ইসমাইল
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৩৮২৯

আমি দেখিনি ৫২-এর ভাষা আন্দোলন,
শুধু শুনেছি সেই আন্দোলনের কথা

ভাষার জন্য যুদ্ধ করেছে যারা
রক্তের বিনিময়ে রক্ষা করেছে
বাংলা ভাষা তারা।

ভাষার জন্য নিবেদন করেছে প্রাণ
বিশ্ব দেখেছে ভাষার জন্য করেছে জীবন দান।

ভাষার জন্য রক্ত ঝরেছে যাদের,
তারাই স্মরণীয় বীরপুত্র দেশের।

আমার ভাইয়ের রক্ত দিয়ে গড়েছিল বাংলা,
তোমার আমার মুখে মুখে মায়ের ভাষা বাংলা।

আমি দেখিনি স্বাধীনতা যুদ্ধ,
শুনেছি নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কথা
শুনেই হৃদয়ে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাথা।

আমি দেখিনি
৭১-এ সন্তান হারা মায়ের যন্ত্রণা
করিনি অনুভব তাদের বিষণ্নতা।

আমি দেখিনি অগণিত মানুষের লাশ,
শুনেছি তাদের নির্মমভাবে লাশ হওয়ার ইতিহাস।

আমি দেখিনি
বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ
শুধু শুনেছি তাদের বীরত্বের কথা।

যারা রেখেছে জীবন বাজি
দিয়েছে নিজের প্রাণ,

প্রমাণ করেছে বিশ্বের বুকে
দেশের প্রতি আমাদের কত টান।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পেয়েছি একটি দেশ
সেতো আমার চিরচেনা স্বাধীন বাংলাদেশ।

অনেক ত্যাগের বিনিময়ে
পেয়েছি এই দেশ, পেয়েছি এই ভাষা
যা রক্ষা করতে প্রস্তুত থাকব সদা।

তারুণ্যের আলোয় ঝলসে দিব
সকল অনাচার,

রক্ষা করব ভাষা ও দেশ আমার অঙ্গীকার,
বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ আমার অহংকার।

কম

মুস্তাফিজ সুবহান
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩১৭৭১

বড় গাছ নড়ে কম,
বড় মাছের কাঁটা কম।
জ্ঞানী লোকের কথা কম,
সৎ লোকের সংখ্যা কম,
গুণী লোকের কদর কম।
মরা নদীর পানি কম,
রাগী লোকের ধৈর্য কম।
সুস্থ লোক খায় কম,
মূর্খ লোকের আক্কেল কম,
নিষ্ঠুর লোকের মায়া কম,
শিশুদের হিংসা কম,
সৎ লোকের বন্ধু কম,
নিঃশ্বাসের বিশ্বাস কম।

ধন্য করো জীবন

মাহমুদুল হাসান ইজেল
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩১২৯২

ঐ সূর্যের সোনালি রশ্মির মতো
আমি আলো হয়ে জ্বলতে চাই
ফুটন্ত ফুলের মতো আমি
চারদিকে সুরভি ছড়াতে চাই।
প্রাণে প্রাণে নব আনন্দের
সাড়া আমি জাগাতে চাই।
পূর্ণিমার চাঁদের আলোর মতো আমি
হৃদয়টাকে সুন্দর করতে চাই
রাতের নিস্তব্ধতাকে আমি
গভীরভাবে ভালোবাসতে চাই।
একতাবদ্ধ হয়ে আমি
সফলতা অর্জন করতে চাই।
সবাইকে ভালোবেসে আমি
ধন্য জীবন গড়তে চাই।

মাকে খুঁজি

সাদিয়া বিনতে ইসলাম প্রমি
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩০০৬১

এসেছি নতুন শহরে
ভাগ্যের অন্বেষণে
এত ভীড় এত কোলাহলের মাঝে
পাই না তো শান্তি মনে।
মা-এর কোলে সুখে দুঃখে
বেশ তো ছিলাম আমি
স্বপ্ন পূরণের আশায় হলাম-
কঠিন পথগামী।
জানি না এর শেষ কবে হবে
এত বিশালতার মাঝে
মা তুমি আমার মনেই রবে।
অচেনা মুখ, অচেনা কথা
হারিয়ে গেছি ছোট আমি
কঠিন বাস্তবতাকে সামলে নিয়ে
পথ চলছি এই তো আমি।
রাতের আঁধার নামে যখন
মাকে মনে পড়ে তখন।
রাত শেষে সকাল সাঁঝে,
কতদিন ঘুমাই না মা
তোমার বুকের মাঝে।

স্বপ্ন

শাহরিন হোসেন
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩০২১৪

বন্ধু তুমি স্বপ্ন দেখ
স্বপ্ন দেখা থামাবে না।
অন্ধও যদি স্বপ্ন দেখে
তবে, তুমি কেন দেখবে না।
কর্ম যদি স্বপ্নমুখী
তবে তুমি কেন দুঃখী
নির্ভাবনায় এগিয়ে যাও
সকল পথ পেরিয়ে আগাও
তুমি চলে যাবে একদিন
তবে তোমার স্বপ্ন রয়ে যাবে চিরদিন
এ স্বপ্ন তখন দেখা যাবে
নতুন কোনো চোখের মাঝে
তুমি কিংবা নতুন চোখ
পূর্ণতা দেবে এ স্বপ্নের পথ
অন্ধকারের সকল কালো
মুছে দিবে এই নতুন আলো।

প্রকৃতির খেলা

নাজমুন নাহার সোনিয়া
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩০৪৭০

বসন্তের এক নিস্তব্ধ রাতে
বাতাসের উথাল-পাথাল ঢেউয়ে
যেন আমি বিস্মিত।
কারাগারের কপাট তুল্য জানালা ধরে
দাঁড়িয়ে রইলাম নিঃশব্দ নীরবে
বিস্ময়ের চোখে।
বাতাসের গন্ধ আর ঝিরঝির শব্দ
আমার হৃদয়ের আঙ্গিনাকে করে ফেলল জব্দ।
চারিদিক থেকে ধুলাবালি
মিশ্রিত হয়ে বাতাসে,
তৈরি করল যেন এক কারসাজি।
চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আমি
হঠাৎ এক পেঁচার অদ্ভুত শব্দ
কী এক অবাক কান্ড।
পলক তুলে দেখি শূন্য সেই গাছের কান্ডপত্র।
আকাশে তাকিয়ে দেখি,
চাঁদ যেন লক্ষ করে আসছে উচ্চস্বরে।
উৎফুল্ল মনে আমি
এখনও দাঁড়িয়ে আছি সেই জানালাটা ধরে
বলছে না মন এসব ফিরে পেতে।
আচমকা বিশাল এক শব্দে
নামতে শুরু হল আকাশ হতে
টপাটপ বৃষ্টি
সত্যিই কি অদ্ভুত এই প্রকৃতি
বিধাতার এক সৃষ্টি।

কী পেলাম

এ. কে. এম আরিয়ান
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৩৪৬৮

আমি তারুণ্যের উন্মাদনা দেখেছি,
খাদ্যের জন্য উন্মত্ততা দেখিনি।
আমি ভগ্নাংশ দেখেছি
ভালবাসা দেখিনি।
আমি আলো ছায়ার খেলা দেখেছি
আঁধারে ঘেরা জীবন দেখিনি।
আমি সুখের ঘরে স্বপ্ন দেখেছি,
তাই দুঃস্বপ্নের অর্থ আমি বুঝিনি।
আমি তিমিরে জাগা পাখি দেখেছি,
কষ্টে ভেজা আঁখি দেখিনি।
তাই স্রোতের জলে ভেসেও অশ্রুকে
আমি চিনতে পারিনি।
তাই তোমার দেয়া কষ্টে, আমি
আজও কাঁদিনি।

বসন্ত এখন

শাদমান সাকিব
বিভাগ: হিসাববিজ্ঞান, রোল: এ-৯৮৯

মুক্ত বিহঙ্গ আজ গাছের ডালে
উড়ে বেড়ায় আপন চঞ্চলতায়।
বৃক্ষ শাখার নতুন পাতায়
প্রকৃতি সাজে কোন সে খেয়ালে?
গাছে গাছে পাখি কুহু ডাকে
সুর মাখা সে দক্ষিণ হাওয়ায়
বনের ফুলও গন্ধ ছড়ায়
মুগ্ধতা মাখা আবেশে সব জড়িয়ে রাখে।

প্রকৃতির এমন ছন্দে দোলা
নির্মলতার পরশ বুলিয়ে যাওয়া
ফুলে ফুলে ভ্রমরের অবিরাম গুঞ্জন
কোথায় পেল প্রকৃতি এমন স্নিগ্ধ ছোঁয়া?
উদগ্রীব আকাঙ্ক্ষায় যখন হল প্রশ্ন তোলা
প্রকৃতির মাঝে উঠল রব বসন্ত এখন।

বিজয় মানে

আশিকুল ইসলাম রাকিব
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩০৯০৯

বিজয় মানে কৃষ্ণচূড়ার
রক্তে রাঙা লাল,
বিজয় মানে আঁধার কাটা
সোনালি সকাল।

বিজয় মানে মুক্ত পাখি
মুক্ত পথে চলা,
বিজয় মানে স্বাধীনতাকে
ন্যায়ের কথা বলা।

বিজয় মানে বাঁচতে পারা
স্বাধীন নিজের মত,
বিজয় মানে বলতে পারা
আবেগ নিজের যত।

বিজয় মানে স্বাধীন দেশ
মায়ের মত চেনা,
বিজয় মানে দেশের ছবি
রক্ত দিয়ে কেনা।

বিজয় মানে লক্ষ শহিদ
লক্ষ প্রাণের সুর
বিজয় মানে মুক্ত স্বাধীন
মুক্ত মানুষের স্বর।

শরতের মেঘ

মারিয়া বকুল মুমু
বিভাগ: ইংরেজি, রোল: ৪৬০

তোমার আসার সংবাদে বিচলিত হয়ে
এই বরণমালা গাঁথতে বসা।
তোমার দেয়া উপহার
কাশফুলের পাপড়ি হাতে
বসন্তের দ্বার হতে ফিরে আসা
তিরস্কারপ্রাপ্ত মন নিয়ে আমার
একমুঠো মুক্তির খোঁজ।

শিশিরকে একান্ত নিজের করে নিতে
শিউলি ফুলের ঝুপ করে পড়ে যাওয়া
অভিমানী বকুলের সাথে রোদের লুকোচুরি
যেন আগলে রাখতে চায় সযত্নে
আমার অবচেতন মনের এক চিলতে হাসি
আর চোখ বন্ধ করে নেয়া দীর্ঘনিশ্বাস।
ক্ষণে ক্লান্ত হয়ে আসা অশান্ত বর্ষা
আর তোমার খন্ড মেঘমালার নিরুদ্দেশ
ভেলায় স্বপ্ন ভাসিয়ে
হে শরতের মেঘ,
তোমার শুভ্র, নিষ্পাপ স্বপ্নের দোলাচলে
আমার তানপুরার সুর
নিতান্তই সপ্তকের নীড়ে নয়
অন্য এক জগতে নিয়ে যাবে আমায়

তাই তো শরতের মেঘ
তোমার আঁচলের তলে নিজেকে কল্পনা করে
সব আবেগ সমর্পণ করেছি তোমাতে।

জোনাকির আলো

হোসেইন হারিম
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৩৭৮৫

রাতের বেলা অন্ধকারে
বুকটা দুরুদুরু।
জোনাকিরা উড়ে গেল
গল্প হলো শুরু।
দুষ্টু মিষ্টি জোনাকি
জ্বলে রাতের আকাশে,
তারা খেলা করে
উল্লাসে প্রাণোচ্ছ্বাসে।
জোনাকিরা খেলা করে
সন্ধ্যা রাত্রি বেলা,
দিন হলে চলে যায়
জোনাকির আলোর খেলা।
জোনাকিরা উড়ছে দেখ
আলোকছটা ছড়িয়ে।
মিটিমিটি জ্বলছে তারা
খেলছে তারা লুকিয়ে।
ইচ্ছে হলে উড়ে যায়
মেঘের উপর,
সেই দেখে চলে যায়
আমার জীবন পার।

আমার পৃথিবীতে আমি

মাহিয়া সুলতানা
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৩১৩৬

কোনো বিস্বাদের ছায়া
আমার মুখে বসবে না আর।
ওই উঁচু চূড়া হতে
নীল আকাশে
যখন ভাসিয়েছিলাম নিজেকে,
চেয়েছিলাম,
ওই বিশাল নীল বক্ষে হারিয়ে যাব একদিন।
আমার স্থান হয়নি।
ওই উদার আকাশ
কেবল শুষে নিয়েছে আমার আজন্ম কালের গ্লানিগুলোকে
ফিরিয়ে দিয়েছে সেই চির রঙিন হাসি
ও শ্যামল ধরণী,
আমি তোমায় হাসি দেব
তুমি দিও একচিলতে শীতল মাটি।

ইচ্ছে করে

মোঃ রিদোয়ান খন্দকার
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩২২১৫

ইচ্ছে করে দূর আকাশে
ডানা মেলে উড়তে
বিশালতার নীলের মাঝে
ঘুড়ি হয়ে ঘুরতে।

ইচ্ছে করে সাগর নদী
সকাল-সাঁঝে দেখতে
পাখ-পাখালির দৃশ্য নিয়ে
পদ্য ছড়া লিখতে।

ইচ্ছে করে আকাশপুরে
পরীর ডানায় চড়তে
সবুজ শ্যামল বৃক্ষ দিয়ে
বিশ্বটাকে গড়তে।

Night

নাভিদ ফারাবী
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩১০১৬

Night is the time when sorrows will be gone.
Night is the time when the moon shines alone.
Night is the time when we should never mourn.
Night is the time for merry to take the throne.

It’s the time to know your God.
It’s the time to praise the lord,
It’s the time for us to nod
To the master of light
In the darkest time of night.

মা

মোঃ কবির হোসেন
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩২৫১০

প্রসূতি জননী মাতৃভাষা
জন্ম থেকে সেই একই কথা
মা মা মা।
কর্ণ শোনে শ্রবণ জানে
অবনী ধরা ধরণী মাঝে
একটা ডাকই দ্বিখন্ডিত আছে
লোকান্তর গমন কালেও মুখে বাজে
সে তো মা, মা, আর মা
পৃথিবীতে এসেছি আল্লাহর দানে
তিনিই জানেন মায়ের কী মানে
মা তো সে শুধুই মা
প্রসূতি জননী মাতৃভাষা
মনে বাজে একই কথা
ধরণী মাঝে প্রথম তাকেই ডাকা
ওই পারে পাই যেন খোদা তার দেখা।

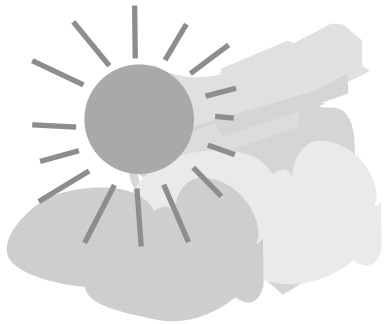

নিশির জন্য

খাদিজা আক্তার স্বর্ণা
বিভাগ: ইংরেজি, রোল: ৪৪৯

আমি এক মরুভূমি,
কদিন ধরে কেউ একজন বারবার আসে যায় মরুভূমিতে
মরুভূমিকে গল্প শোনায়
সে মরুর বুকে বাস করবে।
মরুভূমি বলে, পারবে না তুমি মানব
সে বলে, তুমি জানো না আমি কী পারি
হঠাৎ মরুর উত্তাপে সে ঝলসে গেল
মরুকে প্রাণহীন বলে চলে গেল।
মরু হেসে বলল,
আমি যে প্রাণহীন তা আমার থেকে কে জানে ভালো
তার পরমুহূর্তে মনে হল,
কেন এক ঝড় তুলি না?
বাতাসকে কেন আহ্বান করি না?
চূর্ণ বিচূর্ণ হোক পথিকের সকল পদচিহ্ন
নিজেকে আঘাত করে মুছে দেই সকল চিহ্ন।
কিন্তু পারলাম না!
শুধু নিশির জন্য .....

তাকিয়ে দেখলাম তার ঘুমন্ত মুখটার দিকে,
যার একমাত্র বন্ধু এখন মরুভূমি।
সে মরুভূমির সাথে হাসে, খেলে, কথা বলে,
চোখের পানিটুকু তার তপ্ত মরুর বুকেই শুকায়।
আর পারলাম না নিজেকে ভাঙতে।
শুধু তোর জন্য নিশি।

স্বাধীনতা কী

নাহিদ হোসেন
বিভাগ: ডিবিএ, রোল: বিবিএ ৩৯৯

যদি বলি স্বাধীনতা অসীম আকাশ
ভুল হবে তবে।
চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সেতো আকাশেই থাকে
কিন্তু স্বাধীনতা, সেকি এমন কিছু যাকে রাখতেই হবে?

যদি বলি স্বাধীনতা সীমাহীন সমুদ্র
ভুল হবে তবে।
সমুদ্রের তো শুধু পথচলাই আছে
কিন্তু স্বাধীনতা, সেকি শুধু পথচলাতেই?

যদি বলি স্বাধীনতা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক
ভুল হবে তবে।
সারাদিন সারারাত যে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে
কিন্তু স্বাধীনতা, সেকি শুধু ডেকে যাওয়াতে?

যদি বলি স্বাধীনতা লাল টুকটুকে সূর্য
ভুল হবে তবে।
সূর্যের তো আছে নিয়ম জাগবার আর ডুববার
কিন্তু তাতে কি আছে সেই মুক্তির স্বাদ?

তবে কি এই স্বাধীনতা?
কিছুতেই বলা যায় না
অনুভব করতে হয়, হৃদয় দিয়ে।

মা

মোঃ হেলাল হোসেন
বিভাগ: ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং, রোল: ১১৯৬

মা, চেয়ে দেখ,
আমি আছি তোমার পাশে।
যাব না তোমায় ছেড়ে
যত কাজই থাকুক।
মা তুমি চেয়ে দেখ
অতীতের দিকে।
তুমি আমায় ঘুম পাড়িয়েছিলে
মাথায় হাত বুলিয়ে।
মা তোমার কষ্ট দেখলে
মনটা আমার কাঁদে।
মনে পড়ে সেদিনের কথা
ভুলতে পারি না স্নেহ আর ভালবাসা।
আজ তুমি শুয়ে আছ অসুস্থ বিছানায়।
হঠাৎ করে কি চলে যাবে
আমাকে ছেড়ে?
মনটা খুব কাঁদে, মা
নয়নে থাকে জল,
উতাল হয়ে ওঠে আমার
অন্তরের অন্তঃস্থল।
তুমি মা আমার কাছে
নও হীরা পান্না।
তুমি আমার অমূল্য ধন
বোঝাতে পারব না।
গভীর রাতে ভাবি মাগো
থাকব কেমন করে?
চলে যাবে আমায় ছেড়ে
মা বলব কারে?
শেষ বিদায়ে থাকব পাশে
তোমায় যাতে দেখতে পাই।
নয়নে আসে অশ্রু
বোঝাবার মত কেউ নাই।
মাগো তুমি পেলে ব্যাথা
ক্ষমা করে দিও আমায়
মরণের আগে।

প্রিয় জন্মভূমি

জি এম অনির্বাণ
বিভাগ: ইংরেজি, রোল: ৪৮০

আবার যদি পৃথিবীর বুকে
জন্ম নিতে হয়,
মাগো তোমার কোলেই
জন্ম নেব অন্য কোথাও নয়।
আসব ফিরে আবার তোমার
ভাঙা মাটির ঘরে,
কাটাব দিন তোমার ছায়ায়
রোদ বৃষ্টি ঝড়ে।
তোমার জলে করবো স্নান
বায়ুতে নেব শ্বাস,
সুখে-দুঃখে মাগো তোমার পরশে
কাটাব বারো মাস।
ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দু
রোদে ঝলমল করে,
মাঠে মাঠে হাসে সোনালি ফসল
দেখব দুচোখ ভরে।
হাঁটব তোমার আল পথ বেয়ে
চোখ যায় যত দূরে,
স্বপ্নে বিভোর হব আবার
উদাসী বাঁশির সুরে
তোমার স্নিগ্ধ কোলে যদি
আবার ঘুমিয়ে যাই
তোমার মাটিতে জনম জনম
দিয়ো মাগো ঠাঁই।

বইকে সবাই বন্ধু কর

মাহবুবুর রহমান প্রিন্স
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩০৯৩২

বইকে সবাই বন্ধু কর
গানকে কর সাথী,
মনকে কর ফুলের মত
কলেজকে কর সাথী।

সবাই মিলে এক হয়ে
শিক্ষা জাগাও সুরে সুরে
রইবো নাকো বদ্ধ ঘরে
ফুটবো মোরা আলোর তরে

মিথ্যাকে ঢেকে রাখ
সত্যপথে এগিয়ে চলো,
দুঃখী জনের সেবা করে
সৎপথে এগিয়ে চলো।

বৃষ্টি তুমি এলে

জান্নাতুল ফেরদৌস হিরা
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৩১৪২

হে বৃষ্টি, তুমি এলে
প্রকৃতির রুক্ষ, শুষ্ক রূপকে মুছে
প্রকৃতিকে স্নিগ্ধ সাজে সাজাতে

বৃষ্টি, তুমি এলে

বৃষ্টি তুমি এলে,
পথিকের তৃষ্ণার্ত বুককে
পরম তৃপ্তিতে ভরিয়ে দিতে
বৃষ্টি তুমি এলে।

হে বৃষ্টি তুমি এলে,
কৃষকের বুকে নতুন স্বপ্ন
নতুন আশার সঞ্চার করতে
বৃষ্টি, তুমি এলে

বৃষ্টি, তুমি এলে,
দুরন্ত বালকের বুকে আনন্দ
উল্লাসের আমেজ এনে দিতে
বৃষ্টি, তুমি এলে।

বৃষ্টি, তুমি এলে
বাড়ির উঠানে একলা কিশোরীর
শান্ত মনকে চঞ্চল করে তুলতে
বৃষ্টি তুমি এলে।

বৃষ্টি, তুমি এলে
একলা রমণীর বিষণ্ন দিনগুলোর
সজল সঙ্গী হয়ে
বৃষ্টি, তুমি এলে।

পদ্ম পুকুরের গল্প

মোঃ রাকিবুল ইসলাম হিরা
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩২৫৪৫

এখানকার আলো, বাতাস, গাছগাছালি, পুকুর এবং রাস্তা
সবকিছুই আমার শুভাকাঙ্খী, তারা সবাই আমার আপন।
এই রাস্তা আমাকে দেখায় তার পায়ের ছাপ,
এই আলো আমাকে দেখায় তার সৌন্দর্য,
এই বাতাস আমাকে শোনায় তার গান,
এই পুকুর আমাকে জানায় তার আহ্বান,
জানি না কি করে পাব তাকে,
তবুও যেন মনে হয় সে আমার অনেক কাছে।
তাকে যেন আমি অনেক আগে থেকে চিনি।
আমার কেন যেন মনে হয়, সে আমাকে তার কাছে ডাকছে।
কিন্তু কোথায় সে, সে কি আমাকে তার দেখা দিবে না।
না না এই গাছ আমাকে বলেছে সে আসবে,
সে ঠিকই ফিরে আসবে আমার কাছে।
এই গাছ এখন আমাকে যা বলে আমি তাই করি।
আমার দুঃখের সময় এই গাছ ছিল আমার সঙ্গী।
আমি কি পাগল? না আমি পাগল নই।
পাগল আমার মন, সে যতই পাগলামি করুক না কেন,
তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।
যেটা হচ্ছে হতে দাও, বাধা দিতে এস না।
সে জানে, আরেকটু এগিয়ে গেলেই তার দেখা পাবে
আমাকে যেতে দাও, আমাকে যেতে দাও।
আমি থাকব না আর এই ভুবনে।
যেখানে নেই ভালোবাসা, নেই কোনো বিশ্বাস।
সেখানে দম বন্ধ করে পরে থাকার থেকে,
ভালোবাসার পিছু পিছু ছুটে চলাই উত্তম।

স্মরণে দুই জননী

শবনম শারমীন
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩০৭৫৭

আমার ছিলেন দুজন মা
দুজনেই আমার নিজের।
ভিন্ন দুজন মানুষ তবু
একই নাম তাদের।

আলাদা দুই নারী তাঁরা
ভিন্ন তাঁদের অঙ্গন।
ভালোবাসি দুজনকেই
দুজনেই আমার অতি আপন।
প্রথম জননী
এসেছি ধরণীতে তাঁরই কোলে চড়ে,
আদর দিয়ে, সোহাগ দিয়ে
দিলেন জীবন গড়ে।

এই মা নবীন যার মতো আমি
আমার মুখের আবেগ যেন তারই প্রতিধ্বনি।
ভালোবাসা দিলেন তিনি যা আজ আমার আদর্শ
জীবনের পথে দিলেন তিনি কতোই না পরামর্শ।

হঠাৎ একদিন বদলে গেলেন তিনি
আজ তিনি বৃদ্ধা মা
বুঝেছি সময় হয়েছে চলে যাওয়ার
তিনি যেন এক অচেনা মানুষ
আমার মায়ের শাড়ি পরনে তাঁর

দেখতে আছেন আগের মতোই
বেশি কম কিছু
কিন্তু জানি
আজ আমি তার শক্তি
আর তিনি আমার শিশু।

[হোয়ান স্লো ডানকানসন-এর Two Mothers Remembered কবিতা থেকে অনুদিত।]

নির্জনে শূন্য মনে

সিথি আক্তার
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩২৭৯০

কখন হৃদয় গড়ের মাঠে একাকী আমি
পত্রহীন বৃক্ষের মতো প্রহর গুণি
নির্জনে শূন্য মনে।
কখনো হৃদয় আকাশে
মেঘের আনা গোনা
অশান্ত করে দেয় আমার সমগ্র সত্ত্বাকে
নির্জনে শূন্য মনে।
কখনো রুদ্ধ নিঃশ্বাসের বদ্ধ নীড়ে
তারা খসে পড়া আকাশে
ক্ষয়ে যাওয়া দিনের ছবি আঁকি
নির্জনে শূন্য মনে।
কখনো পাথর চাপা রক্তাক্ত বেদনার
বিষাক্ত শরের আঘাতে আহত আমি
একাকী ছটফটিয়ে মরি
নির্জনে শূন্য মনে।
কখনো সীমাহীন আঁধারের বুকে
অতন্দ্র প্রহরীর মতো
নিঃসঙ্গ আমি জেগে থাকি
শুধু তোমার অপেক্ষায়
নির্জনে শূন্য মনে।

It's Raining

Md Tanjeeb Khan Saad
Class: XII, Roll: 32175

It's raining inside without limitations.
Someone wants to tell something
With lots of emotions.
It's hard for him to tell;
She may not be ready to listen as well
But it's now raining cats and dogs;
Floods about to wash all the feelings.
You don't know what you meant to him;
He's about to forget all other dealings
It's raining now.
Let's get soaked together
Let's make the moment joyful forever
It's raining then, it's raining now
It will be rainy for him forever
And he won't take a vow.

আমার বাংলা

তাসফিক নাজিম আসার
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৪৩৭১

আকাশের পানে দেখলে আমার
তৃষ্ণায় ফাটে বুক,
দখিনা বাতাসে জুড়ায় আমার
অচিন মনের সুখ।

বাংলার মায়া কোথাও গেলে
পাবনাকো আমি খুঁজে,
গাছের ছায়ায় লাগে তৃপ্তি
বসলে চোখ বুজে।

বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস
বাংলার নদী-নালা,
বাংলার গ্রাম-গঞ্জে আবার
বসছে কত মেলা।

বাংলা আমার মাতৃভাষা
আহা কী মধুর,
কী সুন্দর এই নকশী কাঁথা
বাংলা নববধুর।

বাল্য থেকেই কত রূপ আমি
দেখেছি এই বাংলার
হাজার দেখলেও এই রূপ যেন
ফুরাতে চায় না আর।

যতই দেখি ততই যেন
কমে না মনের চাওয়া,
দেখতে দেখতে বাংলাকে বলি
এ তোমার কেন এত মায়া।

বাংলায় আমি হয়েছি বড়
বাংলাই আমার মা,
এই বাংলা ছাড়া যেন আমার
মরণ হয় না।

Memories

Fariha Mutahara
Classs: XII, Roll: 30768

A great thing about
pictures are:
they remain the same
even if people change.

Some sort of magic
makes us recall memories
which are now tragic.

Some lines are meant
to be unsaid.
I hope you wan't get lost
finding the non-existing key
of mysterious gate!
Flashbacks are devastating,
but let's not become numb
in order to forget
what we have done.

Nevertheless, you can always
look through the invisible ray
from there
you might get back a day

Sitting somewhere till dawn
you ask yourself 'Where did I go wrong?
Self centered people let you drown;
eventually you realize the fact
you're the one who needed to be warned.

তথ্য বিচিত্রা

জানা অজানা কিছু তথ্য

আহমেদ মাদানী
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৩৯৬১

- স্টেরিফ নামে প্যারাগুয়েতে এমন একটি মাছ আছে যার স্বাদ চিনি অপেক্ষা ৩০০ গুণ বেশি মিষ্টি।
- ত্রিশ কোটি বছর আগে ফড়িং ছিল বাজ পাখির সমান।
- শুক্র একমাত্র গ্রহ যেটি ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরে।
- হাঙরের ৯টি প্রজাতি রয়েছে।
- পৃথিবীতে প্রায় ৪০০০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে।
- কুকুরের জিহ্বা ১৭০০ রকম স্বাদ গ্রহণ করতে পারে।
- হাতির হৃদকম্পন হয় মিনিটে ২৫ বার।
- জার্মানীতে তিন মাসের শিশুকে সাঁতার শিখানো হয়।
- ভারতের রাজস্থানে ইঁদুরের মন্দির আছে।
- একটি কবুতরের হাড়ের ওজনের চেয়ে পালকের ওজন বেশি।
- প্রজাপতির কোন ফুসফুস নেই।
- একটি মুরগি সর্বোচ্চ ১৫ সেকেন্ড উড়তে পারে।
- পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে, তার মধ্যে মানুষের মুখে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বেশি।
- কটাপেক্সি পৃথিবীর উচ্চতম আগ্নেয়গিরি।
- দক্ষিণ আফ্রিকার সেৎমি মাছির কামড়ে মানুষ কাঁপতে কাঁপতে মারা যায়।
- পৃথিবীর সবচেয়ে অলস প্রাণী স্লথ।
- কাঠবিড়ালি লাল রং দেখতে পায় না।
- প্রজাপতি পা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করতে পারে।
- পিঁপড়ার মগজ তার দেহের চেয়ে বড়।
- "হামিং বার্ড" প্রতি মূহুর্তে রং বদলায়।
- গ্রিসের ফোরিস এথেন্স দ্বীপে কোন নারী নেই।

Weird Truth

নাজিফা ইসলাম
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩২৭৮৫

- আসল টাইটানিক জাহাজ তৈরি করতে খরচ হয়েছিল ৭ মিলিয়ন ডলার, কিন্তু টাইটানিক ছবিটি তৈরি করতে প্রয়োজন হয়েছিল ২০০ মিলিয়ন ডলার।
- সারা বিশ্বে কোকাকোলা এর প্রস্তুত প্রণালী মাত্র দুইজন জানেন এবং তাদের একই প্লেনে এ যাওয়া আসা করা নিষিদ্ধ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন ডিজাইনের কলম সংগ্রহ করতেন। কিন্তু সেগুলো তিনি কখনও লেখার জন্য ব্যবহার করতে না। জমিয়ে রাখতেন।
- নোবেল জয়ী মাদাম কুরি প্রায় প্রতিদিন বিভিন্নভাবে একবার করে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করতেন।
- ১ পাউন্ড মাকড়সার জালের তন্তুকে সাজালে দু'বার পৃথিবী ঘুরে আসা যাবে।
- তুরী চন্ডাল নামক গাছ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে।
- ইসরাইল নামক দেশটি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি।
- বিশ্বের একমাত্র মগজের যাদুঘর আছে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞান বিভাগে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের মগজ সংগ্রহ করে এখানে রাখা হয়েছে।
- বানরের মাথায় দুইটি মগজ আছে।

মিথ্যা একবার বললে তার আকৃতি ক্রমশ বৃহৎ হতে থাকে-এডমন্ড বার্ক

প্রাণিজগৎ

আসিফ আহমেদ
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৩৮৮৪

আমাদের এই জগৎ অদ্ভুত রহস্যে পরিপূর্ণ। এই রহস্যের পেছনে রয়েছে প্রাণীদের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও বৈজ্ঞানিক কারণ। বিধাতা তাঁর অসীম প্রজ্ঞা ও মেধার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন এই রহস্যময় প্রাণীজগৎ। ঠিক এরকমই কিছু রহস্যময় তথ্য নিচে উপস্থাপন করা হলো:

- প্রত্যেকটি জীব পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয় এবং বিশ্রামের জন্য ঘুমায় কিন্তু পিঁপড়া এমন একটি প্রাণী যা কখনও ঘুমায় না।
- বিস্ময়কর হলেও সত্য, হাতি ভালো সাঁতার কাটতে পারে। এরা অনায়াসে ঘণ্টায় প্রায় দু'মাইল বেগে সাঁতরাতে পারে।
- বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয় যে প্রাণিটির জন্য তা হচ্ছে মশা।
- একটি শিম্পাঞ্জী আয়নায় তার চেহারা নিজে শনাক্ত করতে পারে, কিন্তু বানর একই প্রজাতিভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তা পারে না।
- আমরা জানি উট হলো মরুভূমির জাহাজ। উট দীর্ঘদিন পানি না খেয়ে বাঁচতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য হলো এই যে, ইঁদুর উটের চেয়ে বেশি দিন পানি না খেয়ে থাকতে পারে।
- আমাদের সমাজে অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্বের পরিচয় মেলে। জানা যায় যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের চুলে জিঙ্ক ও কপার এর পরিমান বেশি।
- খাদক হিসেবে ভয়াবহ প্রাণি হচ্ছে সিল্ক ওয়ার্ম। এরা মাত্র ৫৬ দিনে নিজের ওজনের ৮৫০০ গুণ বেশি ওজনের খাবার খেয়ে থাকে।
- তুষার চিতা এক লাফে ৪৮ ফুট (১৬ মিটার) দুরত্ব পেরিয়ে যেতে পারে। এরা পাহাড় বেয়ে উঠতে পারে টানা ২০০০০ ফুট।
- পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর সরীসৃপ হলো ইউরোপীয় গ্রিন লির্জাড। এটি ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম লিজার্ড।
- তেলাপোকার প্রিয় খাদ্য হলো-খামের ও ডাকটিকিটের পেছনের আঠা।
- কবুতর হচ্ছে একমাত্র পাখি, সে পানি শুষে পান করে। অন্যান্য পাখিরা পানিতে ঠোঁট ডুবিয়ে মাথাটা পেছনে ঝাঁকিয়ে পান করে।
- জিরাফই একমাত্র প্রাণি যে শব্দ করতে পারে না। কারণ জিরাফের গলায় শব্দ উৎপাদন সক্ষম "ভোকালকর্ড" নেই।
- প্রজাপতি বর্ণিল পাখা মেলে যখন ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায় তখন আবাল বৃদ্ধ বনিতার মনে নান্দনিক পুলক অনুভূত হয়। প্রজাপতির এই নান্দনিক সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে নানা ছড়া কবিতা রচিত হয়েছে। কিন্তু সুন্দর এই প্রজাপতি যখন বাচ্চা থাকে তখন এটি দেখতে "বিহা পোকার" মতো যা অত্যন্ত বিষাক্ত।
- আফ্রিকার কৃষ্ণ হরিণ কখনও পানি পান করে না।
- উটের চোখের পাতা তিন স্তরের যা তাদের মুরুভূমির বালু ঝড় থেকে সুরক্ষা দেয়।
- পাখির মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন হলো স্তাইন টেইল সুইফট। প্রতি ঘণ্টায় ২২০ মাইল উড়তে পারে।
- হাঙ্গরের নাম "শার্ক" একটি জার্মান শব্দ থেকে আসা। জার্মান ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে "ইতর"।
- ১৮৮ ডেসিবল মাত্রার নীল তিমির শিস কোনো প্রাণির মুখে নি:সৃত সবচেয়ে শক্তিশালী শব্দ। এরাই একমাত্র জলজ প্রাণি যারা গান পছন্দ করে।
- আমাজান নদীর থ্রেতফিস মাছ পানি থেকে শূণ্যে লাফ দিয়ে ভেসে থাকা অবস্থায় ডিম পাড়ে।
- উরু ভেয়েস মাছ আকাশে উড়তে পারে।
- স্যারোমুডেসা হচ্ছে একপ্রকার সামুদ্রিক কীট যারা তাদের সমগ্র জীবন কাটায় কোন সমুদ্রের শৈবালের কান্ডের উপর বসে।
- "বাবা" শব্দটি প্রত্যেকের কাছেই অনেক শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা হচ্ছে সামুদ্রিক মাছ "Sea Horse" যা সন্তানকে রক্ষার জন্য মা মাছ ডিম পাড়ার পর ডিমগুলোকে সযত্নে মুখে আটকে রাখে এবং ডিম ফুটার পূর্ব পর্যন্ত ১৫-২০ দিন কোন খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করে না। ডিম ফুটে যখন শিশু "Sea Horse" বের হয়ে আসে তখনই বাবা "Sea Horse" মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার অপূর্ব একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে সামুদ্রিক "Sea Horse"। তাই এ প্রাণিটি হলো পৃথিবীর "শেষ্ঠ বাবা" বা "Great Father"।

বিচিত্র পৃথিবী

নিশাত ইসলাম
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩১৪৮৫

বইয়ের ওজন ১৫০ কেজি: "Atlas: The Earth Platinum" নামের একটি বইয়ের ওজন ১৫০ কেজি। এ বইটির দৈর্ঘ্য ১.৮ মিটার ও প্রস্থ ২.৭ মিটার। শুধু ওজনে নয় আকারেও এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বই। ২০১২ সালে প্রকাশিত এই বইটির প্রকাশক অস্ট্রেলিয়ার মিলেনিয়াম হাউজ। ১২৮ পাতার এই বইয়ের ৬১ পাতা জুড়ে রয়েছে মানচিত্র। আর ছবি রয়েছে ২৭টি পাতায়। মোট ১২ হাজার ছবির কোলাজ স্থান পেয়েছে সেখানে। মানচিত্রের এ বইটি ছাপানো হয়েছে মাত্র ৩১ কপি।

১০ বছরেই সর্বোচ্চ আইকিউ: বয়স মাত্র ১০, কিন্তু এ বয়সেই মেনসা আইকিউ টেস্টে সর্বোচ্চ ১৬২ স্কোর করেছে যুক্তরাজ্যের আহিল জোহের। মেনসা আইকিউ টেস্টটি হয় ১৬২ স্কোরের মধ্যে। অর্থাৎ সর্বোচ্চ যতটুকু অর্জন করা সম্ভব তাই করে দেখিয়েছে ইংল্যান্ডের ব্ল্যাকবার্ণ থেকে আসা এ ছেলেটি। এ পর্যন্ত মাত্র ১ শতাংশ মানুষ এ বিরল কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে। যার অর্থ বিল গেটসের ও আইনস্টাইনের চেয়েও আহিলের বুদ্ধিমত্তা বেশি।

পানির উপরে অনায়াসে হাঁটা: পানির উপরে স্বচ্ছন্দে হেঁটে গোটা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন স্লোভাকিয়ার ২৮ বছরের লেনকা টানার। প্রথমে সবাই ভাবতেন লেনকা হয়তো জাদু জানেন, কিংবা পানির নিচে নিশ্চয়ই বরফের চাঁই আছে। কিন্তু অনেক পরীক্ষার পর দেখা যাচ্ছে পানির উপর দিয়ে হেঁটে, ছুটে বেড়াচ্ছেন তিনি। প্রায় ২০ বছরের সাধনার পর তিনি পানিতে হাঁটার এই কায়দা রপ্ত করেছেন।

বিচিত্র

তাজবি-উল হোসেন মিশর
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৩৭২৪

আরো তিন সুপার পৃথিবী: পৃথিবী থেকে মাত্র ২১.২৫ আলোকবর্ষ দূরে একটি গ্রহজগতের (প্ল্যানাটরি সিস্টেম) সন্ধান পান জ্যোতির্বিদরা। আর সেখানে রয়েছে তিনটি সুপার পৃথিবী। এ তিন সুপার পৃথিবী একটি ছোট উজ্জ্বল নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এর বাইরে সেখানে বিশালাকৃতির আরেকটি গ্রহ আছে। 'এম' আকৃতির এ গ্রহজগৎটি বিষুবরেখার উত্তর গোলার্ধে 'ক্যাসিওপিয়া' নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তরালে রয়েছে। এ চারটি গ্রহ যে নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, গবেষকরা তার নাম দেন HD 219134। কক্ষপথের সবচেয়ে কাছে অবস্থিত প্রথম সুপার-পৃথিবীর নাম দেয়া হয়েছে HD 219134b। নিজ অক্ষে ঘুরে আসতে এর সময় লাগে তিন দিন। দ্বিতীয়টির সময় লাগে ৬.৮ দিন, আর তৃতীয়টির সময় লাগে ৪৭ দিন।

নিজের কপালে লাথি: নিজের কপালে এক মিনিট সময়ের মধ্যে ১৩৪ বার লাথি মেরে নেপালি কিশোর পুসকার নেপাল গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তুলেছে। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে সে এ রেকর্ড গড়লেও সম্প্রতি তা গিনেজ রেকর্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কর্তৃপক্ষ।

পানযোগ্য বই: বইয়ের পাতা দিয়ে পানি বিশুদ্ধকরণের এক উপায় আবিষ্কার হয়েছে। বিশেষ এই বইয়ের নাম দেয়া হয়েছে Drinkable Book বা পানযোগ্য বই। এতে লেখা আছে, কেন এবং কীভাবে পানি বিশুদ্ধকরণ প্রয়োজন। সেটি জানার পাশাপাশি পানি বিশুদ্ধ করার কাজেও ব্যবহার করা যাবে এর পাতাগুলো। এর প্রথম পরীক্ষমূলক ব্যবহার সফল হয়েছে। পরীক্ষণে বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ঘানার ২৫টি দূষিত উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করে এ পানযোগ্য বইয়ের পৃষ্ঠা ব্যবহার করার পর দেখা গেছে, পানি থেকে শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশি ব্যাকটেরিয়া দূরীভূত হয়েছে।

এস.এম.তাহির জামান
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩০৮০০

ক্ষুদ্রতম বই: পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম বই হিসেবে ধরা হয় লম্বা-চওড়ায় মাত্র সাড় তিন মিলিমিটার বর্গাকৃতির একটি বইকে। যা একটি কয়েনের চেয়েও ছোট। এই বইটির জন্ম ১৯৫২ সালে জার্মানির মেইঞ্জ শহরে। সুতার সেলাই ও কালো চামড়ায় মোড়ানো বইটি ছাঁচের অক্ষরে মুদ্রিত। এতে রয়েছে ৭টি ভাষায় ইশ্বরের প্রার্থনা। ভাষাগুলো হলো-আমেরিকান ও ব্রিটিশ ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, ওলন্দাজ, স্প্যানিশ ও সুইডিশ। প্রতি পৃষ্ঠায় ছাপা অংশের দৈর্ঘ্য আধা ন্যানোমিটারেরও কম।

বিড়াল-দ্বীপ: জাপানের আসিমা দ্বীপকে বিড়াল-দ্বীপ বলা হয়। কারণ এখানে বিড়ালের সংখ্যা ১২০। অর্থাৎ ৬টি বিড়াল প্রতি একজন মানুষ। ১৯৪৫ সালে এখানে বাস করতেন প্রায় ৯০০ জন মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ধীরে ধীরে কাজের সন্ধানে শহরে চলে যেতে থাকেন এই আসিমা দ্বীপের লোকজন। আসিমার বিড়ালরা পোষা বিড়ালের মতো আদুরে নয়। এরা নিজেরাই বৈরী প্রকৃতির সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকে। খাবার যোগাড় করে খায়।

শ্রীলঙ্কার প্রথম রাজা এক বাঙালি: শ্রীলঙ্কার আদি নাম সিংহল। বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে প্রাচীন বাংলার এক রাজপুত্রের উপাধি থেকে শ্রীলঙ্কার নামকরণ করা হয় সিংহল। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগের ঘটনা। খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৩ সালে বিজয়সিংহ নামের এক বাঙালি যুবক ভারত-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে শ্রীলঙ্কা বিজয় করেছিলেন। তখন শ্রীলঙ্কার আদিবাসীরা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। বিজয় সিংহ তাঁদের একত্রিত করেন এবং তাঁর নামানুসারে দেশটির নামকরণ করা হয় সিংহল। সিংহলের আদিবাসীরা বিজয় সিংহকে বেশ ভালোভাবেই বরণ করেছিল। বিজয় সিংহই হলেন শ্রীলঙ্কার প্রথম রাজা। তাঁর সম্পর্কে জানা যায় তিনি দক্ষিণ বাংলার অধিবাসী ছিলেন। অনুমান করা হয় তিনি বরিশাল অথবা চট্টগ্রামে জন্মেছিলেন। বিজয় সিংহ-এর কাহিনি লিপিবদ্ধ রয়েছে শ্রীলঙ্কার প্রাচীন সব পুস্তকে। শ্রীলঙ্কার প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে বিজয় সিংহ-এর ঘটনা বেশ গুরুত্বের সাথেই উল্লেখ রয়েছে। বিজয় সিংহ এবং তাঁর পরবর্তী বংশধরদের কারণে সিংহলী ভাষার সাথে বাংলা ভাষার অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। ভাষা ছাড়াও সিংহলিদের জীবনাচার খাদ্যাভ্যাস এমনকি দৈহিক অঙ্গভঙ্গি অনেকটা বাঙালি স্বভাবজাত। সিংহলিরা প্রায় সকলেই বৌদ্ধ। এর কারণ সেই সময় বাঙালিরা প্রায় সবাই বৌদ্ধ ছিল।

কবুতর যেভাবে পত্র পৌঁছে দিয়ে আপন ঘরে ফিরে আসত: সেই প্রাচীনকাল থেকেই কবুতরকে ব্যবহার করা হতো পত্রের বাহক হিসেবে। কবুতর পত্র নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে আবার আপন ঘরে ফিরে আসত। কিন্তু কীভাবে? এর উত্তর রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা দলের কাছে। গবেষণা দলটি কবুতরের মস্তিষ্কে বেশ কিছু কোষ সনাক্ত করেছেন। এগুলো চৌম্বকক্ষেত্রের গতিপথ, তীব্রতা ও মেরুর সংকেত দেয়। এ কারণে কবুতর যেখানেই থাকুক নিজের অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখে। কবুতরের মস্তিষ্কে থাকা এই কোষগুলোকে জিপিএস সেল বলা হয়। এই জিপিএস সেল এক ধরণের প্রাকৃতিক জিপিএস সেল যা যান্ত্রিক জিপিএস সেলের মতোই স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে পারে। GPS= Global Positioning System। কবুতরের মতো অন্যান্য অতিথি পাখিরা যারা হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে আসে আবার ফিরে যায় আগের জায়গায় তাদের মস্তিষ্কেও আছে এই প্রাকৃতিক জিপিএস সেল।

ওয়ালট্ ডিজনি (Walt Disney): ছোটবেলা থেকেই ওয়ালট্ ডিজনি এর আঁকাআঁকির প্রতি ছিল ভীষণ অনুরাগ। জন্মেছিলেন এক দরিদ্র পরিবারে। সংসার চালাতে বাবার সাথে সংবাদপত্র বিক্রি করতেন। স্কুলে যেতেন তবে পড়াশুনা না করে শুধু ছবি আঁকতেন। প্রচন্ড অমনোযোগীতার কারণে তাঁকে স্কুল ছাড়তে হয়। তাঁর বয়স যখন ১৬ তখন শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সব বাদ দিয়ে তিনি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু বয়স কম হওয়ায় তাঁকে সেনাবাহিনীতে নেয়া হয় নি। পরে রেডক্রসে যোগ দেন। চলে যান ফ্রান্সে। সেখানে অ্যাম্বুলেন্স চালাতেন। এরই মধ্যে ডিজনি উপলব্ধি করেন এ ধরনের জীবন তাঁর জন্য নয়। তাঁর জগৎ ছবি আঁকার মধ্যে। ফিরে এলেন বাড়ি। যোগ দিলেন পত্রিকায়। কিন্তু সেখানেও ব্যর্থতা। সম্পাদক সাহেব ডিজনিকে বরখাস্ত করেন। কারণ ডিজনির না ছিল চিন্তা করার ক্ষমতা আর না ছিল উদ্ভাবনী শক্তি। ছোটখাটো স্টুডিওতে কাজ করলেন। নিজে স্টুডিও খুললেন। কিন্তু কোনো কিছুতেই কিছু হল না। শেষে ঝুঁকি নিয়ে চলে এলেন ক্যালিফোর্নিয়া। কার্টুন ফিল্ম তৈরিতে মনোনিবেশ করলেন। ৭ বছর পড়ে রইলেন একেবারে ঘাপটি মেরে। তারপর সবই ইতিহাস। জন্ম দিলেন মিকি মাউসের। তাঁর মিকি মাউসই পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম অভিনেতা যে মানুষ না হয়ে অস্কার লাভ করে। ওয়ালট্ ডিজনি ২২ বার অস্কার জেতেন, যা অস্কার পাওয়ার সর্বোচ্চ রেকর্ড। কিন্তু এই উদ্ভাবনী শক্তি না থাকার কারণেই একদিন তাঁকে সংবাদপত্রের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

জলবায়ু ও পরিবেশ

আফরোজা আনিকা
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩০১৯০

• কোন প্রতিষ্ঠান বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করে?	ইউএনইপি (UNEP)
• বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট অ্যাক্ট গঠিত হয় কত সালে?	২০১২ সাল
• বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে সবচেয়ে দূষিত নগরি কোনটি?	মেক্সিকো সিটি
• কোন দেশ বর্তমানে বেশি গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গত করে?	মেক্সিকো
• বাংলাদেশ পরিবেশ আদালত আইন সর্বপ্রথম কত সালে হয়?	২০০০ সাল
• বিশ্ব পরিবেশ দিবস কত তারিখ?	৫ জুন
• বাংলাদেশ জাতীয় পরিবেশ মেলার আয়োজক কোন প্রতিষ্ঠান?	বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়
• কোনটি গ্রিণ হাউস গ্যাস এর উপাদান নয়?	হ্যালোজেন
• কোন গ্যাস নিম্ন বায়ু মন্ডলের জন্য ক্ষতিকর কিন্তু উচ্চ বায়ুমন্ডলে উপকারী?	ওজোন
• পৃথিবীর কত ভাগ পানি ব্যবহার যোগ্য?	১% এর কম
• ২০১৫ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবস এর আয়োজক দেশ কোনটি?	ইটালি
• কোন গ্যাস বায়ুমন্ডলের স্থায়ী গ্যাস?	ওজোন
• বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৫ এর মূল প্রতিপাদ্য কী?	শতকোটি জনের অপার স্বপ্ন, একটি বিশ্ব করি না নি:স্ব
• প্রাকৃতিক অঞ্চলের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জলবায়ু কোন ধরনের জলবায়ু?	ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু
• বর্তমানে পৃথিবীতে প্রতি মিনিটে কত একর বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে?	৫০ একর
• বিগত ১০০ বছরে বাংলাদেশ থেকে কত বন্যপ্রাণি হারিয়ে গেছে?	এক ডজনের বেশি
• গত ১০০ বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে?	১০-১৫ সেন্টিমিটার
• কোন বনভূমিকে চিরহরিৎ বনভূমি বলা হয়?	নিরক্ষীয় অঞ্চলের বনভূমিকে

পরছিদ্র অন্বেষণকারীর সঙ্গ ত্যাগ কর, সে তোমার দোষ সকলের আগে প্রকাশ করিবে-হযরত আলী (রাঃ)

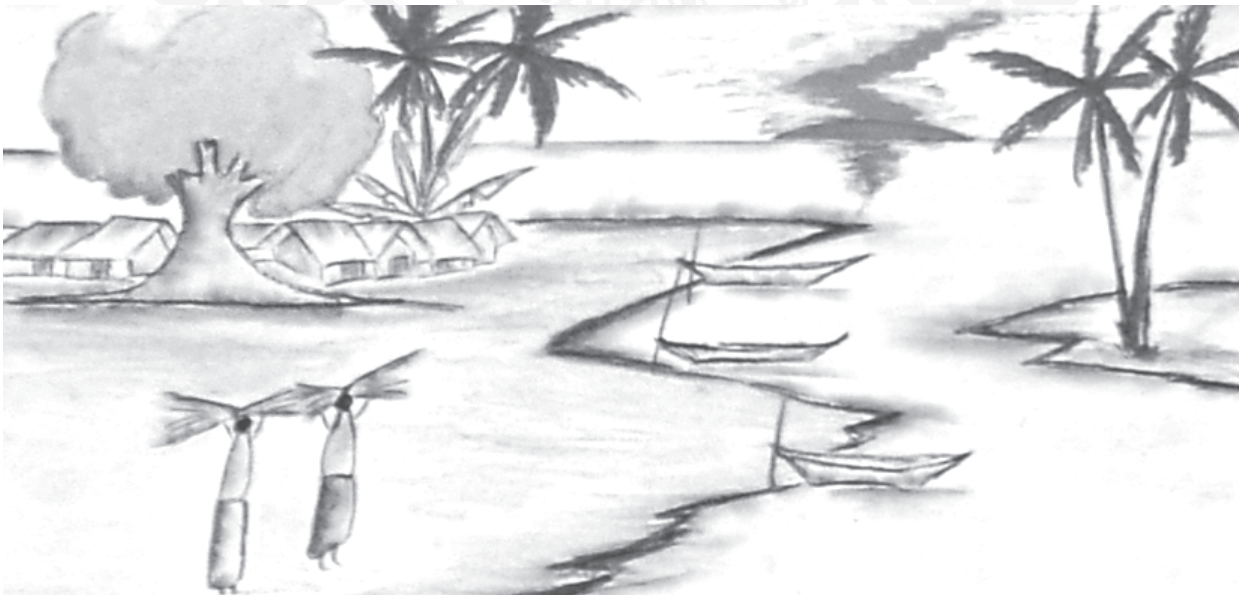

ধাঁধা
কৌতুক
রম্য রচনা

নিজেকে বড় ভাবা যেমন দোষের, নিজেকে ছোট ভাবাও তেমনি দোষের। নিজের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকাই-যুক্তিযুক্ত-বার্ডেন্টিস

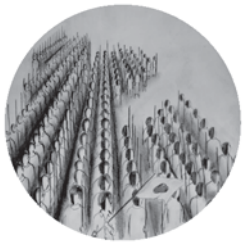

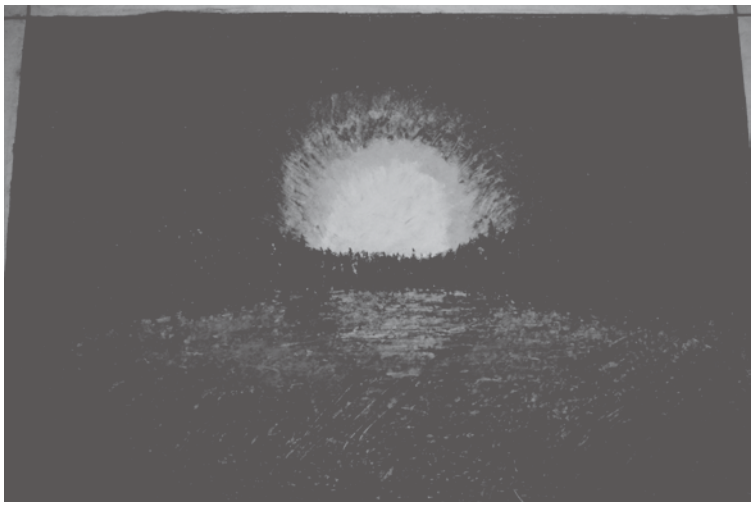

কুমির রচনা

সানিয়া হাসান
শ্রেণি: বিবিএ প্রফেশনাল, রোল: ৩৪২

বাবলু ক্লাস থ্রির প্রথম সাময়িক পরীক্ষার সময় কুমির রচনা লিখেছে। সমস্যা হলো, এরপর যে পরীক্ষাই আসুক সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই কুমিরের রচনাই লেখে। যেমন একবার রচনা এল "বাবা মায়ের প্রতি সন্তানের কর্তব্য"।

তো সে লিখল-

বাবা মা আমাদের জন্ম দেন। তারা আমাদের লালন পালন করেন। কুমিররাও তাই করে। জেনে রাখা ভালো, কুমির একটি সরিসৃপ প্রাণী। এটি জলে বসবাস করে। এর চোখ গোল গোল। কুমিরের পিঠ খাঁজ কাটা, খাঁজ কাটা, খাঁজ কাটা খাঁজ কাটা..... দশ পৃষ্ঠা শেষ।

এরপরের রচনা এল 'আমার প্রিয় শিক্ষক'।

সে লিখল আমার প্রিয় শিক্ষক এর নাম আসাদ।

তাঁর চোখ গোল গোল। কুমিরেরও চোখ গোল গোল। জেনে রাখা ভালো, কুমির একটি সরিসৃপ প্রাণী। এটি জলে বসবাস করে। কুমিরের পিঠ খাঁজ কাটা, খাঁজ কাটা, খাঁজ কাটা খাঁজ কাটা..... দশ পৃষ্ঠা শেষ। শিক্ষক দেখলেন এতো ভারী বিপদ। শেষে তিনি অনেক ভেবে চিন্তে রচনার বিষয় ঠিক করলন, পলাশীর যুদ্ধ। লেখ ব্যাটা এই বার দেখি কি করে তুই কুমিরের রচনা লিখিস।

বাবলু লিখল- ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ এবং বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার মধ্যে যুদ্ধ সংঘাত হয়েছিল। এই যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা তার সেনাপতি মীরজাফর এর উপর ভরসা করে খাল কেটে কুমির এনেছিলেন। জেনে রাখা ভালো, কুমির একটি সরিসৃপ প্রাণী। এটি জলে বসবাস করে। এর চোখ গোল গোল। কুমিরের পিঠ খাঁজ কাটা, খাঁজ কাটা, খাঁজ কাটা খাঁজ কাটা..... দশ পৃষ্ঠা শেষ।

[সংগৃহীত]

রাকিব আহমেদ
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৩৭৪০

❑ **বাবা ও ছেলের মধ্যে আলাপ হচ্ছে।**

বাবা: সব কিছু নিয়ে তর্ক করিস না। আমি তোর বাবা; আমি কি তোর চেয়ে কম জানি?
ছেলে: বাবারা সবকিছুই ছেলের চেয়ে বেশি জানে?
বাবা: অবশ্যই বেশি জানে।
ছেলে: বলতো মাধ্যাকর্ষণ কে আবিষ্কার করেছিলেন?
বাবা: নিউটন।
ছেলে: তাহলে নিউটনের বাবা কেন ওটা আবিষ্কার করতে পাসেনি?

❑ **এক শিক্ষক ক্লাশে ছাত্রদের ভাগ অংক শেখাচ্ছিলেন। এক দুষ্ট ছেলে স্যারকে জিজ্ঞেস করল-**
ছাত্র: এটা কি অংক, স্যার?
স্যার: ভাগ।
এই কথা শুনে দুষ্ট ছেলেটি বই খাতা নিয়ে ক্লাস থেকে চলে যেতে উদ্যত হলো। ওর কান্ড দেখে শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন।
স্যার: কী ব্যাপার তুমি বই খাতা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? আমার ক্লাস তোমার ভাল লাগছেনা?
ছাত্র: হ্যাঁ, স্যার ভালোই তো লেগেছিল, কিন্তু?
স্যার: কিন্তু আবার কী?
ছাত্র: না মানে আপনিই তো বললেন ভাগ, তাই আমি ভাগছিলাম।

❑ **বিজ্ঞান শিক্ষক: বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন খুবই প্রয়োজনীয় উপাদান, আবিষ্কার হয়েছিল ১৭৭৩ সালে।**
তানজিল: কী বাঁচাই না বেঁচে গেলাম, ভাগ্যিস আমার জন্ম সেই সময়ে হয়নি। তা না হলে তো অক্সিজেনের অভাবে মারা যেতাম।

❑ **শিক্ষক: হোয়াট ইজ ইউর মাদারস নেইম?**
ছাত্র: আমার মায়ের নাম আশাপূর্ণ স্যার।
শিক্ষক: আমি তোমাকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করেছি। তুমি বাংলায় উত্তর দিচ্ছ কেন? ইংরেজি বল।
ছাত্র: মাই মাদারস্ নেইম ইজ হোপফুল।

❑ **মা ও ছেলের কথোপকথন-**
মা: তানজিল তোমাকে গত সপ্তাহে যে নতুন জুতা কিনে দিলাম তা পরছো না কেন?
ছেলে: মা, দোকানদার কী বলল তুমি শুনতে পাও নি?
মা: কেন কী বলেছেন?
ছেলে: বলেছে জুতা প্রথম সপ্তাহে পায়ে দিলে একটু ব্যথা লাগবে। তাই আমি পরের সপ্তাহ থেকে পায়ে দিব।

❑ **১ম বন্ধু: কিরে রাকিবের জন্মদিনে কী দিবি তুই?**
২য় বন্ধু: আমি এবার ওকে একটা ডিকশনারি দেব বলে ভাবছি।
১ম বন্ধু: এতকিছু থাকতে ডিকশনারি কেন?
২য় বন্ধু: গত বার ওর জন্মদিনে গিফট দেওয়ার পর ও বলল; ধন্যবাদ দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। এবার যাতে ভাষা খুঁজে পায় তাই এই ডিকশনারি দিবো।

নিশাত আরবী
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩২৯২৬

❑ **ক্লাসে শিক্ষক বাবলুকে জিজ্ঞাসা করছেন**
শিক্ষক: কিরে বাবলু তোর প্রিয় বাদ্যযন্ত্র কী?
বাবলু: স্যার, ছুটির ঘণ্টা।

❑ **দুই বন্ধুর কথোপকথন।**
বাবলু: দোস্ত যা তো ছাদের গাছগুলোতে পানি দিয়ে আয়।

রহিম: কিন্তু বাইরে তো বৃষ্টি পড়ছে।
বাবলু: কোনো সমস্যা নাই, ছাতা নিয়ে যা।

❑ **জলিল ও স্যারের মধ্যে কথা**
স্যার: বলতো বাংলায় কাল কত প্রকার?
জলিল: স্যার ৪ প্রকার।
স্যার: কি কি?
জলিল: ১. গতকাল ২. সকাল ৩. বিকাল ৪. আগামীকাল।

❑ **বাবলু আর শিক্ষকের মধ্যে কথা**
শিক্ষক: বাবলু, তুই এত দেরি করলি কেন? ক্লাস কয়টায়?
বাবলু: স্যার আমার তো কোনো দোষ নেই। রাস্তার পাশের বোর্ডের লেখা দেখে দেরি হল।
শিক্ষক: কি লেখা ছিল?
বাবলু: সাবধানে এবং ধীরে চলুন। সামনে স্কুল।

❑ **বাবলু আর শিক্ষক**
শিক্ষক: বলতো পৃথিবীতে মোট কয়টি দেশ?
বাবলু: স্যার, ১টা।
শিক্ষক: কীভাবে?
বাবলু: কারণ, বাকিগুলো তো সব বিদেশ।

❑ **স্যার: যদি এমন একটা সময় আসে, যখন আগুন জ্বালানোর কিছু না থাকে তখন কি করবি?**
বাবলু: খুব সহজ স্যার। চুলার মধ্যে রবি সিম দিয়ে বলব, জ্বলে উঠো আপন শক্তিতে।

সুমাইয়া আক্তার মেঘলা
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩০৫৯৪

❑ **মন্টু একদিন দুপুরে বসে আছে। হঠাৎ একটা মশা এসে মন্টুকে কামড় দিলো।**
মন্টু: (রেগে গিয়ে) এখন দিনের বেলায়ও কামড় দিতে হবে?
মশা: কি করমু সাহেব! গরীব মশা আমি, মা বাবা হাসপাতালে ভর্তি, বোনের বিয়ে ঠিক হইছে ছেলে পক্ষ ১ লিটার রক্ত যৌতুক চাইছে। তাই ওভারটাইম করতাছি।

❑ **বাবা ছেলেকে নতুন জুতা কিনে দিয়ে বললো সিড়ি দিয়ে ওঠার সময় দুটো করে উঠবি। এতে জুতার উপর চাপ কমবে, জুতা বেশিদিন টিকবে।**
কিন্তু ছেলে বাবার চেয়ে এক ডিগ্রী উপরে। সে তিনটা করে উঠতে লাগলো। উঠার পর বাবা ছেলেকে জোরে একটা চড় মারলো। পাশের বাসার মহিলা দেখলেন
মহিলা: এতটুকু বাচ্চাকে আপনি মারলেন কেন?
বাবা: ওকে বলেছি দুইটা সিড়ি করে উঠতে তাহলে জুতা বেশিদিন টিকবে। কিন্তু ও তিনটা করে উঠলো!
মহিলা: আপনার তো খুশি হওয়ার কথা।
বাবা: কীভাবে খুশি হবো বলেন? ও ২০০ টাকার জুতার তলা বাঁচাতে গিয়ে ৮০০ টাকার প্যান্টের তলা ছিঁড়ে ফেলেছে।

তানভীর হোসেন নাহিদ
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৩৯১৬

অল্পদিলে ভালো লাগে না, বেশি দিলে বিষ,
শ্বাশুড়ি বলে বউকে আন্দাজ মতো দিস।
- লবণ।

সকালে জন্মলাভ বিকেলে মরণ,
তার অভাবে সর্বজীবের বিফল জীবন।
- সূর্য।

কালিদাসের হেঁয়ালির ছন্দ,
দরজা আছে হাজারটা তবু মানুষ বন্ধ।
- মশারী।

বন থেকে এল টিয়ে,
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।
- আনারস।

ছোট একটি মামা, গায়ে তার হাজার জামা।
- পেঁয়াজ।

সবুজ বুড়ি হাটে যায়,
নিত্য হাটে চিমটি খায়।
-লাউ।

বিধবা না হইয়াও পরে সাদা শাড়ী,
নায়না-খায়না তবু সে সুন্দরী।
- রসুন।

পাখা নাই উড়ে চলে, সুখ নাই ডাকে,
বুক চিরে আলো ছুটে, চিনে সবাই তাকে।
- মেঘ।

কোন দেশে মাটি নাই।
-সন্দেশে।

একটি গাছে এক বুড়ি চোখ তার বারো কুড়ি।
- আনারস।

কোন ব্যাংকে টাকা থাকে না
ধার কখনও পাওয়া যায় না?
- ব্লাড ব্যাংক।

বাকলে আনে দড়ি-পাতায় তরকারী
খড়িতে লাকড়ীর যোগান এটা খুব দরকারী
-পাটগাছ।

এক থালা সুপারী গুণতে পারে কোন ব্যাপারী
- আকাশের তারা।

-সংগৃহীত

যারীন তাসনীম
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩২৬৭৫

❑ **এক রোগী গিয়েছে ডাক্তারের কাছে–**
রোগী: ডাক্তার সাহেব, আমি সব কিছু দুটো দেখি।
ডাক্তার: চেয়ারটাতে বসুন, তারপর বলুন।
রোগী: কোন চেয়ারটায় বসবো, ডানের টায় না বাঁয়ের টায়?

❑ **স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা চলছে। গেটে নোটিশ টাঙানো হয়েছে, বইপত্র দারোয়ানের কাছে জমা না রেখে ঢোকা নিষেধ। এক ছেলে কাঁদছে বলে দারোয়ান বলছে-**
দারোয়ান: কাঁদছো কেন?
ছেলে: আমি যে পরীক্ষা দিতে পারব না। বাসা থেকে বই আনিনি। বই জমা দিতে না পারলে ঢুকব কীভাবে?

❑ **ঢাকা জাদুঘরে গ্রামের এক লোক ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে একটা চেয়ার দেখে বসে পড়ল- তাই দেখে এক কর্মচারী ছুটে এল।**
কর্মচারী: আরে আরে করছেন কী? জলদি ওঠেন, এটাতো নবাব সিরাজউদ্দৌলার চেয়ার।
লোক: একটু বসি না! সিরাজউদ্দৌলা আইলে না হয় উইঠা যামু নে!

মোঃ সাব্বির ইসলাম
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩২৪০৪

❑ **১ম ব্যক্তি: তোমার বংশে এ যাবৎ কোনো বড় মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন? আমাদের বংশে এমন এক ব্যক্তি আছেন।**
২য় ব্যক্তি: না ভাই, আমাদের বংশে এ যাবৎ কোনো বড় মানুষ জন্মায় নি, শুধু শিশুরাই জন্ম নিয়েছে।

❑ **১ম ব্যক্তি: ভাই, বাইরে কী বৃষ্টি হচ্ছে?**
২য় ব্যক্তি: বৃষ্টি তো বাইরেই হয়। কেন আপনাদের এলাকায় কি বৃষ্টি ঘরে হয়?

❑ **ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে কথা**
শিক্ষক: বলতো কী খেলে দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায়?
ছাত্র: ঘাস, লতাপাতা।
শিক্ষক: আমার সঙ্গে ফাজলামো করছ?
ছাত্র: স্যার, ফাজলামো করব কেন! ছাগল আর গরুর চোখের দিক লক্ষ্য করলে দেখবেন ওরা চশমা পরে না।

❑ **ভিক্ষুক ও এক ব্যক্তির মধ্যে কথা–**
ব্যক্তি: এই যে তুমি ভিক্ষা চাইছ, কীভাবে বুঝব যে তুমি কানা?
ভিক্ষুক: ওই যে দূরে একটা কুকুর দেখছেন, ওইটা আমি দেখছি না।

মোঃ জুয়েল
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩১৭৫৩

দুই বন্ধুর মধ্যে কথা হচ্ছে–
এক বন্ধু রাত ২:৩০ মিনিটে আরেক বন্ধুর কাছে ফোন করেছে-
১ম বন্ধু: দোস্ত, একটু আমার বাসায় আয়, জরুরি কাজ আছে।
২য় বন্ধু: আমি এখন আসতে পারব না, ঘুম পাচ্ছে।
১ম বন্ধু: প্লিজ আয় না! জরুরী কাজ আছে।
২য় বন্ধু: আসতে পারব না বললাম না? খুব ঘুম পাচ্ছে-গুড নাইট!
(ফোন অফ)
কিছুক্ষণ পর সে ভাবল হয়ত খুব জরুরী কাজ হবে, সে বন্ধুর বাসায় গেল।
২য় বন্ধু: কীরে, কী জরুরী কাজ এত রাতে?
১ম বন্ধু: দোস্ত, টিভি ও লাইটের সুইচটা একটু অফ করে দিয়ে যা প্লিজ। খুব শীত লাগতেছে তো তাই তোকে ফোন করলাম।

আকিব আহমেদ কৌশিক
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৩৯৯৪

❑ **শিক্ষক: কিরে তোর মাথা ফাটল কীভাবে?**
ছাত্র: আমি হাত দিয়ে দেয়াল ভাঙছিলাম।
শিক্ষক: তোর মাথা ফাটল কীভাবে?
ছাত্র: মা দেখে বললেন; আরে বোকা মাথাটা কাজে লাগা।

❑ **মাছ কিনতে মকবুল গেছে বাজারে**
বিক্রেতা: এই নাও ওজনে একটু কম দিলাম। বাড়ি নিয়ে যেতে সুবিধা হবে।
মকবুল: এই নিন টাকা।
বিক্রেতা: সেকি মাত্র ২০ টাকা।
মকবুল: না, মানে টাকা একটু কম দিলাম, গুনতে সুবিধা হবে।

আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩২৩৯৩

❑ **পল্টু কোনো দিন পড়া পারে না। কিন্তু সেদিন হঠাৎ জীববিজ্ঞান ক্লাসে শিক্ষক পড়া ধরায় হাত তুললো সে।**
স্যার: আরে বাহ্ পল্টু বলতো সালোকসংশ্লেষণ কাকে বলে?
পল্টু: (মাথা চুলকে) স্যার পড়ে এসেছি। কিন্তু মনে পড়ছে না।
স্যার: কতটা মনে আছে?
পল্টু: স্যার, শেষের দিকটা।
স্যার: ঠিক আছে। শেষের দিকটাই বল।
পল্টু: একেই সালোকসংশ্লেষণ বলে।

❑ **দৈনন্দিন রাগচর্চা**

সংগীতে অনেক রকম রাগ আছে। সেসব মন মাতানো সুরেলা রাগ সংগীতজ্ঞ ও পন্ডিতদের দখলে। তাঁরা নিয়মিত চর্চা করেন। কিন্তু আমরা যারা ভাঙ্গা গলার মানুষ, সুর বলে কিছুই নেই কণ্ঠে, আমাদেরও দিনে নিদেনপক্ষে কয়েকবার রাগচর্চা করতে হয়। যেমন:

রাগ প্রভাতী: অফিসের তাড়নায় খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে টয়লেটে গিয়ে যখন দেখবেন ট্যাপে পানি নেই, তখন যে রাগটা হবে। ওটার নাম রাগ প্রভাতী।

রাগ মধ্যাহ্ন: সূর্য যখন মধ্যগগনে তেতে থাকে, তখন কার না রাগ হয়? ওটাই রাগ মধ্যাহ্ন।

রাগ অপরাহ্ন: বিকেলের দিকে সাধারণত রাগ অপরাহ্ন চর্চা হয়। বিশেষ করে সারা দিন কাজ করার পর যখন বস এসে বলবেন, কিছুই হয়নি, তখন আসলেই খুব রাগ লাগে!

রাগ গোধূলি: সারা দিন অমানুষিক পরিশ্রম করে অফিসের সব কাজ প্রায় গুছিয়ে ফেলেছেন। কারণ, একটু পরেই ওর সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু বেরসিক বস নতুন একটা ব্রিফ নিয়ে হাজির। তখন যে রাগ চর্চাটা হবে, ওটার নাম রাগ গোধূলি!

রাগ রজনী: সারা দিন অক্লান্ত পরিশ্রম আর সকাল থেকে রাগ চর্চা সেরে রাতে বাসায় ফিরে দেখলেন, কিছুই রান্না হয়নি। বউ বসে বসে সিরিয়াল দেখছে। জিজ্ঞেস করতেই বলল, 'পারব না, রেঁধে খাও, স্বাভাবিকভাবেই তখন আপনার যে রাগচর্চাটা হবে বা করতে ইচ্ছা করবে, ওটার নাম রাগ রজনী।

রাগ মাঝরাত্রি: মোটামুটি দিনের সব রাগচর্চা শেষ করে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে গেছেন, ভুলে গেছেন মশারি খাটাতেও। এরপর মাঝরাতে যখন দেখবেন কোনো কারণে সিলিং ফ্যানটা আর ঘুরছে না, মশারি না থাকার সুযোগটা উপর্যুপরি কাজে লাগাচ্ছে মশা। কানের কাছে মশার সংগীতচর্চায় ঘুম ভাঙার পর যে রাগ হবে- ওটার নাম রাগ মাঝরাত্রি।

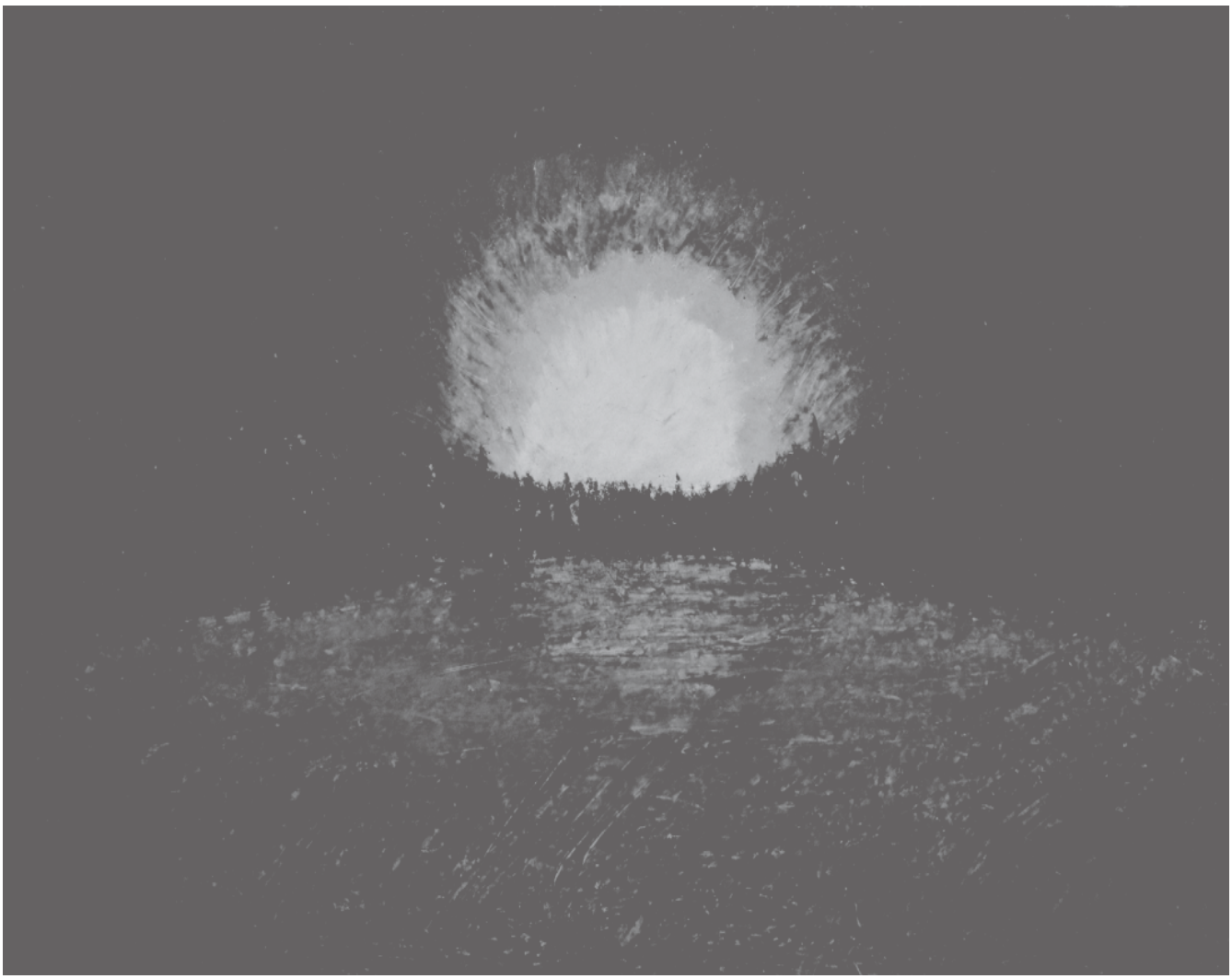

নাম : জেনিফার শবনম
রোল : ৩০১১০
শ্রেণি : দ্বাদশ

চিত্র : সূর্য উদয়

শিক্ষার্থী পরিচিতি
একাদশ শ্রেণি

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

মায়িশা ৩২৬৩৪
আয়েশা ৩২৬৩৫
সুপ্তি ৩২৬৩৬
সওগুফতা ৩২৬৩৭
মিতু ৩২৬৩৮
মাহপারা ৩২৬৩৯
প্রিয়াংকা ৩২৬৪০

সায়মা ৩২৬৪১
সাদিয়া ৩২৬৪২
ফাওজিয়া ৩২৬৪৪
শৈতী ৩২৬৪৫
শিলা ৩২৬৪৬
মায়িশা ৩২৬৪৭
ফাইজা ৩২৬৪৮

আফরিনা ৩২৬৪৯
সাইদা ৩২৬৫০
নোভা ৩২৬৫১
শৈলী ৩২৬৫২
কাশফিয়া ৩২৬৫৩
শাউলি ৩২৬৫৪
শোভা ৩২৬৫৫

রাত্রি ৩২৬৫৬
ছনিয়া ৩২৬৫৭
জাকিয়া ৩২৬৫৮
রুপা ৩২৬৫৯
হুমায়রা ৩২৬৬০
চৈত্রী ৩২৬৬১
আনিকা ৩২৬৬২

ইফাত ৩২৬৬৩
তৃষা ৩২৬৬৪
হিমু ৩২৬৬৫
আসিমা ৩২৬৬৬
সিনথিয়া ৩২৬৬৭
সাবরিনা ৩২৬৬৮
লিখা ৩২৬৬৯

শাম্মী ৩২৬৭০
দিলশাদ ৩২৬৭১
ইসরাত ৩২৬৭২
ফারিয়া ৩২৬৭৩
লামিয়া ৩২৬৭৪
যারীন ৩২৬৭৫
সুমাইয়া ৩২৬৭৬

মিতু ৩২৬৭৭
জেরিন ৩২৬৭৮
আদৃতা ৩২৬৭৯
আনিকা ৩২৬৮০
জেরিন তাসনিম ৩২৬৮১
ইমা ৩২৬৮২
মেহনাজ ৩২৬৮৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

নাফিসা	হাবিবা	অয়ন	সাদিয়া	নেহা	অন্তি	অর্পিতা
৩২৬৮৪	৩২৬৮৫	৩২৬৮৬	৩২৬৮৭	৩২৬৮৮	৩২৬৮৯	৩২৬৯০

মালিহা	তুজ	জারিন	সাইমুন	সাজিয়া	নাহিনা	শিফা
৩২৬৯১	৩২৬৯২	৩২৬৯৩	৩২৬৯৪	৩২৬৯৫	৩২৬৯৬	৩২৬৯৭

সোয়াদ	আয়েশা	অন্তরা	দীনা	ফাহমিদা	সালমা	ফারিহা
৩২৬৯৮	৩২৬৯৯	৩২৭০০	৩২৭০১	৩২৭০২	৩২৭০৩	৩২৭০৪

মেহজাবিন	সাদিয়া	ইলা	লিয়া	অধরা	পূর্ণিমা	তানিয়া
৩২৭০৫	৩২৭০৬	৩২৭০৭	৩২৭০৮	৩২৭০৯	৩২৭১০	৩২৭১১

মুন্নি	স্মৃতি	রেহমা	মাইশা	কেয়া	পপি	আকীদা
৩২৭১২	৩২৭১৩	৩২৭১৪	৩২৭১৫	৩২৭১৬	৩২৭১৭	৩২৭১৮

মহিমা	কনা	লামিয়া	সারা	তনি	তানজীনা	তৃষা
৩২৭১৯	৩২৭২০	৩২৭২১	৩২৭২২	৩২৭২৩	৩২৭২৪	৩২৭২৫

ফারজানা	লিমা	অনামিকা	আইরিন	রুকাইয়া	সাদিয়া	সুমাইয়া
৩২৭২৬	৩২৭২৭	৩২৭২৮	৩২৭২৯	৩২৭৩০	৩২৭৩১	৩২৭৩২

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

নিসু ৩২৭৩৩	নিপুন ৩২৭৩৪	ফারহানা ৩২৭৩৫	মনিষা ৩২৭৩৬	শ্রাবণী ৩২৭৩৭	তানজিলা ৩২৭৩৮	মীম ৩২৭৩৯

শাহরিন ৩২৭৪০	তাজিন ৩২৭৪১	শাপলা ৩২৭৪২	নওরিন ৩২৭৪৩	ফাতেমা ৩২৭৪৪	মীম ৩২৭৪৫	ইমা ৩২৭৪৬

মাহি ৩২৭৪৭	শানজিদা ৩২৭৪৮	জান্নাতুল ৩২৭৫১	সুমাইয়া ৩২৭৫২	কথা ৩২৭৫৩	সানজিদা ৩২৭৫৪	জেবা ৩২৭৫৫

শুভ্রা ৩২৭৫৬	মাকসুদা ৩২৭৫৭	উর্মি ৩২৭৫৮	তাসমিন ৩২৭৫৯	ওয়াফা ৩২৭৬০	হ্যাপি ৩২৭৬১	শ্রাবনী ৩২৭৬২

মিম ৩২৭৬৩	আঞ্জুম ৩২৭৬৪	মৌ ৩২৭৬৫	রাবেয়া ৩২৭৬৬	রান্বেষা ৩২৭৬৭	রিচি ৩২৭৬৮	লাবনী ৩২৭৬৯

ফাইজা ৩২৭৭০	আন্নি ৩২৭৭১	খাদিজা ৩২৭৭২	নোভা ৩২৭৭৩	শামীমা ৩২৭৭৪	অরিন ৩২৭৭৫	আফরিদা ৩২৭৭৬

শ্রাবণী ৩২৭৭৭	ফারহানা ৩২৭৭৮	রোজা ৩২৭৭৯	সাবরিনা ৩২৭৮০	সামিয়া ৩২৭৮১	মাহি ৩২৭৮২	জেরিন ৩২৭৮৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

অহনা
৩২৭৮৪

স্নিগ্ধা
৩২৭৮৫

রাইয়ান
৩২৭৮৬

শামীমা
৩২৭৮৭

মুন্নি
৩২৭৮৮

কনিকা
৩২৭৮৯

সিথী
৩২৭৯০

রুমা
৩২৭৯১

মহুয়া
৩২৭৯২

সুমাইয়া
৩২৭৯৩

নুসরাত
৩২৭৯৫

দীমা
৩২৭৯৬

সুমাইয়া
৩২৭৯৭

অর্নি
৩২৭৯৮

ফাতেমা
৩২৭৯৯

আনিকা
৩২৮০০

তানিয়া
৩২৮০১

রিয়ানা
৩২৮০২

আফরিন
৩২৮০৩

মেঘা
৩২৮০৪

মীম
৩২৮০৫

খাদিজা
৩২৮০৬

সুমাইয়া
৩২৮০৭

শারমিন
৩২৮০৮

মিষ্টি
৩২৮০৯

অনিকা
৩২৮১০

সিফাত
৩২৮১১

আরিফা
৩২৮১২

তানজিলা
৩২৮১৩

লাবনী
৩২৮১৪

মেহেনাজ
৩২৮১৫

সুমা
৩২৮১৬

সানজিদা
৩২৮১৭

তামান্না
৩২৮১৮

সানজিদা
৩২৮১৯

মুন
৩২৮২০

নওশিন
৩২৮২১

তানিয়া
৩২৮২২

নাদিয়া
৩২৮২৩

বর্ষা
৩২৮২৪

ইরা
৩২৮২৫

মিতু
৩২৮২৬

তানজুম
৩২৮২৭

আনিকা
৩২৮২৮

রাত্রি
৩২৮২৯

সুমাইয়া
৩২৮৩০

আমেনা
৩২৮৩১

সায়মা
৩২৮৩২

মালিহা
৩২৮৩৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

তিশা	শ্রাবন্তী	সাবরিনা	নীলা	সুমাইয়া	সায়মা	শারমিন
৩২৮৩৪	৩২৮৩৫	৩২৮৩৬	৩২৮৩৭	৩২৮৩৮	৩২৮৩৯	৩২৮৪০

মাহবুবা	আমেনা	নুসরাত	লাবন্য	এশা	লুবনা	আমিরা
৩২৮৪১	৩২৮৪২	৩২৮৪৩	৩২৮৪৪	৩২৮৪৫	৩২৮৪৬	৩২৮৪৭

শাহরিন	আনিকা	সাবিহা	ফাতেমা	মীম	সুমাইয়া	রাফিয়া
৩২৮৪৮	৩২৮৪৯	৩২৮৫০	৩২৮৫১	৩২৮৫২	৩২৮৫৩	৩২৮৫৪

সাবিহা	নুসরাত	শিশির	সুমাইয়া	জেরিন	তানহা	সাদিয়া
৩২৮৫৫	৩২৮৫৬	৩২৮৫৭	৩২৮৫৮	৩২৮৫৯	৩২৮৬০	৩২৮৬১

শান্তা	মিম	মিশমা	অতসী	ফাবিহা	সালসাবিলা	ইশিতা
৩২৮৬২	৩২৮৬৩	৩২৮৬৪	৩২৮৬৫	৩২৮৬৬	৩২৮৬৭	৩২৮৬৮

সুমাইয়া	মিমি	ইসরাত	রিয়া	জারিন	ফারহানা	তাসজিম
৩২৮৬৯	৩২৮৭০	৩২৮৭১	৩২৮৭২	৩২৮৭৩	৩২৮৭৪	৩২৮৭৫

তানজিয়া	সামিয়া	সাথী	সামিরা	নুরজাহান	উমি	আখি
৩২৮৭৬	৩২৮৭৭	৩২৮৭৮	৩২৮৭৯	৩২৮৮০	৩২৮৮১	৩২৮৮২

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

আমরিন
৩২৮৮৩

রিচি
৩২৮৮৪

অন্তরা
৩২৮৮৫

স্বর্না
৩২৮৮৬

প্রিয়া
৩২৮৮৭

ঐশী
৩২৮৮৮

মুনা
৩২৮৮৯

রোকসার
৩২৮৯০

ফাতেমা
৩২৮৯১

তানজুম
৩২৮৯২

প্রমি
৩২৮৯৩

মাইশা
৩২৮৯৪

দিপা
৩২৮৯৫

তৈয়বা
৩২৮৯৬

নাদিয়া
৩২৮৯৭

সানজিদা
৩২৮৯৮

মিথিলা
৩২৮৯৯

রীম
৩২৯০০

অপি
৩২৯০১

মুনিরা
৩২৯০২

ফাহিমা
৩২৯০৩

তানিয়া
৩২৯০৪

মাকসুদা
৩২৯০৫

সাদিয়া
৩২৯০৬

নুহরী
৩২৯০৭

জান্নাত
৩২৯০৮

লীন
৩২৯০৯

নিশাত
৩২৯১০

মীম
৩২৯১১

তানজিনা
৩২৯১২

দিশা
৩২৯১৩

রুপন্তী
৩২৯১৪

মীম
৩২৯১৫

জয়া
৩২৯১৬

সাদিয়া
৩২৯১৭

রিয়া
৩২৯১৮

মৌরিন
৩২৯১৯

অদ্রি
৩২৯২০

তাসমিয়া
৩২৯২১

জেবা
৩২৯২২

শারমিন
৩২৯২৩

হেনা
৩২৯২৪

শাহিনুর
৩২৯২৫

নিশাত
৩২৯২৬

নুসরাত
৩২৯২৭

নাবিলা
৩২৯২৮

তুলি
৩২৯২৯

প্রনিতা
৩২৯৩১

আহনাফ
৩২৯৩২

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

তিথি	নবা	ইসরাত	তন্বী	ইতি	লিজা	লামিয়া
৩২৯৩৩	৩২৯৩৪	৩২৯৩৫	৩২৯৩৬	৩২৯৩৭	৩২৯৩৮	৩২৯৩৯

নুসরাত	হাফসা	আসমা	বুশরা	সামিহা	পলি	সাদিয়া
৩২৯৪০	৩২৯৪২	৩২৯৪৩	৩২৯৪৪	৩২৯৪৫	৩২৯৪৬	৩২৯৪৭

জোহরা	সুস্মিতা	কানিজ	জান্নাতুল	তমা	সাবিহা	তাজওয়ার
৩২৯৪৮	৩২৯৪৯	৩২৯৫০	৩২৯৫১	৩২৯৫২	৩২৯৫৩	৩২৯৫৪

শাহী	রুমা	নিশা	লাবন্য	প্রমি	মনিরা	আখি
৩২৯৫৫	৩২৯৫৬	৩২৯৫৭	৩২৯৫৮	৩২৯৫৯	৩২৯৬০	৩২৯৬১

সিনথিয়া	হুমায়রা	আকলিমা	তাসমিয়া	সৃষ্টি	মিথিলা	সানি
৩২৯৬২	৩২৯৬৩	৩২৯৬৪	৩২৯৬৫	৩২৯৬৬	৩২৯৬৭	৩২৯৬৮

তাছলিমা	ইসরাত	আন্না	তানিয়া	ফাতেমা	নাফিয়া	সোনিয়া
৩২৯৬৯	৩২৯৭০	৩২৯৭১	৩২৯৭২	৩২৯৭৩	৩২৯৭৪	৩২৯৭৫

পিউ	লামিয়া	অর্নব	নাজমুন	ইমা	আনিকা	ফারজিয়া
৩২৯৭৬	৩২৯৭৭	৩২৯৭৮	৩২৯৭৯	৩২৯৮০	৩২৯৮১	৩২৯৮৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

উর্মি
৩২৯৮৪

ফারিহা
৩২৯৮৫

জেরিন
৩২৯৮৬

সাদিয়া
৩২৯৮৭

ফারিহা
৩২৯৮৮

জান্নাতুল
৩২৯৮৯

অরিন
৩২৯৯০

সালীহুন
৩২৯৯২

নিশাত
৩২৯৯৩

মারিয়া
৩২৯৯৪

জাকিয়া
৩২৯৯৫

শিপা
৩২৯৯৬

ইসরাত
৩২৯৯৭

জয়া
৩২৯৯৮

নাফিসা
৩২৯৯৯

মনি
৩৩০০০

তন্নী
৩৩০০১

নুসরাত
৩৩০০২

মুক্তা
৩৩০০৩

নাঈমা
৩৩০০৪

মীম
৩৩০০৫

জান্নাতুল
৩৩০০৬

রুপা
৩৩০০৭

ঝারা
৩৩০০৮

মিথিলা
৩৩০০৯

রিশাত
৩৩০১০

জেসি
৩৩০১১

অনন্যা
৩৩০১২

ইভা
৩৩০১৩

সাদিয়া
৩৩০১৪

জায়মা
৩৩০১৫

সানজিদা
৩৩০১৬

রুপা
৩৩০১৮

লুবনা
৩৩০১৯

উম্মে কুলসুম
৩৩০২০

সুমাইয়া
৩৩০২১

লাবনী
৩৩০২২

তুবাইশী
৩৩০২৪

আইরিন
৩৩০২৫

জেমি
৩৩০২৬

সামিরা
৩৩০২৭

আফসানা
৩৩০২৮

মাহমুদা
৩৩০২৯

নাবিলা
৩৩০৩০

কল্যানী
৩৩০৩১

ফারহিন
৩৩০৩৩

সুমাইয়া
৩৩০৩৪

সায়রা
৩৩০৩৫

নাবিলা
৩৩০৩৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

আরিফা	সামিহা	ফারিহা	দোলন	মারজিয়া	লিমা	তাবাসসুম
৩৩০৩৭	৩৩০৩৮	৩৩০৩৯	৩৩০৪০	৩৩০৪১	৩৩০৪২	৩৩০৪৩

প্রীতি	ফারহিন	লিখি	ফারিয়া	মনীষা	সারা	সায়মা
৩৩০৪৪	৩৩০৪৫	৩৩০৪৬	৩৩০৪৭	৩৩০৪৮	৩৩০৪৯	৩৩০৫০

ফারহানা	কাকন	নাজিয়া	মিম	শাম্মী	রোকেয়া	আলিশা
৩৩০৫১	৩৩০৫২	৩৩০৫৪	৩৩০৫৫	৩৩০৫৬	৩৩০৫৭	৩৩০৫৮

আফিয়া	ফাতেমা	নুসরাত	প্রিয়ন্তী	ফাতেমা	রাফিয়া	লিমা
৩৩০৫৯	৩৩০৬০	৩৩০৬১	৩৩০৬২	৩৩০৬৩	৩৩০৬৪	৩৩০৬৫

তাছমিন	মিহিমা	তাহমিনা	জুথি	সানজিদা	সাদিয়া	রিয়া
৩৩০৬৬	৩৩০৬৭	৩৩০৬৮	৩৩০৬৯	৩৩০৭০	৩৩০৭১	৩৩০৭২

আফিজা	মিমি	সিগমা	তমা	সারমিন	অর্পিতা	সানন্দা
৩৩০৭৩	৩৩০৭৪	৩৩০৭৫	৩৩০৭৬	৩৩০৭৭	৩৩০৭৮	৩৩০৭৯

নাহিদা	তিশি	খাদিজা	ইসরাত	জাকিয়া	তৃষা	উপমা
৩৩০৮০	৩৩০৮১	৩৩০৮২	৩৩০৮৩	৩৩০৮৪	৩৩০৮৫	৩৩০৮৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

কায়য়ানাত
৩৩০৮৭

রেহানা পারভীন
৩৩০৮৮

মৈত্রী
৩৩০৮৯

জান্নাত
৩৩০৯০

জান্নাত
৩৩০৯১

মাহবুবা
৩৩০৯২

মীম
৩৩০৯৩

বন্যা
৩৩০৯৪

শারমিন
৩৩০৯৫

মুনতাহা
৩৩০৯৬

নাদিয়া
৩৩০৯৭

মেহজাবীন
৩৩০৯৮

মুনিয়া
৩৩০৯৯

সাদিয়া
৩৩১০০

রিফাত
৩৩১০১

লিয়া
৩৩১০২

ভিক্টোরিয়া
৩৩১০৩

অন্তরা
৩৩১০৪

ইসরাত
৩৩১০৫

লামিয়া
৩৩১০৬

সাজিয়া
৩৩১০৭

লাবীব
৩৩১০৮

জেরিন
৩৩১০৯

অর্পা
৩৩১১০

আবেদা
৩৩১১১

সাদিয়া
৩৩১১২

রিয়ান
৩৩১১৩

আছিয়া
৩৩১১৪

ঝুমু
৩৩১১৫

সুমি
৩৩১১৬

আফরিনা
৩৩১১৭

সুষমা
৩৩১১৮

সিফাত
৩৩১১৯

তৃষা
৩৩১২০

সুমাইয়া
৩৩১২১

শিথিলা
৩৩১২২

সিনথিয়া
৩৩১২৪

স্বর্না
৩৩১২৫

সাদিয়া
৩৩১২৬

মাহেড়
৩৩১২৭

শিমুল
৩৩১২৮

অর্ষি
৩৩১২৯

শিলা
৩৩১৩০

জবা
৩৩১৩১

তাসলিমা
৩৩১৩২

জান্নাত
৩৩১৩৩

নাসিমা
৩৩১৩৪

প্রাচী
৩৩১৩৫

মাহিয়া
৩৩১৩৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

তাসমীম	চৈতী	সাবিহা	জেসিকা	মারুফা	হিরা	সানজিদা
৩৩১৩৭	৩৩১৩৮	৩৩১৩৯	৩৩১৪০	৩৩১৪১	৩৩১৪২	৩৩১৪৩

তোহফা	অরিন	জান্নাতী	সানজীদা	তামান্না	মাহমুদা	তানজুম
৩৩১৪৪	৩৩১৪৫	৩৩১৪৬	৩৩১৪৭	৩৩১৪৮	৩৩১৪৯	৩৩১৫০

সাদিয়া	সুলতানা	নুরুননাহার	বিথি	শখ	প্রিয়তা	মালিহা
৩৩১৫১	৩৩১৫২	৩৩১৫৪	৩৩১৫৫	৩৩১৫৬	৩৩১৫৭	৩৩১৫৮

জাহনারা	সাদিয়া	সাবা	নওরীন	মারিয়া	সিলভিয়া	দুলালী আক্তার
৩৩১৫৯	৩৩১৬০	৩৩১৬১	৩৩১৬২	৩৩১৬৩	৩৩১৬৪	৩৩১৬৫

তামান্না	ইন্তি	শিফা	নুসরাত	রোজি	ইমা	শিমু
৩৩১৬৬	৩৩১৬৭	৩৩১৬৮	৩৩১৬৯	৩৩১৭০	৩৩১৭১	৩৩১৭২

সুমাইয়া	মাকসুদা	সিনথিয়া	তামান্না	অনিতা	কথা	রেহনুমা
৩৩১৭৩	৩৩১৭৪	৩৩১৭৫	৩৩১৭৬	৩৩১৭৭	৩৩১৭৮	৩৩১৭৯

সনিয়া	ঈশী	লামিয়া	জেবা	তানজুম	সুমাইয়া	রাত্রি
৩৩১৮০	৩৩১৮১	৩৩১৮২	৩৩১৮৪	৩৩১৮৫	৩৩১৮৬	৩৩১৮৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

তাহামিনা
৩৩১৮৮

তাসপিয়া
৩৩১৮৯

তাছলিমা
৩৩১৯০

রাখী
৩৩১৯১

রুমি
৩৩১৯২

ফারিয়া
৩৩১৯৩

শৈলী
৩৩১৯৫

আখি
৩৩১৯৬

নিশা
৩৩১৯৭

নওশিন
৩৩১৯৮

শিলা
৩৩১৯৯

সাদমা
৩৩২০০

সেতু
৩৩২০১

আশফিয়া
৩৩২০২

যারিন
৩৩২০৩

নাবিলা
৩৩২০৪

নাজমী
৩৩২০৫

আজমি
৩৩২০৬

প্রিয়তা
৩৩২০৭

ফাতেমা
৩৩২০৮

সুমাইতা
৩৩২০৯

প্লাবিতা
৩৩২১০

সায়মা
৩৩২১১

আনিকা
৩৩২১৩

ত্বা-সিন
৩৩২১৪

তামিজা
৩৩২১৫

আরফা
৩৩২১৬

আকিব
৩৩২১৮

সাফা
৩৩২১৯

শাকিব
৩৩২২০

জুবায়ের
৩৩২২১

ফাসবীর
৩৩২২২

শান্ত
৩৩২২৩

লাবিব
৩৩২২৪

সানি
৩৩২২৫

সুমিত
৩৩২২৬

মনন
৩৩২২৭

রিয়াদ
৩৩২২৮

ইকরাম
৩৩২২৯

উৎস
৩৩২৩০

সাদমান
৩৩২৩১

রাফিদ
৩৩২৩২

সাজিদ
৩৩২৩৩

ফাহিম
৩৩২৩৪

ফারদিন
৩৩২৩৫

শুভ
৩৩২৩৬

রাসলান
৩৩২৩৮

জোবায়েদ
৩৩২৩৯

অমিত
৩৩২৪০

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

মোবাশ্বির ৩৩২৪১	মেহেদী ৩৩২৪২	জাহিরুল ৩৩২৪৩	তাসদি ৩৩২৪৪	নাবিদ ৩৩২৪৫	ওয়ালিউল ৩৩২৪৬	জামিল ৩৩২৪৭

স্নিথ ৩৩২৪৮	জামিউল ৩৩২৪৯	সাকিন ৩৩২৫০	তামহিদ ৩৩২৫১	আকিব ৩৩২৫২	ঋদ্ধ ৩৩২৫৩	জারিফ ৩৩২৫৪

রিচার্ড ৩৩২৫৫	হাসান ৩৩২৫৬	জুলকার ৩৩২৫৭	নাফিস ৩৩২৫৯	মাহীর ৩৩২৬০	ফারদীন ৩৩২৬১	সাব্বির ৩৩২৬২

আনানূর ৩৩২৬৩	নুসরাত ৩৩২৬৫	সুমাইয়া ৩৩২৬৬	তামান্না ৩৩২৬৭	জয় ৩৩৪২৫	শাফিন ৩৩৪২৬	নাহিদ ৩৩৪২৭

রিয়ান ৩৩৪২৮	ইসতিয়াফ ৩৩৪২৯	নিবিড় ৩৩৪৩০	আতিকুল ৩৩৪৩১	তন্ময় ৩৩৪৩২	শাহীন ৩৩৪৩৩	রায়ান ৩৩৪৩৪

হাবিবুর ৩৩৪৩৫	আরমান ৩৩৪৩৭	রিমন ৩৩৪৩৮	সজিব ৩৩৪৩৯	শামস্ ৩৩৪৪০	তামজীদ ৩৩৪৪১	আশিক ৩৩৪৪২

আবির ৩৩৪৪৩	তানজিমুল ৩৩৪৪৪	তাহসিন ৩৩৪৪৫	আবরার ৩৩৪৪৬	হাবিব ৩৩৪৪৭	আকাশ ৩৩৪৪৮	রেদোয়ান ৩৩৪৪৯

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

জয়
৩৩৪৫০

সাকিব
৩৩৪৫১

তৈয়বুর
৩৩৪৫৩

শারিফিন
৩৩৪৫৪

প্রান্ত
৩৩৪৫৫

কায়েস
৩৩৪৫৬

রাকিব
৩৩৪৫৮

ইমরান
৩৩৪৫৯

আহনাফ
৩৩৪৬০

নাজমুর
৩৩৪৬১

আহনাফ
৩৩৪৬২

সাইফুল
৩৩৪৬৩

আবিদুর
৩৩৪৬৪

সায়র
৩৩৪৬৫

তানভীর
৩৩৪৬৬

শোভন
৩৩৪৬৭

আরিয়ান
৩৩৪৬৮

আবিদ
৩৩৪৬৯

রোহান
৩৩৪৭০

আবেগ
৩৩৪৭১

রমজান
৩৩৪৭২

সেলিম
৩৩৪৭৩

রিয়াদ
৩৩৪৭৪

মাহবুব
৩৩৪৭৫

রাইয়ান
৩৩৪৭৬

শাকিল
৩৩৪৭৭

মাহাতাজ
৩৩৪৭৮

সাইদ
৩৩৪৭৯

নয়ন
৩৩৪৮০

ইমন
৩৩৪৮১

রাহাত
৩৩৪৮২

দূর্জয়
৩৩৪৮৪

আরাফাত
৩৩৪৮৫

রায়হান
৩৩৪৮৬

ইফতি
৩৩৪৮৭

রিসাল
৩৩৪৮৮

আবিদ
৩৩৪৮৯

রাব্বি
৩৩৪৯০

গালিব
৩৩৪৯১

ইসতেয়াক
৩৩৪৯২

আসিফ
৩৩৪৯৩

সৌমিক
৩৩৪৯৪

মনসুর
৩৩৪৯৫

সোহেল
৩৩৪৯৬

তামিম
৩৩৪৯৭

সাইফুল
৩৩৪৯৮

নাঈম
৩৩৪৯৯

শাহাদাত
৩৩৫০০

সুলতান
৩৩৫০১

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

অর্নব ৩৩৫০২ | প্রত্যয় ৩৩৫০৩ | মিনহাজ ৩৩৫০৪ | ঐশিক ৩৩৫০৫ | নাবিদ ৩৩৫০৬ | ইমরান ৩৩৫০৭ | ইফতেখার ৩৩৫০৮

শামস ৩৩৫০৯ | রাফাত ৩৩৫১০ | শান্ত ৩৩৫১১ | নিরব ৩৩৫১২ | মুরাদ ৩৩৫১৩ | হিমেল ৩৩৫১৪ | আকাশ ৩৩৫১৫

বিপ্লব ৩৩৫১৬ | নিজাম ৩৩৫১৭ | হাবিবুর ৩৩৫১৮ | হৃদয় ৩৩৫১৯ | সাকিব ৩৩৫২০ | সিয়াম ৩৩৫২১ | মেহেদী ৩৩৫২২

ইমন ৩৩৫২৩ | তারিফ ৩৩৫২৪ | সোহান ৩৩৫২৫ | মুন্না ৩৩৫২৬ | ইমন ৩৩৫২৭ | রবিউল ৩৩৫২৮ | অনিক ৩৩৫২৯

নাইম ৩৩৫৩০ | সালমান ৩৩৫৩১ | শামীম ৩৩৫৩২ | সাফিন ৩৩৫৩৩ | মোরশেদ ৩৩৫৩৪ | অনিম ৩৩৫৩৫ | উৎস ৩৩৫৩৬

নাদিম ৩৩৫৩৭ | মুবিন ৩৩৫৩৮ | তুর্য ৩৩৫৩৯ | রাহাত ৩৩৫৪০ | আরিফুল ৩৩৫৪১ | মাহবুব ৩৩৫৪২ | আরাফ ৩৩৫৪৩

ইউসুফ ৩৩৫৪৪ | নাজমুল ৩৩৫৪৫ | শাওন ৩৩৫৪৬ | আরমান ৩৩৫৪৭ | অনিক ৩৩৫৪৮ | তুর্য ৩৩৫৪৯ | মাহামুদুল ৩৩৫৫০

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

রাহাত
৩৩৫৫১

নাঈম
৩৩৫৫২

মুনাঈম
৩৩৫৫৩

ইশতিয়াক
৩৩৫৫৪

নাঈম
৩৩৫৫৫

পারভেজ
৩৩৫৫৬

টিপু
৩৩৫৫৭

হৃদয়
৩৩৫৫৯

সাজ্জাদ
৩৩৫৬০

রাহাত
৩৩৫৬১

সুলতান
৩৩৫৬২

ফাহাদ
৩৩৫৬৩

সাব্বির
৩৩৫৬৪

ইনান
৩৩৫৬৫

অর্নব
৩৩৫৬৬

মিজান
৩৩৫৬৭

তাহমিদ
৩৩৫৬৮

রিমন
৩৩৫৬৯

শাহারিয়ার
৩৩৫৭০

রাসেল
৩৩৫৭১

সুফিয়ান
৩৩৫৭২

সহিদুল
৩৩৫৭৩

মুহাইমিন
৩৩৫৭৪

অচিন্ত
৩৩৫৭৫

সিয়াম
৩৩৫৭৬

সিদ্দিক
৩৩৫৭৭

ইব্রাহিম
৩৩৫৭৮

রাহুল
৩৩৫৭৯

জসিম
৩৩৫৮০

মান্নান
৩৩৫৮২

সাগর
৩৩৫৮৩

আহনাফ
৩৩৫৮৪

ফরমান
৩৩৫৮৫

আরেফিন
৩৩৫৮৭

আব্দুল্লাহ
৩৩৫৮৮

রিজভী
৩৩৫৮৯

সাকিব
৩৩৫৯০

শুভ
৩৩৫৯১

অথি
৩৩৫৯২

নক্ষত্র
৩৩৫৯৩

ফয়সাল
৩৩৫৯৪

আন্দালিভ
৩৩৫৯৫

ইয়াসার
৩৩৫৯৬

মেরাজ
৩৩৫৯৭

হানিফ
৩৩৫৯৮

কুদ্দু
৩৩৫৯৯

ইফতি
৩৩৬০০

জাহিদুল
৩৩৬০১

শাহারিয়া
৩৩৬০২

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

শান্ত ৩৩৬০৩	হৃদয় ৩৩৬০৪	আবীর ৩৩৬০৫	ফয়সাল ৩৩৬০৬	সাফায়েত ৩৩৬০৭	সবুজ ৩৩৬০৮	আদিব ৩৩৬০৯

রাকিব ৩৩৬১০	ফেরদৌস ৩৩৬১১	জিসান ৩৩৬১২	মবিন ৩৩৬১৩	দীপ্ত ৩৩৬১৪	ফাহাদ ৩৩৬১৫	ইমন ৩৩৬১৬

সামিউর ৩৩৬১৭	মুক্ত ৩৩৬১৮	মেহেদী ৩৩৬১৯	আরমান ৩৩৬২০	রেজওয়ানুর ৩৩৬২১	রিমন ৩৩৬২২	তৌসিফ ৩৩৬২৩

শিপন ৩৩৬২৪	ইমন ৩৩৬২৫	দিপ্ত ৩৩৬২৬	রাফি ৩৩৬২৭	আব্দুল্লাহ্ ৩৩৬২৮	তানজীর ৩৩৬২৯	ফাহাদ ৩৩৬৩১

জাকির ৩৩৬৩২	মেহেদী ৩৩৬৩৩	সোয়েব ৩৩৬৩৪	শিহাব ৩৩৬৩৫	অনন্ত ৩৩৬৩৬	মোস্তাফিজুর ৩৩৬৩৭	জুনাইদ ৩৩৬৩৯

শাহারিয়ার ৩৩৬৪১	শাহাদাত ৩৩৬৪২	জুবায়ের ৩৩৬৪৩	রিয়াদ ৩৩৬৪৪	স্বাগত ৩৩৬৪৫	রাকীবুল ৩৩৬৪৬	মোবাশ্বের ৩৩৬৪৭

রাকিব ৩৩৬৪৮	রাকিন ৩৩৬৪৯	জাহিদ ৩৩৬৫০	মুগ্ধ ৩৩৬৫১	জিহাদুল ৩৩৬৫২	পুনম ৩৩৬৫৩	আকাশ ৩৩৬৫৪

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

আদিব
৩৩৬৫৫

রাহাত
৩৩৬৫৬

রিসাত
৩৩৬৫৭

সাইফুল
৩৩৬৫৮

মুহিব
৩৩৬৬০

মাহাবুব
৩৩৬৬১

জনি
৩৩৬৬২

মাহি
৩৩৬৬৩

মেহেদি
৩৩৬৬৪

মুজাম্মান
৩৩৬৬৫

সুলায়মান
৩৩৬৬৬

নাবিল
৩৩৬৬৭

অনিক
৩৩৬৬৮

শিহাব
৩৩৬৬৯

আয়মান
৩৩৬৭০

শাহারিয়ার
৩৩৬৭১

নাহিদ
৩৩৬৭২

ইমরান
৩৩৬৭৩

জাকির
৩৩৬৭৪

সাদ্দাম
৩৩৬৭৫

সাজিদ
৩৩৬৭৬

তাহা
৩৩৬৭৭

শাহমিরান
৩৩৬৭৮

ফারদিন
৩৩৬৭৯

নোমান
৩৩৬৮০

রিফাত
৩৩৬৮১

সাকিব
৩৩৬৮২

বাধন
৩৩৬৮৩

জাওয়াদুর
৩৩৬৮৪

আসিফ
৩৩৬৮৫

হৃদয়
৩৩৬৮৬

মাহফুজ
৩৩৬৮৭

জুবায়ের
৩৩৬৮৮

রাসেল
৩৩৬৮৯

হানিফ
৩৩৬৯০

জিদান
৩৩৬৯২

মুশফিক
৩৩৬৯৩

অর্নব
৩৩৬৯৪

বিপুল
৩৩৬৯৫

সফেন
৩৩৬৯৬

ফারদিন
৩৩৬৯৭

হাবিবুল
৩৩৬৯৮

নিশাত
৩৩৭০০

রবিউল
৩৩৭০১

শাওন
৩৩৭০২

নাইমুর
৩৩৭০৩

মনোয়ার
৩৩৭০৪

নিশান্ত
৩৩৭০৫

রবিউল
৩৩৭০৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

তাহিন ৩৩৭০৭	ফয়সাল ৩৩৭০৮	আরাফাত ৩৩৭০৯	হাবীব ৩৩৭১০	আরিফুল ৩৩৭১১	মাসুকুর ৩৩৭১২	সুমন ৩৩৭১৩

রাহাত ৩৩৭১৪	জাহিদ ৩৩৭১৫	কামরুল ৩৩৭১৬	মিজানুর ৩৩৭১৭	আদনান ৩৩৭১৮	সিফাত ৩৩৭১৯	নিলয় ৩৩৭২০

নাফিস ৩৩৭২১	তন্ময় ৩৩৭২২	আরিফ ৩৩৭২৩	তাজবি-উল ৩৩৭২৪	নাদিমুল ৩৩৭২৫	শুভ ৩৩৭২৬	সিফাত ৩৩৭২৭

রাফি ৩৩৭২৮	জুম্মানুর ৩৩৭২৯	নাহিদ ৩৩৭৩০	সায়েল ৩৩৭৩১	নিলয় ৩৩৭৩৪	আশরাফুল ৩৩৭৩৫	রাতুল ৩৩৭৩৬

মালেক ৩৩৭৩৭	রাসেল ৩৩৭৩৮	মহসিন ৩৩৭৩৯	রাকিব ৩৩৭৪০	সাজ্জাদ ৩৩৭৪১	ওয়াসির ৩৩৭৪২	নিলয় ৩৩৭৪৩

তারেক ৩৩৭৪৬	রিয়াদ ৩৩৭৪৭	তাহ্‌মীদ ৩৩৭৫০	ইয়ালিদ ৩৩৭৫১	নাইম ৩৩৭৫২	নুরুন্নবী ৩৩৭৫৩	ফয়সাল ৩৩৭৫৪

মাহমুদ ৩৩৭৫৫	মহিব ৩৩৭৫৬	আরিফুল ৩৩৭৫৭	নাদিমুল ৩৩৭৫৮	রফিকুল ৩৩৭৫৯	রিয়াদ ৩৩৭৬০	সৌরভ ৩৩৭৬১

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

জাহিদুল
৩৩৭৬২

নাসিম
৩৩৭৬৩

নিবিড়
৩৩৭৬৪

জাহিদ
৩৩৭৬৫

ইমন
৩৩৭৬৬

রক্তিম
৩৩৭৬৭

রবিউল
৩৩৭৬৮

রাহিম
৩৩৭৬৯

সজিব
৩৩৭৭০

সম্পদ
৩৩৭৭১

নাহিদুর
৩৩৭৭২

সুজন
৩৩৭৭৩

বাপ্পি
৩৩৭৭৪

রিজুয়ান
৩৩৭৭৫

এহ্সান
৩৩৭৭৬

রাসেল
৩৩৭৭৭

সাব্বির
৩৩৭৭৮

কামরান
৩৩৭৮০

জাহিদ
৩৩৭৮১

ফারদিন
৩৩৭৮২

আশির
৩৩৭৮৩

শোভন
৩৩৭৮৪

হামিদ
৩৩৭৮৫

তুষার
৩৩৭৮৬

আসিফ
৩৩৭৮৭

আব্দুল্লাহ্
৩৩৭৮৮

সজিব
৩৩৭৮৯

হাসিবুল
৩৩৭৯০

ফুয়াদ
৩৩৭৯১

সাফায়েত
৩৩৭৯২

আবির
৩৩৭৯৩

বাঘেরী
৩৩৭৯৪

মিনহাজুল
৩৩৭৯৫

সৌরভ
৩৩৭৯৬

রাহাতুল
৩৩৭৯৮

মেহেদী
৩৩৭৯৯

মুফতাইন
৩৩৮০০

সাদমান
৩৩৮০২

সানজিদ
৩৩৮০৪

সিফাত
৩৩৮০৫

ইমরান
৩৩৮০৬

নিবিড়
৩৩৮০৮

জোহান
৩৩৮১১

রবিউল
৩৩৮১৩

সামস
৩৩৮১৪

স্বর্গ
৩৩৮১৫

মুজাহিদ
৩৩৮১৬

সাইফুল
৩৩৮১৭

আরমান
৩৩৮১৮

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

আলিফ	কায়েস	রিদুয়ান	হাসিব	অর্নব	শিপলু	শিমুল
৩৩৮১৯	৩৩৮২০	৩৩৮২১	৩৩৮২২	৩৩৮২৩	৩৩৮২৪	৩৩৮২৫

আরিফুল	নাহিদুল	ইয়াছিন	মেহেদী	রায়হান	অনিক	হাসনাইম
৩৩৮২৬	৩৩৮২৭	৩৩৮২৮	৩৩৮২৯	৩৩৮৩০	৩৩৮৩২	৩৩৮৩৩

মুন্না	সাকিব	পলাশ	নাবিল	আলম	হাসিবুল	মেহেদী
৩৩৮৩৪	৩৩৮৩৫	৩৩৮৩৬	৩৩৮৩৮	৩৩৮৩৯	৩৩৮৪০	৩৩৮৪১

আরিফুল	নাসির	আরিফুল	লাবিব	সালমান	রাশেদ	রাব্বি
৩৩৮৪২	৩৩৮৪৩	৩৩৮৪৪	৩৩৮৪৫	৩৩৮৪৬	৩৩৮৪৭	৩৩৮৪৮

শাফিন	দেলোয়ার	খালিদ	শফিকুল	মনোয়ার	অমিত	ফাহিম
৩৩৮৪৯	৩৩৮৫০	৩৩৮৫১	৩৩৮৫২	৩৩৮৫৩	৩৩৮৫৪	৩৩৮৫৫

রাক্কিম	তূর্য	মুনীম	স্বদেশ	রাবিদ	হাসিবুল	সাকির
৩৩৮৫৬	৩৩৮৫৭	৩৩৮৫৮	৩৩৮৫৯	৩৩৮৬০	৩৩৮৬৩	৩৩৮৬৪

রাকিন	নিজাম	মাসরুর	তুহিন	রিফাত	জোহারের	আলফাজ
৩৩৮৬৫	৩৩৮৬৬	৩৩৮৬৭	৩৩৮৬৮	৩৩৮৬৯	৩৩৮৭০	৩৩৮৭১

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

নোমান
৩৩৮৭২

সাকিব
৩৩৮৭৩

নাসির
৩৩৮৭৫

সায়মুন
৩৩৮৭৬

রাকিব
৩৩৮৭৭

হাসান
৩৩৮৭৮

কপিল
৩৩৮৭৯

মিরাজ
৩৩৮৮০

তন্ময়
৩৩৮৮১

করিম
৩৩৮৮২

নিজাম
৩৩৮৮৩

আসিফ
৩৩৮৮৪

সৌরভ
৩৩৮৮৫

শুভ
৩৩৮৮৬

নাহিদ
৩৩৮৮৭

আকাশ
৩৩৮৮৮

শিপন
৩৩৮৮৯

মাশুক
৩৩৮৯০

দীপ
৩৩৮৯১

জিলানী
৩৩৮৯৩

নাফি
৩৩৮৯৫

সামী
৩৩৮৯৬

তুষার
৩৩৮৯৭

হাসিম
৩৩৮৯৮

রাব্বী
৩৩৮৯৯

কাওছার
৩৩৯০০

সালাউদ্দিন
৩৩৯০১

রাহাত
৩৩৯০২

সাগর
৩৩৯০৪

রবিউল
৩৩৯০৫

পিয়াস
৩৩৯০৬

মাহবুব
৩৩৯০৮

সাজ্জাদ
৩৩৯০৯

আসিফ
৩৩৯১০

মোসফিকুর
৩৩৯১১

রাব্বি
৩৩৯১২

ইয়াসিন
৩৩৯১৩

আনিন্দ্য
৩৩৯১৪

বিজয়
৩৩৯১৫

তানভির
৩৩৯১৬

তুহিন
৩৩৯১৭

লতিফ
৩৩৯১৮

নাকিব
৩৩৯১৯

আরিফ
৩৩৯২০

রবিউল
৩৩৯২৩

মাসুক
৩৩৯২৫

তৌহিদ
৩৩৯২৬

কামরুল
৩৩৯২৭

শহিদুল
৩৩৯২৮

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

জাবের	শুভ	মাসুদ	খালিদ	আদনান	ইমতিয়াজ	রাজিব
৩৩৯২৯	৩৩৯৩০	৩৩৯৩১	৩৩৯৩২	৩৩৯৩৩	৩৩৯৩৫	৩৩৯৩৬

সিয়াম	তাজোয়ার	হিমু	মেছবাহ	মাহমুদ	নাফিস	রাতিন
৩৩৯৩৮	৩৩৯৪০	৩৩৯৪১	৩৩৯৪২	৩৩৯৪৩	৩৩৯৪৪	৩৩৯৪৫

রামিম	আমিনুল	মেহেদি	তানভির	কাউছার	রানা	ইয়ামিন
৩৩৯৪৬	৩৩৯৪৭	৩৩৯৪৮	৩৩৯৪৯	৩৩৯৫০	৩৩৯৫১	৩৩৯৫২

শাহরিয়াদ	ইলিয়াস	সৌরভ	অপূর্ব	রিফাত	আলভী	অংশু
৩৩৯৫৩	৩৩৯৫৪	৩৩৯৫৫	৩৩৯৫৬	৩৩৯৫৭	৩৩৯৫৮	৩৩৯৫৯

নাইম	আহমেদ	খালিদ	সাইফ	মিজান	শাহারিয়ার	আকাশ
৩৩৯৬০	৩৩৯৬১	৩৩৯৬২	৩৩৯৬৩	৩৩৯৬৪	৩৩৯৬৫	৩৩৯৬৬

রাফিদ	ফাহিম	রুবেল	লিমন	রেজোয়ান	শাফিন	ইমরান
৩৩৯৬৭	৩৩৯৬৮	৩৩৯৬৯	৩৩৯৭০	৩৩৯৭৩	৩৩৯৭৪	৩৩৯৭৫

চন্দ্র	শাহরিয়ার	রিয়াজ	তুহিন	মাহমুদ	মুন্না	হাসান
৩৩৯৭৬	৩৩৯৭৭	৩৩৯৭৯	৩৩৯৮০	৩৩৯৮১	৩৩৯৮২	৩৩৯৮৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

বাপ্পি
৩৩৯৮৪

তৌফিক
৩৩৯৮৫

তুরান
৩৩৯৮৬

জোবায়ের
৩৩৯৮৭

ইয়াসিন
৩৩৯৮৮

মিনহাজ
৩৩৯৮৯

মাহিন
৩৩৯৯০

মেরাজুল
৩৩৯৯১

জুনায়েত
৩৩৯৯২

সাঈদ
৩৩৯৯৩

আকিব
৩৩৯৯৪

মুরাদ
৩৩৯৯৫

এনতাজুল
৩৩৯৯৬

সাকিব
৩৩৯৯৭

নাফিউর
৩৩৯৯৮

দেবাশীষ
৩৩৯৯৯

সজীব
৩৪০০০

দীপ্ত
৩৪০০৩

ফারহান
৩৪০০৪

রিফাত
৩৪০০৫

জাহিদ
৩৪০০৬

সালমান
৩৪০০৭

তাকবির
৩৪০০৮

মেহেদী
৩৪০০৯

সামির
৩৪০১০

ইমরান
৩৪০১১

আশেকুর
৩৪০১২

আলম
৩৪০১৩

মারুফ
৩৪০১৪

রফিকুল
৩৪০১৫

তাহমিদুর
৩৪০১৬

মুন
৩৪০১৮

ইফতেখার
৩৪০১৯

শামশাদ
৩৪০২০

সুমিত
৩৪০২১

তানজিম
৩৪০২২

কৌশিক
৩৪০২৩

রিফাত
৩৪০২৪

সিয়াম
৩৪০২৬

ফায়সাল
৩৪০২৮

সাকিব
৩৪০২৯

অর্নব
৩৪০৩০

শাকিল
৩৪০৩১

সৈকত
৩৪০৩২

শফিকুল
৩৪০৩৩

নাঈম
৩৪০৩৪

তানভির
৩৪০৩৫

আমিনুল
৩৪০৩৬

জামিল
৩৪০৩৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

নাহিদ ৩৪০৩৮	আশিক ৩৪০৩৯	সাইদুল ৩৪০৪০	মোবাশশির ৩৪০৪২	ইমরুল ৩৪০৪৩	আশিক ৩৪০৪৪	নাহিদ ৩৪০৪৫

হাসান ৩৪০৪৬	শিবলু ৩৪০৪৭	সোহান ৩৪০৪৮	বৈদ্য ৩৪০৪৯	সাবিক ৩৪০৫১	মনির ৩৪০৫২	সোহরাব ৩৪০৫৩

আশিক ৩৪০৫৪	রায়হান ৩৪০৫৫	আবুল ৩৪০৫৬	সিফাত ৩৪০৫৭	সাদি ৩৪০৫৮	মারুফ ৩৪০৫৯	প্রান্ত ৩৪০৬০

জোবায়ের ৩৪০৬১	তুষার ৩৪০৬২	তুষার ৩৪০৬৩	লুৎফর ৩৪০৬৮	তানজীমুর ৩৪০৬৯	সুজন ৩৪০৭০	ইরতিসাম ৩৪০৭২

আজহার ৩৪০৭৩	শান্ত ৩৪০৭৪	সাইফুল ৩৪০৭৫	রাসেল ৩৪০৭৬	মিথুন ৩৪০৭৭	সম্রাট ৩৪০৭৮	সিমান্ত ৩৪০৭৯

আব্দুল্লাহ ৩৪০৮০	আবেদীন ৩৪০৮১	আকাশ ৩৪০৮২	রনি ৩৪০৮৩	উৎস ৩৪০৮৪	সৈকত ৩৪০৮৫	হিমেল ৩৪০৮৬

আমিনুল ৩৪০৮৭	ফারুক ৩৪০৮৮	শাওন ৩৪০৮৯	রেজওয়ান ৩৪০৯০	আউয়াল ৩৪০৯১	মিনহাজ ৩৪০৯২	ইয়াসিন ৩৪০৯৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

রায়ান
৩৪০৯৪

রাব্বি
৩৪০৯৫

নাইম
৩৪০৯৬

সজিব
৩৪০৯৭

জাহিদ
৩৪০৯৮

আদর
৩৪০৯৯

সুপ্ত
৩৪১০০

জুবায়ের
৩৪১০১

শিব্বির
৩৪১০৩

আফরাহিম
৩৪১০৪

ইমন
৩৪১০৫

রাববানী
৩৪১০৬

প্রত্যয়
৩৪১০৭

আপন
৩৪১০৮

মেহেদি
৩৪১০৯

ফারুক
৩৪১১০

শাহাদাত
৩৪১১১

শুভ
৩৪১১২

মহিউদ্দিন
৩৪১১৩

হিমেল
৩৪১১৪

সাইফুল
৩৪১১৬

রাফিখান
৩৪১১৭

আরিফিন
৩৪১১৮

রিমন
৩৪১১৯

ফয়সাল
৩৪১২০

রনি
৩৪১২১

সিয়াম
৩৪১২২

রাহাত
৩৪১২৩

নোমান
৩৪১২৪

প্রিন্স
৩৪১২৫

ফরহাদ
৩৪১২৬

ফাহিম
৩৪১২৭

মারুফ
৩৪১২৮

তানজিল
৩৪১২৯

ইকরামুল
৩৪১৩০

শামীম
৩৪১৩১

মেহেদী
৩৪১৩২

সামিরুল
৩৪১৩৩

প্রাচুর্য
৩৪১৩৪

জাওয়াদ
৩৪১৩৫

ফাহিম
৩৪১৩৬

আপন
৩৪১৩৮

ইফতেখার
৩৪১৩৯

রাগিব
৩৪১৪০

অনিক
৩৪১৪১

ফুয়াদ
৩৪১৪২

সিফাত
৩৪১৪৩

নাফিজ
৩৪১৪৪

ফাইয়াজ
৩৪১৪৫

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

তানজিল ৩৪১৪৬	অপু ৩৪১৪৮	রনি ৩৪১৪৯	মুন্না ৩৪১৫০	শহিদ ৩৪১৫১	মুন ৩৪১৫২	রকি ৩৪১৫৩

সাজ্জাদ ৩৪১৫৫	প্রান্ত ৩৪১৫৭	শাহাদাত ৩৪১৫৮	ইসলাম ৩৪১৫৯	মাসফিক ৩৪১৬০	নাইম ৩৪১৬১	মাহবুব ৩৪১৬২

মারুফ ৩৪১৬৩	সৌদিপ ৩৪১৬৪	ইমন ৩৪১৬৫	বাপ্পি ৩৪১৬৬	সুলাইমান ৩৪১৬৭	নাইমুর ৩৪১৬৮	আলিফ ৩৪১৬৯

রোমান ৩৪১৭০	তানভীর ৩৪১৭১	আকাশ ৩৪১৭২	ইমতিয়াজ ৩৪১৭৩	আবিদ ৩৪১৭৪	সাহা ৩৪১৭৬	নাবিল ৩৪১৭৭

নাফিজ ৩৪১৭৮	রাশিক ৩৪১৭৯	আকিব ৩৪১৮০	আকিব ৩৪১৮১	শিহাব ৩৪১৮২	সিফাত ৩৪১৮৩	সাকলাইন ৩৪১৮৫

রনবীর ৩৪১৮৬	অয়ন ৩৪১৮৭	জয় ৩৪১৮৮	মেহেদী ৩৪১৮৯	মাহবুবুর ৩৪১৯০	নেহাল ৩৪১৯১	ফারদিন ৩৪১৯২

তালেব ৩৪১৯৩	ইমরান ৩৪১৯৪	নিষাদ ৩৪১৯৫	জুবায়েদ ৩৪১৯৬	কাউসার ৩৪১৯৭	আরেফিন ৩৪১৯৮	মাহমুদ ৩৪১৯৯

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

সাফোয়ান
৩৪২০০

লিমন
৩৪২০১

সাকিব
৩৪২০২

তাহমিদ
৩৪২০৩

ওমর
৩৪২০৪

রাকিব
৩৪২০৫

তানভীর
৩৪২০৬

আদনান
৩৪২০৭

ইসতিয়াক
৩৪২০৮

মোবিন
৩৪২০৯

ফয়েজ
৩৪২১০

সাকিব
৩৪২১১

মওনিস
৩৪২১২

অভি
৩৪২১৩

রাফি
৩৪২১৬

রাসেল
৩৪২১৭

ওভি
৩৪২১৯

নিলয়
৩৪২২০

কাইয়ুম
৩৪২২১

জীম
৩৪২২২

অপূর্ব
৩৪২২৩

তৃষান
৩৪২২৪

ইমন
৩৪২২৫

লিখন
৩৪২২৬

রবিউল
৩৪২২৭

নাফিস
৩৪২২৮

সুমন
৩৪২২৯

শান্ত
৩৪২৩০

তাহসিন
৩৪২৩১

মাহমুদ
৩৪২৩২

জামান
৩৪২৩৩

সানোয়ার
৩৪২৩৪

মাফরুদুল
৩৪২৩৫

আকরাম
৩৪২৩৬

নাঈম
৩৪২৩৭

মেহেদী
৩৪২৩৮

মোহাইমিনুল
৩৪২৩৯

শাকিল
৩৪২৪০

শামীম
৩৪২৪১

আদনান
৩৪২৪২

সাকিব
৩৪২৪৩

আসিফ
৩৪২৪৪

সম্রাট
৩৪২৪৫

রবিউল
৩৪২৪৬

শামস
৩৪২৪৭

যামীন
৩৪২৪৮

আদনান
৩৪২৪৯

আবিব
৩৪২৫০

বাবু
৩৪২৫১

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

প্রিয়ম ৩৪২৫২	আশরাফুল ৩৪২৫৩	জীবন ৩৪২৫৪	সজিব ৩৪২৫৫	কাউসার ৩৪২৫৬	অভিষেক ৩৪২৫৭	মারুফ ৩৪২৫৮
সামিন ৩৪২৫৯	অর্নব ৩৪২৬০	নাঈম ৩৪২৬১	নাহিদ ৩৪২৬২	অরিত ৩৪২৬৪	সিফাত ৩৪২৬৬	মামুন ৩৪২৬৭
আহসান ৩৪২৬৮	রাফি ৩৪২৬৯	রাকিবুল ৩৪২৭০	প্রিন্স ৩৪২৭১	রিয়াজ ৩৪২৭২	অয়ন ৩৪২৭৩	সাফিন ৩৪২৭৪
সজীব ৩৪২৭৫	খালিদ ৩৪২৭৬	রাকিব ৩৪২৭৭	প্রত্যয় ৩৪২৭৮	কাওছার ৩৪২৭৯	জায়েদুল ৩৪২৮০	জোবায়ের ৩৪২৮১
বাধন ৩৪২৮২	আশিক ৩৪২৮৩	রবিউল ৩৪২৮৪	রাগিব ৩৪২৮৫	রাব্বি ৩৪২৮৬	রাকিব ৩৪২৮৭	আসফাক ৩৪২৮৮
মাহবুব ৩৪২৮৯	ফাহাদ ৩৪২৯০	রিদওয়ান ৩৪২৯১	রাহুল ৩৪২৯২	রথি ৩৪২৯৩	আশিক ৩৪২৯৪	নাঈমুমুর ৩৪২৯৫
ইসতিয়াক ৩৪২৯৬	আরাবি ৩৪২৯৭	রাকিব ৩৪২৯৮	রওশন ৩৪৩০০	তমাল ৩৪৩০১	রাহাত ৩৪৩০২	রিফাত ৩৪৩০৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

রাকিন
৩৪৩০৪

সৌরভ
৩৪৩০৫

নাভিদ
৩৪৩০৬

মুকতাদির
৩৪৩০৭

হাফিজ
৩৪৩০৯

রবিন
৩৪৩১০

সামি
৩৪৩১১

সাহিদ
৩৪৩১২

আনোয়ার
৩৪৩১৩

কাদের
৩৪৩১৪

সোহান
৩৪৩১৫

জীবন
৩৪৩১৬

মাজিদ
৩৪৩১৭

আকাশ
৩৪৩১৮

ইমরান
৩৪৩১৯

অমিত
৩৪৩২০

আকিব
৩৪৩২১

শিশির
৩৪৩২২

কৌশিক
৩৪৩২৩

ওয়াজেদ
৩৪৩২৪

সোহান
৩৪৩২৫

শাকিল
৩৪৩২৯

রাকিব
৩৪৩৩০

নাজিম
৩৪৩৩১

ধ্রুব
৩৪৩৩২

সিবাত
৩৪৩৩৩

রাকিব
৩৪৩৩৪

মাজহারুল
৩৪৩৩৫

রোহান
৩৪৩৩৬

আবির
৩৪৩৩৭

নাঈম
৩৪৩৩৮

অর্পন
৩৪৩৩৯

আহাদ
৩৪৩৪০

জাহিদ
৩৪৩৪১

হাছনাইন
৩৪৩৪২

অনিক
৩৪৩৪৪

আব্দুল্লাহ্
৩৪৩৪৫

রাকিব
৩৪৩৪৬

সাজেদুল
৩৪৩৪৭

মতিউর
৩৪৩৪৮

তানিম
৩৪৩৪৯

মাহামুদুল
৩৪৩৫০

আরমান
৩৪৩৫১

আফনান
৩৪৩৫২

শাওন
৩৪৩৫৩

রাকিব
৩৪৩৫৪

রায়হান
৩৪৩৫৫

শাকিল
৩৪৩৫৬

সৌরভ
৩৪৩৫৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

রিফাত	রাজ্জাক	তুহিন	রাইয়ান	রাফি	রাসেল	শোভন
৩৪৩৫৮	৩৪৩৫৯	৩৪৩৬২	৩৪৩৬৩	৩৪৩৬৫	৩৪৩৬৬	৩৪৩৬৭

সিফাত	নাহিদ	উৎস	আসার	বদরুল	হৃদয়	ফাহিম
৩৪৩৬৮	৩৪৩৬৯	৩৪৩৭০	৩৪৩৭১	৩৪৩৭২	৩৪৩৭৩	৩৪৩৭৪

মোস্তাক	সাইদী	সাহিম	মাহবুব	ইকবাল	অয়ন	জোবায়ের
৩৪৩৭৫	৩৪৩৭৬	৩৪৩৭৭	৩৪৩৭৮	৩৪৩৭৯	৩৪৩৮০	৩৪৩৮১

আমিনুল	ফাহিম	সিয়াম	হাসীব	ইকরাম	সাঈদী	জাবেদ
৩৪৩৮২	৩৪৩৮৩	৩৪৩৮৪	৩৪৩৮৫	৩৪৩৮৬	৩৪৩৮৭	৩৪৩৮৮

পার্থ	তামিম	জুবায়ের	পান্থ	সজীব	সুদর্শন দত্ত	আব্দুল্লাহ্
৩৪৩৮৯	৩৪৩৯০	৩৪৩৯১	৩৪৩৯২	৩৪৩৯৩	৩৪৩৯৫	৩৪৩৯৬

সোহাগ	আশরাফুল	মাহফুজ	আনাস	রাজ	হামজা	রাব্বী
৩৪৩৯৭	৩৪৩৯৮	৩৪৩৯৯	৩৪৪০০	৩৪৪০১	৩৪৪০২	৩৪৪০৩

অন্তু	আজিজুর	ইসমাইল	ফয়সাল	সুজন	নয়ন	জাবেদুল
৩৪৪০৪	৩৪৪০৫	৩৪৪০৬	৩৪৪০৭	৩৪৪০৮	৩৪৪০৯	৩৪৪১০

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

ফাইয়াজ
৩৪৪১১

নাদিম
৩৪৪১২

সানাউল্লাহ্
৩৪৪১৩

পুনম
৩৪৪১৪

জাকির
৩৪৪১৫

ওসমানি
৩৪৪১৬

আশরাফ
৩৪৪১৭

রাকিন
৩৪৪১৮

শাওন
৩৪৪১৯

রাসেল
৩৪৪২০

আদ্রা
৩৪৪২১

সায়েম
৩৪৪২২

তৌফিক
৩৪৪২৪

ওবায়েদ
৩৪৪২৫

সজীব
৩৪৪২৬

শুভ
৩৪৪২৮

অভি
৩৪৪৩১

রিয়াশাত
৩৪৪৩২

খালিদ
৩৪৪৩৪

নাজমুস
৩৪৪৩৫

নবীন
৩৪৪৩৬

কুশল
৩৪৪৩৭

রায়
৩৪৪৩৮

সাইফুউদ্দিন
৩৪৪৩৯

মাহবুব
৩৪৪৪০

অরিত্র
৩৪৪৪১

নিলয়
৩৪৪৪২

নিবিড়
৩৪৪৪৪

আরমান
৩৪৪৪৫

রিদওয়ান
৩৪৪৪৬

ফেরদৌস
৩৪৪৪৭

মামুন
৩৪৪৪৮

রাব্বী
৩৪৪৪৯

শান্ত
৩৪৪৫০

ইমরান
৩৪৪৫১

তানভিন
৩৪৪৫২

পিয়াম
৩৪৪৫৪

ইমন
৩৪৪৫৫

সায়ন
৩৪৪৫৬

জয়
৩৪৪৫৭

ইসতিয়াক
৩৪৪৫৮

রাহাত
৩৪৪৫৯

লিংকন
৩৪৪৬০

আকাশ
৩৪৪৬১

ইব্রাহিম
৩৪৪৬২

আজিজ
৩৪৪৬৩

ইবরাহিম
৩৪৪৬৪

রাকিব
৩৪৪৬৬

রাফসান
৩৪৪৬৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

সানোয়ার	সোহেল	মামুন	জাওয়াদ	তামিম	রাজু	বারহাদ
৩৪৪৬৮	৩৪৪৬৯	৩৪৪৭০	৩৪৪৭১	৩৪৪৭২	৩৪৪৭৩	৩৪৪৭৪

ইয়াসির	আবিদ	সাফি	রাব্বি	সালমান	দিপু	দুর্জয়
৩৪৪৭৫	৩৪৪৭৬	৩৪৪৭৭	৩৪৪৭৮	৩৪৪৭৯	৩৪৪৮০	৩৪৪৮১

হামিদ	রাব্বি	সাইফুল	শুভ	তৌহিদ	নাইম	আকিব
৩৪৪৮৩	৩৪৪৮৫	৩৪৪৮৬	৩৪৪৮৭	৩৪৪৮৮	৩৪৪৮৯	৩৪৪৯০

আকাশ	আশিকুর	কামরুল	তামজিদ	রানা	রাশেদুল	আব্দুর রহমান
৩৪৪৯১	৩৪৪৯২	৩৪৪৯৪	৩৪৪৯৫	৩৪৪৯৬	৩৪৪৯৭	৩৪৪৯৮

মাহফুজ	মেহেদী	সাইদুর	তামিম	মেহেদী	হামিদ	প্রাপ্ত
৩৪৪৯৯	৩৪৫০০	৩৪৫০১	৩৪৫০২	৩৪৫০৩	৩৪৫০৪	৩৪৫০৫

নাইম	ত্বোহা	সামিউল	ফয়সাল	বাধন	আশিক	তানভীর
৩৪৫০৭	৩৪৫০৮	৩৪৫০৯	৩৪৫১০	৩৪৫১১	৩৪৫১২	৩৪৫১৩

মেহেদী	রামী	রাকিবুল	আলিফ	আকাশ	তারেক	নাজমুল
৩৪৫১৪	৩৪৫১৫	৩৪৫১৭	৩৪৫১৮	৩৪৫১৯	৩৪৫২০	৩৪৫২১

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

অমিত
৩৪৫২২

মিহাদুল
৩৪৫২৩

দিদার
৩৪৫২৪

রাতুল
৩৪৫২৫

ধ্রুব
৩৪৫২৬

ওসিউজ্জামান
৩৪৫২৭

শামীর
৩৪৫২৯

হৃদয়
৩৪৫৩০

মুদাব্বির
৩৪৫৩১

সাজ্জাদ
৩৪৫৩২

জহিরুল
৩৪৫৩৩

সোহেল
৩৪৫৩৫

তাজবি
৩৪৫৩৬

ফাহাদ
৩৪৫৩৭

খায়রুল
৩৪৫৩৯

রাকিব
৩৪৫৪০

ইশরাক
৩৪৫৪১

রিসাত
৩৪৫৪২

অভি
৩৪৫৪৩

মাসুদ
৩৪৫৪৪

তানভীর
৩৪৫৪৫

সাহারিয়ার
৩৪৫৪৬

বায়েজিদ
৩৪৫৪৭

শীতল
৩৪৫৪৮

হাসিবুর
৩৪৫৪৯

ফাহাদ
৩৪৫৫১

ইব্রাহিম
৩৪৫৫২

সৌরভ
৩৪৫৫৩

ছামির
৩৪৫৫৪

ইয়াসিন
৩৪৫৫৫

তাসজিদ
৩৪৫৫৬

চন্দন
৩৪৫৫৭

পিয়াম
৩৪৫৫৮

সাকিবুল
৩৪৫৫৯

নাফি
৩৪৫৬০

আরফাত
৩৪৫৬২

অন্তর
৩৪৫৬৩

ফারহানুর
৩৪৫৬৪

তাহমিন
৩৪৫৬৫

সান
৩৪৫৬৬

তাসিন
৩৪৫৬৭

প্রান্ত
৩৪৫৬৯

জীবন
৩৪৫৭০

জাহিদ
৩৪৫৭১

ইমরান
৩৪৫৭২

সাহেদ
৩৪৫৭৩

মাহফুজ
৩৪৫৭৬

সিয়াম
৩৪৫৭৮

নাহিদুল
৩৪৫৮০

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

মারুফ ৩৪৫৮১	সায়মন ৩৪৫৮২	মেহেদী ৩৪৫৮৩	রাসেল ৩৪৫৮৪	নাইমুর ৩৪৫৮৫	রিফাত ৩৪৫৮৭	জুনায়েদ ৩৪৫৮৮

নাহিদ ৩৪৫৮৯	রাকিবুল ৩৪৫৯০	প্রান্ত ৩৪৫৯১	মুশফিকুর ৩৪৫৯২	আল-আমিন ৩৪৫৯৩	নোমান ৩৪৫৯৪	ইয়াসির ৩৪৫৯৭

রুবেল ৩৪৫৯৮	রিফাত ৩৪৬০০	সামি ৩৪৬০১	তাহসিন ৩৪৬০২	আরিফুল ৩৪৬০৩	সারোয়ার ৩৪৬০৪	রনি ৩৪৬০৫

রাজিব ৩৪৬০৬	নাদিম ৩৪৬০৭	রাজিন ৩৪৬০৮	হাবিব ৩৪৬০৯	সাকিব ৩৪৬১১	হাসান ৩৪৬১২	হাফিজুর ৩৪৬১৩

মইনুল ৩৪৬১৪	হৃদয় ৩৪৬১৫	তানভীর ৩৪৬১৬	বাধন ৩৪৬১৭	হৃদয় ৩৪৬১৮	আজাদ ৩৪৬১৯	প্লাবন ৩৪৬২০

হিমেল ৩৪৬২১	তুহিন ৩৪৬২২	শান্ত ৩৪৬২৩	সাকিব ৩৪৬২৪	তুষার ৩৪৬২৫	তুষন ৩৪৬২৭	রায়হান ৩৪৬২৮

মামুন ৩৪৬২৯	তানভীর ৩৪৬৩০	তানজিম ৩৪৬৩১	কৌশিক ৩৪৬৩২	হাসান ৩৪৬৩৩	রাহী ৩৪৬৩৪	আরেফিন ৩৪৬৩৫

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

সফল ৩৪৬৩৬	জাহিদ ৩৪৬৩৭	মিরাজ ৩৪৬৩৮	আব্দুল্লাহ্ ৩৪৬৩৯	মইন ৩৪৬৪০	তানভীর ৩৪৬৪১	শুভ ৩৪৬৪২

আম্মার ৩৪৬৪৩	দেলোয়ার ৩৪৬৪৪	রেজোয়ান ৩৪৬৪৫	কাদির ৩৪৬৪৬	শিফাত ৩৪৬৪৭	ইমতিয়াজ ৩৪৬৪৮	সাদমান ৩৪৬৪৯

রাহাত ৩৪৬৫০	অরুণ ৩৪৬৫১	মেহেদী ৩৪৬৫২	শোয়েব ৩৪৬৫৩	তানভীর ৩৪৬৫৪	জাহিদুল ৩৪৬৫৫	আনিস ৩৪৬৫৬

নাছিম ৩৪৬৫৭	শুভ ৩৪৬৫৮	সাকিব ৩৪৬৫৯	নাজমুল ৩৪৬৬০	আল-আমিন ৩৪৬৬১	তাসিফ ৩৪৬৬২	সাইমুন ৩৪৬৬৩

রাকিব ৩৪৬৬৪	হৃদয় ৩৪৬৬৫	সুপ্ত ৩৪৬৬৬	মাহফুজুর ৩৪৬৬৭	রাশেদ ৩৪৬৬৮	অমি ৩৪৬৬৯	মেহেদী ৩৪৬৭০

রবিউল ৩৪৬৭১	তমাল ৩৪৬৭২	নাইম ৩৪৬৭৩	কেফায়েত ৩৪৬৭৬	রাকিব ৩৪৬৭৮	সরোয়ার ৩৪৬৭৯	জিম ৩৪৬৮১

রবিন ৩৪৬৮২	সাকিবুর ৩৪৬৮৩	আমিনুর ৩৪৬৮৫	ইয়াসিন ৩৪৬৮৬	রেদওয়ান ৩৪৬৮৭	মেহেদী ৩৪৬৮৮	তানভীর ৩৪৬৮৯

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

সাকিব	নাফিস	ইমাম	সাজ্জাদ	অভি	রবিন	আবিদ
৩৪৬৯০	৩৪৬৯১	৩৪৬৯২	৩৪৬৯৫	৩৪৬৯৬	৩৪৬৯৭	৩৪৬৯৯

তুষার	সঞ্চয়	দিপ্ত	ফাহিম	শান্ত	মেহেদী	মুহিত
৩৪৭০০	৩৪৭০১	৩৪৭০২	৩৪৭০৩	৩৪৭০৪	৩৪৭০৫	৩৪৭০৬

তানভীর	শাওন	তপু	সাইম	ইয়াসির	শৈশব	মুকিত
৩৪৭০৭	৩৪৭০৮	৩৪৭০৯	৩৪৭১০	৩৪৭১২	৩৪৭১৩	৩৪৭১৪

ইয়াসিন	জামিল	তানভির	তানজির	তারেক	রিয়াদ	সাইদ
৩৪৭১৬	৩৪৭১৭	৩৪৭১৮	৩৪৭১৯	৩৪৭২০	৩৪৭২১	৩৪৭২২

সৈকত	বনিক	জামিউর	ইমতিয়াজ	রাহাত	রিজভী	রাসেল
৩৪৭২৩	৩৪৭২৪	৩৪৭২৫	৩৪৭২৬	৩৪৭২৭	৩৪৭২৮	৩৪৭৩০

রেজাউল	সাফায়েত	হৃদয়	অনিক	মুস্তাকীম	উদয়	জরিপ
৩৪৭৩২	৩৪৭৩৩	৩৪৭৩৫	৩৪৭৩৬	৩৪৭৩৭	৩৪৭৩৮	৩৪৭৩৯

সাফায়েত	সাইফ	আদনান	হেমায়েত	হাসিব	আবির	মাহিম
৩৪৭৪০	৩৪৭৪১	৩৪৭৪২	৩৪৭৪৩	৩৪৭৪৪	৩৪৭৪৫	৩৪৭৪৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

মাহিম
৩৪৭৪৮

জুবায়ের
৩৪৭৪৯

ফাহিম
৩৪৭৫০

অনজুম
৩৪৭৫১

শরীফ
৩৪৭৫২

জুনায়েদ
৩৪৭৫৩

রায়হান
৩৪৭৫৪

সাইফ
৩৪৭৫৫

রাসেল
৩৪৭৫৬

আহাদ
৩৪৭৫৭

মমিন
৩৪৭৫৮

ইসমাইল
৩৪৭৫৯

ফয়সাল
৩৪৭৬১

আব্দুল
৩৪৭৬২

তানভীর
৩৪৭৬৩

সুমন্ত
৩৪৭৬৫

শিমুল
৩৪৭৬৬

মহিউদ্দিন
৩৪৭৬৭

সাগর
৩৪৭৬৮

মাহমুদুল
৩৪৭৬৯

রকিবুল
৩৪৭৭০

ইয়াছিন
৩৪৭৭১

রোমান
৩৪৭৭৩

সজল
৩৪৭৭৪

শোভন
৩৪৭৭৫

মাসুদ
৩৪৭৭৬

শামিম
৩৪৭৭৭

রাজু
৩৪৭৭৮

ওলিউল্লাহ
৩৪৭৭৯

ইকবাল
৩৪৭৮০

ইমন
৩৪৭৮২

নাসিম
৩৪৭৮৩

মেহেদী
৩৪৭৮৪

কাওসার
৩৪৭৮৫

হৃদয়
৩৪৭৮৬

আলমগীর
৩৪৭৮৭

আশরাফ
৩৪৭৮৮

মিনহাজ
৩৪৭৮৯

মামুন
৩৪৭৯০

তানজিদ
৩৪৭৯১

তানভির
৩৪৭৯২

আরিফ
৩৪৭৯৩

মনির
৩৪৭৯৪

সাখাওয়াত
৩৪৭৯৫

হাবিব
৩৪৭৯৬

ইনজামাম
৩৪৭৯৭

মনজুর
৩৪৭৯৮

রুমান
৩৪৭৯৯

সাহেদ
৩৪৮০০

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

রাহুল	সামির	ইকরা	মেহেদি	নেয়ামুল	নাফি	ইভান
৩৪৮০২	৩৪৮০৩	৩৪৮০৪	৩৪৮০৫	৩৪৮০৬	৩৪৮০৭	৩৪৮০৮

আবিদ	শফিকুর	হুসাইন	রিয়াদ	আদর	হাসানাত	ফাহিম
৩৪৮০৯	৩৪৮১০	৩৪৮১২	৩৪৮১৩	৩৪৮১৪	৩৪৮১৫	৩৪৮১৬

ইমন	আশরাফ	শামসুল	সাবেত	সাকিব	আশরাফুল	আশিক
৩৪৮১৭	৩৪৮১৮	৩৪৮২০	৩৪৮২১	৩৪৮২২	৩৪৮২৪	৩৪৮২৫

তুরান	অনিক	টিটু	রিমন	শিহাব	রুমান	আকাশ
৩৪৮২৬	৩৪৮২৭	৩৪৮২৮	৩৪৮২৯	৩৪৮৩০	৩৪৮৩১	৩৪৮৩৩

ফুয়াদ	ফিরোজ	মুরাদ	মাকসুদ	নাহিন	মালেক	সাব্বির
৩৪৮৩৪	৩৪৮৩৫	৩৪৮৩৬	৩৪৮৩৭	৩৪৮৩৮	৩৪৮৩৯	৩৪৮৪৩

শরিফ	রাব্বি	ওমর	মোয়াজ্জেম	নাহিদ	নিলয়	রিফাত
৩৪৮৪৪	৩৪৮৪৫	৩৪৮৪৬	৩৪৮৪৭	৩৪৮৪৮	৩৪৮৪৯	৩৪৮৫০

মেহেদী	অরন্য	নাঈম	জামী	আতিক	শরীফ	শাহরিয়ার
৩৪৮৫১	৩৪৮৫২	৩৪৮৫৩	৩৪৮৫৪	৩৪৮৫৫	৩৪৮৫৭	৩৪৮৫৮

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

সিয়াম
৩৪৮৫৯

অয়ন
৩৪৮৬০

অভিষেক
৩৪৮৬২

সাঈম
৩৪৮৬৩

মাহমুদুল
৩৪৮৬৪

জাকির
৩৪৮৬৫

মেহেদী
৩৪৮৬৬

রিজম
৩৪৮৬৭

আজিজ
৩৪৮৬৮

নাঈম
৩৪৮৬৯

নাইম
৩৪৮৭০

সুমন
৩৪৮৭১

রাফি
৩৪৮৭২

নাজমুল
৩৪৮৭৪

সাকিব
৩৪৮৭৫

সাঈদ
৩৪৮৭৬

সজিব
৩৪৮৭৭

ইয়াসিন
৩৪৮৮০

ইয়াসিন
৩৪৮৮১

মুজাহিদ
৩৪৮৮৩

আকিবুল
৩৪৮৮৪

হাসিব
৩৪৮৮৫

মাহমুদুল
৩৪৮৮৬

প্রিয়ম
৩৪৮৮৯

তুষার
৩৪৮৯১

মাকসুদুল
৩৪৮৯২

মেহেদী
৩৪৮৯৩

হাফিজুর
৩৪৮৯৪

পিয়াল
৩৪৮৯৫

সাজ্জাদ
৩৪৮৯৬

রিফাত
৩৪৮৯৭

নওশাদ
৩৪৮৯৮

আবিদ
৩৪৮৯৯

রনি
৩৪৯০০

ফাহিম
৩৪৯০১

শুভ
৩৪৯০২

আলকিন
৩৪৯০৩

জুবায়ের
৩৪৯০৪

দুর্লভ
৩৪৯০৫

নাহিদ
৩৪৯০৬

আতিকুর
৩৪৯০৭

সাব্বির
৩৪৯০৮

রাইয়ান
৩৪৯১০

আবির
৩৪৯১১

নাফিস
৩৪৯১২

অনিক
৩৪৯১৩

শাহরিয়ার
৩৪৯১৫

রবিন
৩৪৯১৬

সৌরভ
৩৪৯১৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

হাসনাত ৩৪৯১৯

সিদ্দিক ৩৪৯২০

মিরাজ ৩৪৯২১

সোহান ৩৪৯২২

সরকার ৩৪৯২৪

সাঈদ ৩৪৯২৫

সামি ৩৪৯২৬

সাজ্জাদ ৩৪৯২৮

ইয়াসিন ৩৪৯২৯

আমান ৩৪৯৩০

আদিব ৩৪৯৩১

রাজু ৩৪৯৩২

মিরাজ ৩৪৯৩৩

শুভ ৩৪৯৩৪

রায়হান ৩৪৯৩৬

শামীম ৩৪৯৩৭

নাঈম ৩৪৯৩৮

আহাম্মদ ৩৪৯৩৯

সিফাত ৩৪৯৪০

রায়হান ৩৪৯৪১

সাগর ৩৪৯৪২

আশরাফুল ৩৪৯৪৩

সাকের ৩৪৯৪৫

জাহিদ ৩৪৯৪৬

শাওন ৩৪৯৪৭

মামুন ৩৪৯৪৮

তাহসীন ৩৪৯৪৯

সাখাওয়াত ৩৪৯৫০

শিক্ষার্থী পরিচিতি

অনার্স ও মাস্টার্স

ইংরেজি বিভাগ

বি. এ (সম্মান) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

প্রমি
৪৫৩

তানজিলা
৪৫৪

মামুন
৪৫৫

লিমন
৪৫৬

হ্যারিক
৪৫৭

শাম্মি
৪৫৮

বকুল
৪৬০

শাহানা
৪৬১

জেনিফার
৪৬২

সাকিবুর
৪৬৩

সুলতানা
৪৬৪

জাহিদুল
৪৬৫

আলিফ
৪৬৬

তরিকুল
৪৬৭

আসাদুল
৪৬৮

বিল্লাল
৪৬৯

শামীমা
৪৭০

সাহাবুদ্দীন
৪৭১

মেহেদী
৪৭২

অপু
৪৭৩

আসাদুজ্জামান
৪৭৪

রাজ্জাক
৪৭৫

আতিকুজ্জামান
৪৭৬

আফসানা
৪৭৭

পারভেজ
৪৭৮

হোসাইন
৪৭৯

অর্ণিবান
৪৮০

সজল
৪৮১

ফয়সাল
৪৮২

রুবেল
৪৮৩

সুশীল
৪৮৪

মোমিনুল
৪৮৫

রিদওয়ান
৪৮৭

মিলন
৪৮৮

সুলতানা
৪৯০

অরিন্দম
৪৯১

মাহমুদুর
৪৯২

আব্দুল্লাহ
৪৯৩

নোমান
৪৯৪

মুরাদ
৪৯৫

রায়হান
৪৯৭

সাব্বির
৪৯৮

বি. এ (সম্মান) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

অপু
৪৯৯

সবুজ
৫০০

সানাউল
৫০২

মেহেদী
৫০৩

মোহন
৫০৪

শাহরিয়ার
৫০৫

ছামিনুল
৫০৬

রাসেল
৫০৭

ওমর
৫০৮

অজয়
৫০৯

শুভ
৫১০

বি. এ (সম্মান) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

রুবাইয়া
৪৪৪

শারমিন
৪৪৫

সুমাইয়া
৪৪৬

মেহনাজ
৪৪৭

ঊর্মি
৪৪৮

স্বর্ণা
৪৪৯

ঐশী
৪৫০

ফৌজিয়া
৪৫১

বি. এ (সম্মান) ৩য় বর্ষ (নতুন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

নওরীন
৪৩৭

ঐশী
৪৪১

বি. এ (সম্মান) ৩য় বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

মাজেদা ৪২৩

মিজানুর ৪২৪

মুঈদ ৪২৫

নুজহাত ৪২৬

রাহনুমা ৪২৮

জান্নাত ৪২৯

সানজিদা ৪৩০

খালেক ৪৩১

মুক্তা ৪৩২

ঝুটন ৪৩৩

আফরানা ৪৩৫

মাহমুদুল ৪৩৬

বি. এ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১

ফারহানা ৪১৪

নওশীন ৪১৫

যোসেফ ৪১৬

বদরুদ্দোজা ৪১৭

আফরিন ৪২১

এম. এ শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

মারিয়া ৩৩

ইয়াছিন ৩৪

মাসুদুর ৩৫

মেরিনা ৩৬

তানবীন ৩৭

তারান্নুম ৩৮

তাসনিম ৩৯

ফারহানা ৪০

আতিক ৪১

আকিব ৪২

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বি বি এ (অনার্স) ১ম বর্ষ
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

নূরজাহান
১০৯৭

তৃষ্ণা
১০৯৮

সুমাইয়া
১০৯৯

আফসানা
১১০০

নাযাহ্
১১০১

সুলতানা
১১০২

তামান্না
১১০৩

ফারহানা
১১০৪

তাবাছছুম
১১০৫

নুরুন্নাহার
১১০৬

ফিরোজ
১১০৯

সোহানুর
১১১০

রাজু
১১১১

মোশারফ
১১১৩

তানভির
১১১৬

রাবেয়া
১১১৭

সাখাওয়াত
১১১৮

জাবেদ
১১১৯

কাণিজ
১১২০

জাহিদুল
১১২১

মেহেদী
১১২২

সোহাগ
১১২৩

পিংকি
১১২৫

পারভেজ
১১২৬

তানজিলা
১১২৭

নাদিম
১১২৯

নজরুল
১১৩০

মরিয়ম
১১৩১

রহিম
১১৩২

শাকিলা
১১৩৪

আতাউর
১১৩৫

শাহিন
১১৩৬

রমজান
১১৩৭

অদিতি
১১৩৯

রকিবুল
১১৪৩

আল আমিন
১১৪৪

শাহাদাত
১১৪৬

রশিদ
১১৪৭

জাফর
১১৪৮

মোয়াজ্জেম
১১৪৯

প্রসেন জীৎ
১১৫২

আল আমিন
১১৫৩

বি বি এ (অনার্স) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

সায়েদ
১১৫৫

মিমি
১১৫৭

তুষার
১১৫৮

মামুন
১১৫৯

মাহিম
১১৬০

তানভীর
১১৬১

উজ্জ্বল
১১৬২

নাদিম
১১৬৫

বি বি এ (অনার্স) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

মৌসুমী
১০৪৪

সামিয়া
১০৪৭

মাহ্‌ফুজা
১০৪৮

সাকিল
১০৫২

রুম্মান
১০৫৮

আশরাফুল
১০৫৯

মেহেদী
১০৬০

ফারজানা
১০৬১

বৃষ্টি
১০৬২

মারিয়া
১০৬৩

নাজমুল
১০৭৯

রফিকুল
১০৮০

রব্বানি
১০৮১

ফারুক
১০৮২

তানবীর
১০৮৪

বাধন
১০৮৫

নাসির
১০৮৬

রিফাত
১০৮৭

বেল্লাল
১০৮৮

শিমুল
১০৮৯

ইমরান
১০৯৪

তাহ্‌সিন
১০৯৬

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ (নতুন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

তানজিদা
১০০১

সানজিদা
১০০২

আজিজুল
১০০৫

গিয়াস
১০০৬

নাদিম
১০০৭

ইশরাত
১০০৮

মাজহারুল
১০০৯

একরাম
১০১২

মাসুদ
১০১৪

মুনতাসির
১০১৬

তাজিমুল
১০১৭

নাছিরুল
১০২০

তানভীর
১০২১

শাহরিয়ার
১০২৩

তানজির
১০২৬

হৃদয়
১০৩০

মাহমুদুর
১০৩১

নাদিয়া
১০৩৭

হাদিস
১০৩৮

জাহিদুল
১০৪০

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

মিতা
৯২৮

সালেহা
৯২৯

আয়েশা
৯৩০

সীমা
৯৩১

সুলতানা
৯৩৩

তিশা
৯৩৪

তৃষ্ণা
৯৩৫

ফারহানা
৯৩৭

আজমেরী
৯৩৮

শাহনাজ
৯৩৯

খালেদ
৯৪১

আরাফাত
৯৪২

বোরহান
৯৪৩

হাসিবুল
৯৪৪

নাজমুল
৯৪৫

সানভী
৯৪৬

রাসেল
৯৪৮

আশিকুর
৯৪৯

ইফতেখারুল
৯৫১

সানোয়ার
৯৫২

জনিয়ন
৯৫৩

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

প্রশান্ত
৯৫৫

নুরজাহান
৯৫৭

নিশাত
৯৫৮

শারমিন
৯৬০

মিয়াদ
৯৬৪

ফয়েজ
৯৬৫

আসমা
৯৬৬

মারিহা
৯৭১

আরিফ
৯৭২

তানিয়া
৯৭৩

এনিমা
৯৭৪

শামসুল
৯৭৮

দয়াময়
৯৭৯

কামরুল
৯৮০

জুয়েল রানা
৯৮১

জুয়েল খান
৯৮২

কামাল
৯৮৩

মেহেদী
৯৮৫

রাসেল
৯৮৬

রাশেদুজ্জামান
৯৮৭

মিঠুন
৯৮৮

অমিত
৯৯১

আলমগীর
৯৯৫

রাশেদ
৯৯৭

সাইফুল
৯৯৮

বি বি এ (অনার্স) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১

রওশন
৯০২

হ্যাপী
৯০৩

লিজা
৯০৪

মাসুমা
৯০৫

ইয়াসমিন
৯০৬

ফাতেমা
৯০৯

মৌমিতা
৯১০

সাকিব
৯১১

মোস্তাফিজুর
৯১৩

গালিব
৯১৬

শাহপরান
৯১৭

মোহাইমিনুল
৯১৮

রাফিউদ্দিন
৯২২

জাহিদ
৯২৫

এম.বি.এস, শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

নিপা ৩১৩

তানিয়া ৩১৪

তামিমা ৩১৫

মুনিরা ৩১৬

বৃষ্টি ৩১৭

নাহিদা ৩১৮

নিথীলা ৩১৯

সানজিদা ৩২০

মামুন ৩২১

রাতেব ৩২২

খালিদ ৩২৩

পাপড়ি ৩২৪

রফিকুল ৩২৫

সবুজ ৩২৬

মোর্শেদুর ৩২৭

কাওসার ৩২৮

নাহিদ ৩২৯

নাসিমুল ৩৩০

৩৩১

নৃপেন ৩৩২

শুকলা ৩৩৩

রাবেয়া ৩৩৪

রিদওয়ান ৩৩৫

পদ্ম ৩৩৬

স্বপ্না ৩৩৭

পাপিয়া ৩৩৮

সাবরিনা ৩৩৯

খায়রুল ৩৪০

সোহেল ৩৪১

শুভ্রত ৩৪২

তাসলিমা ৩৪৩

নাসির ৩৪৪

মোস্তাফিজুর ৩৪৫

হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ

বি বি এ (অনার্স) ১ম বর্ষ
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

মৌ
১২৬১

শিশু
১২৬২

জাকিয়া
১২৬৩

মাহবুবা
১২৬৪

ঝুমা
১২৬৫

মাশরিয়া
১২৬৬

রুবি
১২৬৭

শিরিন
১২৬৮

প্রত্যাশা
১২৬৯

কানিজ
১২৭০

অন্তু
১২৭১

হালিমা
১২৭৩

রুমেলী
১২৭৪

সায়মা
১২৭৫

সাদিয়া
১২৭৭

অনন্যা
১২৭৮

মুনজিলা
১২৭৯

সুরমা
১২৮০

মুঈন
১২৮১

তরিকুল
১২৮২

নিলয়
১২৮৩

মুহিদ
১২৮৪

আল আমিন
১২৮৫

মাহফুজুল
১২৮৬

ফারহান
১২৮৭

জিসান
১২৯২

সাইফুল
১২৯৩

বাবু
১২৯৪

রিয়ান
১২৯৫

রাব্বি
১২৯৬

নাবির
১২৯৭

মিজানুর
১২৯৯

বলয়
১৩০০

জাহিদ
১৩০১

আফজাল
১৩০৪

নাফিজ
১৩০৫

তরিকুল
১৩০৬

জীবন
১৩০৭

পার্থ
১৩০৯

সদয়
১৩১০

রাব্বানি
১৩১১

আমিনুল
১৩১২

বি বি এ (অনার্স) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

সেলিম
১৩১৫

আরিফ
১৩১৬

কেয়া
১৩১৯

ইলা
১৩২০

সোনিয়া
১৩২২

আরিফুজ্জামান
১৩২৩

রাকিবুল
১৩২৪

রিয়ান
১৩২৫

খোরশেদ
১৩২৬

তৃষা
১৩২৮

শামিম
১৩৩২

মোনাজুল
১৩৩৩

স্বজন
১৩৩৪

কাদের
১৩৩৬

দীপ্ত
১৩৩৭

কেয়া
১৩৪০

হাসানাত
১৩৪২

বাবুল
১৩৪৪

আফসানা
১৩৪৫

আকতার
১৩৪৬

ফাহিম
১৩৪৭

শাহরিয়ার
১৩৪৮

আফসানা
১১৯০

বি বি এ (অনার্স) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

ফাতেমা
১১৮৭

আফিয়া
১১৮৮

সাবরিনা
১১৮৯

সোমা
১১৯১

জান্নাতুল
১১৯২

সায়মা
১১৯৪

অনিকা
১১৯৬

তানজিলা
১১৯৭

শ্যামলী
১১৯৯

মার্জিয়া
১২০০

শায়লা
১২০২

সানজিদা
১২০৫

কাওসার
১২০৭

হৃদয়
১২০৮

বি বি এ (অনার্স) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

তৌফাতুন ১২০৯	ওমরফারুক ১২১০	রাব্বি ১২১১	শাওন ১২১২	সাজ্জাদ ১২১৩	প্রণয় ১২১৮	ইমরান ১২১৯

সাজ্জাদ ১২২০	নাজমুল ১২২১	অমিত ১২২২	সাঈদ ১২২৩	নূর ১২২৪	মামুন ১২২৫	আরাফাত ১২২৬

সৈকত ১২২৭	অন্তু ১২২৮	তাশরীকুর ১২২৯	রুম্মান ১২৩০	রাশেদুল ১২৩১	জাহের ১২৩২	ফাহিম ১২৩৩

তৌহিদুল ১২৩৪	ফারদিন ১২৩৫	সাইমুন ১২৩৬	সায়েল ১২৩৭	নাজমুল ১২৩৮	হাসেম ১২৩৯	নারায়ণ ১২৪০

সীমান্ত ১২৪১	সজীব ১২৪২	মোস্তাইন ১২৪৩	নেহাল ১২৪৫	বেলায়েত ১২৪৬	রাকিব ১২৪৭	সাইদ ১২৪৯

বিল্লাল ১২৫০	রাজু ১২৫১	মুশফিকুর ১২৫২	আলআমীন ১২৫৩	কাদের ১২৫৪	ইমাম ১২৫৬	রাজিয়া ১২৫৭

শরীফ
১১৮২

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ (নতুন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

রাজিয়া
১১১০

ফারিয়া
১১১১

ইভা
১১১৩

আহরিন
১১১৪

তাহিরা
১১১৫

স্বর্ণা
১১১৬

অনন্যা
১১১৭

ফারিয়া
১১১৮

ফাইজা
১১১৯

আশা
১১২০

সাদিয়া
১১২৩

হাফিজা
১১২৪

শারমিন
১১২৫

সুবর্ণা
১১২৭

মাহফুজা
১১২৮

খুশবু
১১২৯

সখিনা
১১৩০

শবনম
১১৩১

রায়হানা
১১৩২

সানজিদা
১১৩৩

আনিছুর
১১৩৪

শরিফুল
১১৩৫

নাজমুল
১১৩৬

রকি
১১৩৭

শামিম
১১৩৯

রাসেল
১১৪০

আরিফ
১১৪২

আল-আমিন
১১৪৪

হাসানুজ্জামান
১১৪৭

সালাম
১১৪৮

নূর
১১৪৯

ইসমাইল
১১৫০

ইমরান
১১৫১

শাকিবুর
১১৫৪

রাব্বি
১১৫৫

রিপন
১১৫৬

বুলবুল
১১৫৭

আশরাফুল
১১৫৮

জোবায়ের
১১৫৯

হাসিবুর
১১৬০

আরিফ
১১৬৪

সোলেমান
১১৬৫

নূরুল
১১৬৬

আশরাফুল
১১৬৯

মারজান
১১৭০

ফয়সাল
১১৭১

শহিদুল
১১৭২

আরিফুল
১১৭৩

তাহমিনা
১১৭৪

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ (নতুন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

রাফসান ১১৭৬	মোজাহিদ ১১৭৭	শাকিল ১১৭৮	দিপু ১১৮০	তানভীর ১১৮১	মারিয়া ১১৮৩	তাহলিমা ১১৮৪

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ, (পুরাতন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

হাসি ১০২৩	তাহমিদা ১০২৫	পাপিয়া ১০২৬	ইসমা ১০২৭	আয়শা ১০২৮	জলি ১০৩০	ছালমা ১০৩১

আছমাউল ১০৩২	রুবাইয়া ১০৩৪	শাম্মী ১০৩৫	তন্বী ১০৩৬	মোহসেনা ১০৩৭	সুমাইয়া ১০৩৮	সোনিয়া ১০৪০

স্বর্ণা ১০৪১	মাহিনা ১০৪২	মনিকা ১০৪৪	সুভদ্রা ১০৪৬	দিপ্তী ১০৪৭	রাশেদুজ্জামান ১০৪৯	রাজন ১০৫০

সাজ্জাদ ১০৫২	মাহবুব ১০৫৩	কাওসার ১০৫৪	মেহেদী ১০৫৫	শরিফুল ১০৫৭	হাবিবুর ১০৫৯	জসীম ১০৬০

গৌতম ১০৬২	সাইদুর ১০৬৩	শাহনেওয়াজ ১০৬৪	ওসমান ১০৬৭	তুহিন ১০৬৯	রতন ১০৭০	মারুফ ১০৭১

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

হাসনাইন
১০৭২

কামরুল
১০৭৪

রিয়াদ
১০৭৮

মুশফিকুর
১০৮০

রিয়াদ
১০৮১

মাহমুদুল
১০৮২

সৌরভ
১০৮৩

বিজয়
১০৮৪

নবীন
১০৮৬

আল মামুন
১০৮৭

শামীম
১০৯১

শাহ্ আলম
১০৯২

মাছুম
১০৯৫

ফয়সাল
১০৯৬

হোসাইন
১০৯৯

আল মামুন
১১০১

কার্তিক
১১০৩

তানবিবুর
১১০৫

নুর আলী
১১০৮

বি বি এ (অনার্স) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১

ফাতেমা
৯৫৯

সায়মা
৯৬১

জান্নাতুল
৯৬৩

রিফাত
৯৬৪

জেরিন
৯৬৫

ফারজানা
৯৬৬

ফাতেমা
৯৭২

মাহফুজা
৯৭৩

সামিয়া
৯৭৫

নিপা
৯৭৬

ছালমা
৯৭৭

ফারজানা
৯৭৮

শাহরিন
৯৭৯

আইরিন
৯৮০

সামাহার
৯৮১

আসমা
৯৮২

সবুজ
৯৮৫

শহিদুল
৯৮৬

শামীম
৯৮৭

শরিফুল
৯৮৮

শাদমান
৯৮৯

বি বি এ (অনার্স) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১

সাইফুল
৯৯১

প্রিন্স
৯৯২

ফাহাদ
৯৯৪

জাহিদুল
৯৯৫

মিরাজ
৯৯৬

আজিজুর
৯৯৮

তপু
৯৯৯

সামিউর
১০০০

রুমেন
১০০৩

টুটুল
১০০৪

রিপো
১০০৫

তুষ
১০০৬

প্রসেনজিৎ
১০০৮

আরমান
১০০৯

রাজ
১০১০

কাউছার
১০১২

সাজ্জাদ
১০১৩

রাজিবুল
১০১৪

আল-আমিন
১০১৫

জিয়া
১০১৬

জামিল
১০১৯

ইশতিয়াক
১০২০

নাঈম
১০২২

রেজা
৯১৭

এম বি এস (ফাইনাল) শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

জেসমিন
৩৫৮

মিরানা
৩৫৯

রুমানা
৩৬০

নুসরাত
৩৬১

রুহী
৩৬২

তন্বী
৩৬৩

সুমাইয়া
৩৬৪

খাদিজা
৩৬৫

সাথী
৩৬৬

লিজা
৩৬৭

সেজুতি
৩৬৮

সুমী
৩৬৯

তৌহিদা
৩৭০

সাবরিনা
৩৭১

এম বি এস (ফাইনাল) শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

ইশরাত
৩৭২

নাজমুন্নাহার
৩৭৩

ইফফাত
৩৭৪

রোকসানা
৩৭৫

মুস্তফিজুর
৩৭৬

মিরাজ
৩৭৭

আনিসুল
৩৭৮

রহমত উল্লাহ্
৩৭৯

আব্দুর রউফ
৩৮০

মুরাদ
৩৮১

আরিফুল
৩৮২

মাহবুব
৩৮৩

ইমরান
৩৮৪

কামরুল
৩৮৫

জাহিদুল
৩৮৬

শাহরিয়ার
৩৮৭

এজাজ
৩৮৮

আশরাফুল
৩৮৯

একরামুল
৩৯০

রাবেয়া
৩৯১

আফরিনা
৩৯২

নিশাত
৩৯৩

শফিকুল
৩৯৪

তন্ময়
৩৯৫

দিলজুয়ারা
৩৯৬

কাকলী
৩৯৭

ফারজানা
৩৯৮

লুবনা
৩৯৯

শ্যামলী
৪০০

মিঠুন
৪০১

মুশতাক
৪০২

জুয়েল
৪০৩

ইমরান
৪০৪

মাহবুবুর
৪০৫

মার্কেটিং বিভাগ

বি বি এ (অনার্স) ১ম বর্ষ

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

তাসনিমা
১১৩০

তাহানিমা
১১৩১

মৌ
১১৩২

সামিয়া
১১৩৩

স্মৃতি
১১৩৪

রেশমা
১১৩৫

অমি
১১৩৬

সাদিয়া
১১৩৭

পারভেজ
১১৩৮

নাঈম
১১৩৯

আদনান
১১৪০

মিরাজ
১১৪১

বাসেত
১১৪২

মশিউর
১১৪৩

মুজিব
১১৪৪

নাহিদুর
১১৪৫

নিলয়
১১৪৬

শামসুল
১১৪৯

মাহাবুব
১১৫০

সুদিপ
১১৫১

বিজন
১১৫২

রাসেল
১১৫৩

সাব্বির
১১৫৪

শরীফ
১১৫৫

সজীব
১১৫৬

তুর্যয়
১১৫৭

সা-আদ
১১৫৮

আনোয়ারুল
১১৫৯

হাসিব
১১৬০

আরিফ
১১৬১

তৌকির
১১৬২

সাইফুল
১১৬৪

শরীফ
১১৬৫

আফরোজা
১১৬৬

আশেক
১১৬৭

ফরহাদ
১১৬৮

সাথী
১১৬৯

ফয়সাল
১১৭০

মৌসুমী
১১৭১

আবু বকর
১১৭৪

মারুফ
১১৭৬

সাঈদ
১১৭৭

বি বি এ (অনার্স) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

মোস্তফা
১১৭৮

অর্ণব
১১৮০

শামসুল
১১৮২

জুবাইয়া
১১৮৩

তানিয়া
১১৮৪

সুজন
১১৮৫

কাউছার
১১৮৬

মুকিত
১১৮৭

শোয়েব
১১৮৮

জামিল
১১৮৯

মিনহাজুল
১১৯০

নাঈম
১১৯১

শফিক
১১৯২

আফরি
১১৯৬

শুভংকর
১১৯৭

সবুর
১১৯৮

রুবেল
১১৯৯

অপূর্ব
১২০০

সোহেল
১২০১

ইজাজুল
১২০৩

আয়েশা
১২০৪

খালিদ
১২০৫

রাব্বি
১২০৭

টিপু
১২১০

মাসুম
১১২৪

বি বি এ (অনার্স) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

জেনিফার
১০৬৩

শেফা
১০৬৪

আফসানা
১০৬৫

প্রিয়া
১০৬৬

রিমা
১০৬৭

সোনিয়া
১০৬৮

জেসমিন
১০৬৯

শ্রাবনী
১০৭০

বেলী
১০৭১

কেয়া
১০৭২

কামরুল
১০৭৩

মমিনুল
১০৭৪

আতিক
১০৭৫

মাহিম
১০৭৬

বি বি এ (অনার্স) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

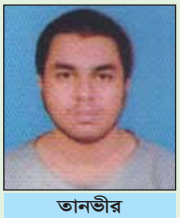

তানজীম ১০৭৭ | লালচাঁন ১০৭৮ | তারিকুন ১০৮০ | তুহিন ১০৮১ | নাজমুল ১০৮৫ | অর্নব ১০৮৬ | মাহাবুব ১০৮৭

রিতু ১০৮৮ | রাশেদুল ১০৯০ | সামসুজ্জোহা ১০৯১ | তানভীর ১০৯২ | রিপন ১০৯৩ | সোহাগ ১০৯৪ | শৌভিক ১০৯৫

মোল্লা ১০৯৭ | সিমন ১০৯৮ | হৃদয় ১০৯৯ | রিয়াজ ১১০১ | আল-আমিন ১১০২ | লুৎফর ১১০৩ | রফিক ১১০৪

হৃদম ১১০৬ | মুন্নী ১১০৮ | ইমরান ১১১০ | আরিফুর ১১১২ | রায়হান ১১১৩ | সাজিদ ১১১৬ | সাদিকা ১১১৭

ইরা ১১১৮ | নাহিয়ানুজ্জামান ১১১৯ | আল-আমিন ১১২০ | তামান্না ১১২১ | সোহাগ ১১২৩ | আরিফ ১১২৫ | মামুন ১১২৬

অথৈ ১১২৭ | সম্রাট ১১২৮ | সুমন ১০৫৫

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ (পুরাতন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

শারমিন
৯৫২

তাঈন
৯৫৩

আঁখি
৯৫৪

সুমাইয়া
৯৫৫

অনন্যা
৯৫৬

সায়মা
৯৫৭

রাজিয়া
৯৫৮

শান্তা
৯৫৯

রাহিমা
৯৬০

উর্মি
৯৬১

নাহিদ
৯৬২

শাহ্নুর
৯৬৫

রাহী
৯৬৮

মাহিনুর
৯৭০

জিয়া
৯৭১

হারুন-অর-রশিদ
৯৭২

আশিক
৯৭৩

জাহাঙ্গীর
৯৭৫

রাশেদ
৯৭৬

ফকরুল
৯৭৮

শাকিল
৯৭৯

সামশুর
৯৮০

আউয়াল
৯৮৩

রিয়াজ
৯৮৬

সানজিদা
৯৮৭

ইশরাত
৯৮৮

রেজভী
৯৮৯

আরিফ
৯৯০

সবুজ
৯৯১

রিয়াদ
৯৯২

তুষার
৯৯৪

আলীফ
৯৯৫

রহমত
৯৯৭

মাহমুদুল
১০০০

জয়
১০০১

সাব্বির
১০০২

মামুন
১০০৩

সাব্বির
১০০৬

করিম
১০০৭

ফার্সি
১০০৮

রিফাত
১০০৯

সাদ্দাম
১০১০

তাহসিন
১০১১

রিয়াজ
১০১৫

তাহের
১০১৭

শহীদ
৯২৪

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ (নতুন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

সোনিয়া ১০১৮ | লিজা ১০১৯ | ইফফাত ১০২০ | মুশফিক ১০২২ | শরীফ ১০২৬ | ইকবাল ১০২৭ | ফরহাদ ১০২৮

প্রসেনজিৎ ১০২৯ | শিশির ১০৩০ | মেহেদী ১০৩২ | সোয়েব ১০৩৩ | কাদের ১০৩৪ | তুষার ১০৩৭ | ইমরান ১০৩৮

সজীব ১০৪০ | আবু বকর ১০৪২ | সামিউল ১০৪৩ | সজীব ১০৪৫ | হাসিব ১০৪৯ | সুমন ১০৫১ | অপূর্ব ১০৫২

আশরাফ ১০৫৮ | রাসেল ১০৬০ | শাহেদ ১০৬১ | ফাহমিদা ১০৬২ | রনি ৮৬৩ | সামাদ ৯৬৯

বি বি এ (অনার্স) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১

কথা ৮৯২ | ফারিয়াহ ৮৯৫ | মাহমুদা ৮৯৯ | নূর ৯০১ | আহসান ৯০২ | সঞ্জয় ৯০৪ | চঞ্চল ৯০৫

জাহিদুল ৯০৬ | ইয়াছির ৯১০ | বিকাশ ৯১৩ | সেতু ৯১৪ | মাহমুদা ৯১৫ | জান্নাত ৯১৬ | আশরাফ ৯২০

বি বি এ (অনার্স) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১

আনিস
৯২১

ইমদাদ
৯২৩

আশরাফ
৯২৫

আখের
৯২৬

হাসান
৯২৭

জাকির
৯২৮

সাদেক
৯৩১

মারুফ
৯৩২

তাসলিমা
৯৩৫

জিয়াউল
৯৩৭

জিয়া
৯৩৮

সাগর
৯৪০

পারভেজ
৯৪২

কৌশিক
৯৪৪

শহিদ
৯৪৫

সায়মা
৯৪৬

মুরাদ
৯৪৭

এম বি এস, শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

তীথি
৩২৫

রিতু
৩২৬

রিফাত
৩২৭

যুথী
৩২৮

ফারহানা
৩২৯

জেসী
৩৩০

সায়মা
৩৩১

মাহামুদুর
৩৩৩

নয়ন
৩৩৪

শরীফ
৩৩৫

সোহেল
৩৩৬

আরমান
৩৩৭

তারিক
৩৩৮

আফজাল
৩৩৯

অমিতাভ
৩৪০

জামান
৩৪১

মারিয়া
৩৪২

তামান্না
৩৪৩

কাকন
৩৪৪

বকাউল
৩৪৫

ইমরান
৩৪৬

এম বি এস, শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

প্রসেনজিৎ
৩৪৭

সাগর
৩৪৮

আসাদ
৩৪৯

শামীম
৩৫০

ইফফাত
৩৫১

রনি
৩৫২

সালমা
৩৫৩

ইলোরা
৩৫৪

রাহাত
৩৫৫

আরিফ
৩৫৬

রাতুল
৩৫৭

হামিদ
৩৫৮

ইশরাত
৩৫৯

জনী
৩৬১

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

বি বি এ (অনার্স) ১ম বর্ষ
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

সানজিদা
১১৪৭

সুমাইয়া
১১৪৮

শারমিন
১১৪৯

জেনি
১১৫০

সুনিরা
১১৫১

সুমাইয়া
১১৫২

শাবরিনা
১১৫৩

আনিকা
১১৫৪

কাফন
১১৫৫

নাসরিন
১১৫৬

ফাতেমা
১১৫৭

শারমিন
১১৫৮

তিশা
১১৫৯

স্বর্না
১১৬০

নাহার
১১৬১

জুই
১১৬২

অঙ্কু
১১৬৩

তুলি
১১৬৪

রাইশা
১১৬৫

ফারজানা
১১৬৬

সাইদুর
১১৬৭

রাকিব
১১৬৯

শান্ত
১১৭০

জয়নুল
১১৭১

তাজউদ্দিন
১১৭২

মিলন
১১৭৩

হাসান
১১৭৪

হাসনাত
১১৭৫

আনোয়ার
১১৭৬

শাহিদ
১১৭৭

রবিন
১১৭৮

ফয়সাল
১১৭৯

আরাফাত
১১৮০

ইমরান
১১৮১

আফরান
১১৮২

নিশাত
১১৮৩

রাফাত
১১৮৪

সাইফ
১১৮৬

সামাদ
১১৮৭

নাজমুল
১১৮৮

সাইদুর
১১৮৯

প্রান্ত
১১৯০

বি বি এ (অনার্স) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

ইমরান
১১৯১

অন্তর
১১৯২

অনুপ
১১৯৩

রাকিব
১১৯৫

হেলাল
১১৯৬

রাশিদ
১১৯৭

মেহেদী
১২০০

ছন্দা
১২০২

ফৌজিয়া
১২০৩

রুবিনা
১২০৪

কিন্তু
১২০৫

আফরিন
১২০৬

নিশ্রা
১২০৮

তানভীর
১২১০

আজমীর
১২১১

মেহজাবীন
১২১২

আরিফ
১২১৩

পংকজ
১২১৪

মিজানুর
১২১৫

বি বি এ (অনার্স) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

রাশেদ
১০৯৩

হামিম
১০৯৪

নিপা
১০৯৫

সুমী
১০৯৬

সোহানা
১০৯৭

ফারহানা
১০৯৯

মনছুর
১১০০

রিফাত
১১০৩

মেহেদী
১১০৪

মৌসুমী
১১০৫

নূরসাবা
১১০৬

শামীমা
১১০৭

মিজানুর
১১০৮

মাহমুদ
১১১০

রিপন
১১১১

প্রনব
১১১২

তাজরিন
১১১৩

স্মৃতি
১১১৪

ফারহানা
১১১৫

জেরিন
১১১৬

জাহাঙ্গীর
১১১৭

শাহাদাত
১১১৮

মার্জিয়া
১১১৯

তাসমিনা
১১২০

নিমাই
১১২১

সাদিয়া
১১২২

ইমরান
১১২৩

সাজ্জাদ
১১২৪

পলাশ
১১২৭

ফাতিমা
১১২৮

ইব্রাহীম
১১২৯

রিয়াদ
১১৩০

নিজাম
১১৩১

সাইদুর
১১৩২

সানজিদা
১১৩৩

বুলবুল
১১৩৪

সজিব
১১৩৫

কাইয়্যুম
১১৩৬

আনোয়ার
১১৩৭

ওয়াসিমা
১১৩৮

তানিয়া
১১৩৯

ফাতেমা
১১৪০

চৈতী
১১৪১

রিদয়
১১৪২

ইয়াছিন
১১৪৩

রেদওয়ান
১১৪৪

মোমেনা
১১৪৫

সাখাওয়াত
১১৪৬

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ (নতুন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

মীম
১০৩৬

রানা
১০৩৭

আমিনুর
১০৩৯

সাব্বির
১০৪০

আশরাফুল
১০৪১

মিতু
১০৪২

মৌ
১০৪৩

হাবিব
১০৪৭

তনু
১০৪৮

মীম
১০৫০

সাব্বিউল
১০৫১

মুক্তি
১০৫২

ইসহাক
১০৫৩

আসিফ
১০৫৪

সুমন
১০৫৫

টুম্পা
১০৫৬

মৌমিতা
১০৫৭

সুরভী
১০৫৮

বিপাশা
১০৫৯

সাজ্জাদ
১০৬০

স্বর্ণা
১০৬১

মাহবুব
১০৬৪

আবুল
১০৬৫

রাবেয়া
১০৬৬

ইশান
১০৬৭

ফুয়াদ
১০৬৮

শামীমা
১০৬৯

সোহান
১০৭১

ফাতেমা
১০৭২

তানিজা
১০৭৩

ইফাতা
১০৭৫

মনির
১০৭৬

নুসরাত
১০৭৭

শোভন
১০৭৮

খাইরুল
১০৭৯

শাকিল
১০৮০

সাজেদুর
১০৮১

শরীফ
১০৮২

জিন্নাত
১০৮৩

সুমন
১০৮৪

মাহমুদ
১০৮৫

রেজা
১০৮৬

ইমতিয়াজ
১০৮৭

মামুন
১০৮৯

শান্তা
১০৯১

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ, (পুরাতন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

ফাতেমা ৯৬৬	নাঈম ৯৬৭	শাকিবুল ৯৬৮	নাজনীন ৯৬৯	তাহসিব ৯৭০	পলাশ ৯৭১	হাসান ৯৭২

সিম্মি ৯৭৩	এহছান ৯৭৪	সামান্তা ৯৭৫	তৌফিক ৯৭৬	সোহাগ ৯৭৭	সৈতক ৯৭৮	সিনথিয়া ৯৭৯

শাহীনুর ৯৮০	সোনিয়া ৯৮২	শারমিন ৯৮৩	তানভির ৯৮৪	আবির ৯৮৫	লিলি ৯৮৭	তারিন ৯৮৮

ফারহানা ৯৮৯	তারেক ৯৯১	রাশেদ ৯৯২	সুমাইয়া ৯৯৩	লিমনু ৯৯৪	তানভীর ৯৯৫	জান্নাতুল ৯৯৬

রনি ১০০০	রুকাইয়া ১০০১	ইব্রাহীম ১০০২	আসিফ ১০০৩	আল-আমিন ১০০৪	জাহিদ ১০০৬	মাইনুদ্দিন ১০০৭

তৌহিদ ১০০৯	জহির ১০১০	শাহিন ১০১১	ইসরাত ১০১২	সফিক ১০১৩	ফারহা ১০১৪	তুহুরা ১০১৬

তানজিয়া ১০১৭	সুরাইয়া ১০১৮	সজীব ১০১৯	নাহিম ১০২০	মাহবুবা ১০২১	আরিফ ১০২২	চয়ন ১০২৪

তৃষ্ণা
১০২৫

আতিক
১০২৬

মাওয়া
১০২৭

মাহবুব
১০২৮

তারিফ
১০২৯

নাদিম
১০৩১

স্মৃতি
১০৩২

কামরুল
১০৩৪

বি বি এ (অনার্স) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১

সাবরিনা
৮৯৯

সাফী
৯০০

নাজমুন
৯০১

তামান্না
৯০২

রুবী
৯০৩

সিমকী
৯০৪

মাবিহা
৯০৫

জেরিন
৯০৬

ইতু
৯০৭

মালিহা
৯০৮

লোপা
৯০৯

নির্ঝর
৯১০

নাসরিন
৯১১

তাসনীম
৯১২

নাজমা
৯১৩

ফারুক
৯১৪

রায়হান
৯১৫

সুব্রত
৯১৬

আনোয়ারুল
৯১৭

হালীসন
৯১৮

রাশেদ
৯১৯

মোরশেদ
৯২০

সেলিম
৯২২

সবুজ
৯২৪

জিকু
৯২৬

ফাহিম
৯২৭

জাহিদ
৯২৮

শাকিল
৯৩০

আহসান
৯৩১

মাসুদ
৯৩২

ফাহমিদা
৯৩৩

তহমিনা
৯৩৪

শারমিন
৯৩৮

সম্পা
৯৩৯

সুমনা
৯৪১

কথা
৯৪২

হাসনা
৯৪৩

মাসুদ
৯৪৫

সুমন
৯৪৬

এলিভা
৯৪৭

সাব্বির
৯৪৮

শামীমা
৯৪৯

সামিয়া
৯৫০

নাবিলা
৯৫১

আরিফ
৯৫২

রাকিব
৯৫৩

সিফাত
৯৫৪

মিনহাজ
৯৫৬

সাইদ
৯৫৭

জান্নাতুল
৯৫৮

সাজিদ
৯৫৯

শামিমুর
৯৬০

মাসুদুর
৯৬১

নাহিদ
৯৬২

ফখরুল
৯৬৩

তাহমিনা
৯৬৪

রিফাত
৯৬৫

এম বি এস, শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

জিসান
৪৭৭

আমিনুল
৪৭৮

নাজমুল
৪৭৯

নাহিদ
৪৮০

ফাহাদ
৪৮১

সৈকত
৪৮২

সৌরভ
৪৮৩

আসিফুল
৪৮৪

আলী
৪৮৫

শাওয়ানা
৪৮৬

তানিয়া
৪৮৭

আবিদ
৪৮৮

ইমতিয়াজচ
৪৮৯

সামিনা
৪৯০

সুমি
৪৯১

সাবেরা
৪৯২

শসানজিদা
৪৯৩

নুসরাৎ
৪৯৪

জুই
৪৯৫

জান্নাত
৪৯৬

সোনিয়া
৪৯৭

মি লি
৪৯৮

আমেনা
৪৯৯

নুরনবী
৫০০

নাজমীন
৫০১

সোমা
৫০২

রুমান
৫০৩

শামীমা
৫০৪

হালিমা
৫০৫

আখি
৫০৬

সুমি
৫০৭

মাহফুজ
৫০৮

দিলরুবা
৫০৯

আয়েশা
৫১০

রাইছান
৫১১

মানসুর
৫১২

জোহরা
৫১৩

ওবায়দুর
৫১৪

ফারজানা
৫১৫

মনিরুজ্জামান
৫১৬

রাজ্জাক
৫১৭

অর্থনীতি বিভাগ

বি.,এস.এস (অনার্স) ১ম বর্ষ
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

ডরিন
৩৫১

রাবেয়া
৩৫২

সজীব
৩৫৪

আফসার
৩৫৫

মিশুক
৩৫৮

দিদার
৩৫৯

রোকসানা
৩৬১

৩৬২

ইমতিয়াজ
৩৬৬

জাহিদ
৩৬৭

সাকিল
৩৬৯

ফয়সাল
৩৭০

রিয়াজ
৩৭২

প্রীতি
৩৭৩

ইতি
৩৭৬

ফয়সাল
৩৭৭

মাসুদ
৩৮০

নুসরাত
৩৮১

তাসনীম
৩৮২

ফরিদ
৩৮৩

সাজিদ
৩৮৫

স্মৃতি
৩৮৬

জব্বার
৩৮৯

বি. এস.এস (অনার্স) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

কাসপিয়া
৩৩৫

শাহনাজ
৩৩৫

মাহফুজ
৩৩৭

নূর আলম
৩৩৮

নিশাত
৩৩৯

দেলোয়ার
৩৪০

হাসানুজ্জামান
৩৪৩

বি. এস.এস (অনার্স) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

মওদুদ
৩৪৫

জাবের
৩৪৬

রেজাউল
৩৪৭

আবু তাহের
৩৪৮

বি. এস. এস (অনার্স) ৩য় বর্ষ (নতুন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

নয়ন
৩১৯

আইরিন
৩২০

ঝুমুর
৩২১

মালিহা
৩২২

ফাতেমা
৩২৩

জাহিদ
৩২৪

মিজান
৩২৫

তাসলিমা
৩২৬

রাসেল
৩২৭

হোসেনে আরা
৩২৮

শাখাওয়াত
৩২৯

শিল্পী
৩৩০

আজাদ
৩৩১

রনি
৩৩৩

সাজ্জাদ
৩৩৪

বি. এস. এস (অনার্স) ৩য় বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

জান্নাতুল
২৯১

সুমন
২৯৩

জোছনা
২৯৪

ফারহানা
২৯৫

জাহিদ
২৯৬

সহিদুল
২৯৭

ফারজানা
২৯৯

বি. এস. এস (অনার্স) ৩য় বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

সাদিয়া
৩০০

আসিফ
৩০৪

সাজেদুল
৩০৫

ইফতেখার
৩০৬

শিহাব
৩০৭

আশরাফুল
৩১০

আলিফুল
৩১১

অনুপ
৩১২

মাসুম
৩১৩

সাব্বির
৩১৪

নিপা
৩১৫

নজরুল
৩১৬

মহিউদ্দিন
৩১৭

বি. এস. এস (অনার্স) ৪র্থ বর্ষ শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১

মিশকাত
২৮৭

তৌফিক
২৮৮

বারেক
২৮৯

প্রান্ত
২৯০

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (ডিবিএ)

বি বি এ (অনার্স) প্রফেশনাল প্রোগ্রাম ১ম বর্ষ ২য় সেমিস্টার
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

আনিকা
৩৩৮

সায়মা
৩৩৯

রাইসা
৩৪০

শারমিন
৩৪১

সানিয়া
৩৪২

ফাহমিদা
৩৪৩

নিশাত
৩৪৪

শাহিদা
৩৪৫

রিপা
৩৪৬

নাজনিন
৩৪৭

মুন
৩৪৮

আসপিয়া
৩৪৯

মার্জিয়া
৩৫০

শিমু
৩৫১

মাহবুবা
৩৫২

সাহারা
৩৫৩

শামীমা
৩৫৪

দোলন
৩৫৫

রাফিয়া
৩৫৬

ডালিয়া
৩৫৭

নুসরাত
৩৫৮

কনিকা
৩৫৯

তানজিলা
৩৬০

তাজনিন
৩৬১

জুয়েনা
৩৬২

ইভা
৩৬৩

স্মৃতি
৩৬৪

ফাতেমা
৩৬৫

লিমা
৩৬৬

তাসমিয়া
৩৬৭

রাইসা
৩৬৮

শাম্মী
৩৬৯

তৃষা
৩৭০

ইলা
৩৭১

সায়মা
৩৭২

সুরভি
৩৭৩

জ্যোতি
৩৭৪

সুমি
৩৭৫

নিলুফার
৩৭৬

মমতাজ
৩৭৭

আল-জাবেরা
৩৭৮

মেহেরুন্নেছা
৩৭৯

১ম বর্ষ ২য় সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-১৫

বর্ষা
৩৮০

মনিরা
৩৮১

মাহমুদ
৩৮২

হামিদ
৩৮৩

মাহমুদুল
৩৮৪

কামরুল
৩৮৫

মিজানুর
৩৮৬

আশিক
৩৮৭

মহিবুর
৩৮৮

ওয়ালি
৩৮৯

মোকসাদুল
৩৯০

রোহিত
৩৯২

নাফিউল
৩৯৬

হাফিজ
৩৯৭

রাব্বি
৩৯৮

নাহিদ
৩৯৯

তাহসিন
৪০০

জ্যাকসন
৪০১

ইমদাদুল
৪০২

রাশেদ
৪০৩

আবদুল্লাহ
৪০৪

আজিজ
৪০৫

রাফি
৪০৬

তাহসিন
৪০৭

মোস্তাফিজ
৪০৮

মাহমুদুল
৪০৯

সাকিব
৪১০

ইমাম
৪১১

রিশাদ
৪১২

রূপক
৪১৩

সোহান
৪১৪

নাসিম
৪১৫

জামিল
৪১৭

তানভির
৪১৮

প্রসেনজিৎ
৪১৯

মোহাইমিনুল
৪২০

শুভ
৪২১

সাইদুর
৪২৩

সাইফুল্লাহ
৪২৪

মাকসুদ
৪২৬

আলিফ
৪২৭

ইমরান
৪২৮

আশরাফুল
৪২৯

আরমিন
৪৩১

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (ডিবিএ)

বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল প্রোগ্রাম ২য় বর্ষ ৪র্থ সেমিস্টার
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

জান্নাতুল
২৬০

সুমাইয়া
২৬১

মিনা
২৬২

মাহা
২৬৩

রুবি
২৬৪

লাকি
২৬৫

চৈতি
২৬৬

সাবিহা
২৬৭

তামান্না
২৬৮

রাইসা
২৭৯

স্বর্ণা
২৭০

ফারহানা
২৭১

আফসানা
২৭২

দিপ্তি
২৭৪

রাত্রি
২৭৬

তানজিনা
২৭৭

মাহফুজা
২৭৮

কান্তা
২৭৯

বিপাশা
২৮০

জাকিয়া
২৮১

শাওন
২৮২

বাপ্পী
২৮৩

শরিফুল
২৮৫

মঈন
২৮৬

ইফতি
২৮৭

রাতুল
২৮৮

ইমরান
২৮৯

নাসির
২৯০

সাইফুল
২৯১

ফাহিম
২৯২

রায়হান
২৯৪

কাউসার
২৯৫

তৌফিক
২৯৬

আসিফ
২৯৭

হাসান
২৯৯

জুয়েল
৩০০

মোঃ নিলয়
৩০২

আতিকুর
৩০৪

তানভীর
৩০৫

আরেফিন
৩০৬

দিগন্ত
৩০৭

ওয়াসিম
৩০৮

সোহেল
৩০৯

তানজিল
৩১০

আরিফ
৩১১

সাজ্জাদ
৩১৩

আবির
৩১৭

শামীম
৩১৯

সালমান
৩২০

রাশেদুল
৩২১

আরিফ
৩২২

জিসান
৩২৩

আব্দুল্লাহ
৩২৪

আমিনুল
৩২৫

জনি
৩২৬

রাফাকাত
৩২৭

লোকমান
৩২৮

ইমরান
৩২৯

মুনিয়া
৩৩০

এশা
৩৩১

আফরিন
৩৩২

রাকা
৩৩৩

সুমি
৩৩৪

সিনথিয়া
৩৩৫

রিদিতা
৩৩৬

বাবলী
৩৩৭

ঢাকা কমার্স কলেজ
DHAKA COMMERCE COLLEGE
স্থাপিত
১৯৮৯ ● ১৩৯৬

অ্যালবাম

ঢাকা কমার্স কলেজ
DHAKA COMMERCE COLLEGE
স্থাপিত ১৯৮৯ ● ১৩৯৬

প্রগতি

২০১৫

সূচি

ক্রমিক নং	বিষয়
১.	পরিচালনা পরিষদ
২.	পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষকমণ্ডলীর মতবিনিময় সভা
৩.	রজত জয়ন্তী ২০১৪
৪.	উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত) এর যোগদান
৫.	উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) এর যোগদান
৬.	একাদশ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ২০১৫
৭.	অনার্স পার্ট-১ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ২০১৫
৮.	শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৫
৯.	বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৫
১০.	পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৪
১১.	পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৫
১২.	ইলিশ ভ্রমণ ২০১৫
১৩.	বার্ষিক ভোজ ২০১৪
১৪.	বার্ষিক ভোজ ২০১৫
১৫.	বার্ষিক ফলাহার ও ইফতার
১৬.	২১শে ফেব্রুয়ারি (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস)
১৭.	স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস
১৮.	১৫ই আগস্ট (জাতীয় শোক দিবস)
১৯.	উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা
২০.	বিভাগীয় কার্যক্রম- ● বাংলা ● ইংরেজি ● ব্যবস্থাপনা ● হিসাববিজ্ঞান ● মার্কেটিং ● ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং ● অর্থনীতি ● পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত ● সমাজবিদ্যা ● সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা ● ব্যবসায় প্রশাসন ● মানববন্ধন ● সাক্ষাৎকার
২১.	ক্লাব কার্যক্রম- ● রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাব ● আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব ● নাট্য ক্লাব ● ডিবেটিং ক্লাব ● রোটার‍্যাক্ট ক্লাব ● কণিকা ● বিএনসিসি ● কারাতি ● ক্রিকেট ● রাগবি ● নৃত্য ক্লাব ● সঙ্গীত ক্লাব ● শিক্ষকদের ভ্রমণ
২২.	শিক্ষকদের অর্জন
২৩.	শিক্ষকদের ভ্রমণ
২৪.	নির্মাণ ও কল্যাণ সংঘ
২৫.	প্রকাশনা

পরিচালনা পরিষদ

পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক এর সভাপতিত্বে চলছে পরিচালনা পরিষদের মিটিং

ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের মিটিং

পরিচালনা পরিষদ

অতিথিদের সাথে আলাপরত অবস্থায় পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

অতিথিদের সাথে পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান

রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামালের সাথে আলাপরত অবস্থায় পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও অতিথিবৃন্দ

রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান, পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও অতিথিবৃন্দ

পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষকমণ্ডলীর মত বিনিময় সভা

মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন পরিচালনা পরিষদের সদস্য প্রফেসর মোঃ আলী আজম

মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন পরিচালনা পরিষদের সদস্য প্রফেসর আবু সালেহ

মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন অভিভাবক প্রতিনিধি জনাব আবু ইয়াহিয়া দুলাল

মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন শিক্ষার্থী উপদেষ্টা প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম

মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন শিক্ষার্থী উপদেষ্টা প্রফেসর মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার

রজত জয়ন্তী ২০১৪

রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে কলেজকে সাজানো হয় বর্ণিল সাজে

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের শুরুতে বর্ণাঢ্য র‍্যালির উদ্বোধন করেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক এবং পাশে আছেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী ও অধ্যক্ষ

বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) ভারপ্রাপ্ত, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক), শিক্ষকবৃন্দ ও অতিথিবৃন্দ

বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

রজত জয়ন্তী ২০১৪

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কলেজ পরিচলনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য জনাব এ.এফ.এম. সরওয়ার কামাল

গুণীজনদের বিশেষ অবদান সম্পর্কে বক্তব্য রাখছেন বিইউবিটির সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর মোঃ আবু সালেহ

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

রজত জয়ন্তী ২০১৪

রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা ও অ্যালবাম 'প্রদীপ্তি'-এর মোড়ক উন্মোচন করছেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল

অনুষ্ঠানে গুণীজনদের সাথে অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রধান অতিথি জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল

অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন অতিথি ও শিক্ষকবৃন্দ

এইচ এস সি পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য শিক্ষার্থীর হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

অনার্স ও মাষ্টার্স পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য শিক্ষার্থীর হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

রজত জয়ন্তী ২০১৪

পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক স্বর্ণপদক ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন

পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা, প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী স্বর্ণপদক ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন

পরিচালনা পরিষদের সদস্য জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল স্বর্ণপদক ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন

পরিচালনা পরিষদের সদস্য প্রফেসর আবু সালেহ স্বর্ণপদক ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন

পরিচালনা পরিষদের সদস্য প্রফেসর মোঃ শামসুল হুদা স্বর্ণপদক ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন

পরিচালনা পরিষদের সদস্য জনাব আহমেদ হোসেন স্বর্ণপদক ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন

পরিচালনা পরিষদের সদস্য প্রফেসর ডাঃ এম.এ. রশীদ স্বর্ণপদক ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন

স্বর্ণপদক প্রাপ্ত কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ও পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দের সাথে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত)

পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সাথে স্বর্ণপদক ও সম্মাননা প্রাপ্ত ১৫ জন শিক্ষক

রজত জয়ন্তী ২০১৪

কণিকা আয়োজিত রক্তদান কর্মসূচি উদ্বোধন করছেন প্রফেসর ডাঃ এম.এ. রশীদ এবং উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও অতিথিবৃন্দ

রক্তদান কর্মসূচির অনুষ্ঠানে পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন প্রফেসর ডাঃ এম.এ. রশীদ, পরিচালনা পরিষদ সদস্য

মঞ্চে কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের (X-DCC) কয়েকজন

নৃত্য পরিবেশিত হচ্ছে

রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ক্লাবের শিক্ষার্থীবৃন্দ গান পরিবেশন করছে

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগকারী দর্শনার্থী

উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত) এর যোগদান উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা

বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

ইংরেজি বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

ব্যবস্থাপনা বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

হিসাববিজ্ঞান বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

মার্কেটিং বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত) এর যোগদান উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা

অর্থনীতি বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

সমাজবিদ্যা বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

উপদেষ্টা, অ্যাকাডেমিকের যোগদান উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা

বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

ইংরেজি বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

ব্যবস্থাপনা বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

হিসাববিজ্ঞান বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

মার্কেটিং বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

উপদেষ্টা, অ্যাকাডেমিকের যোগদান উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা

অর্থনীতি বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

সমাজ বিদ্যা বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

একাদশ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ২০১৫

একাদশ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য প্রদান করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

একাদশ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম

ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তৃতা দিচ্ছেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল

ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য প্রদান করছেন ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছেন জনাব সাদিক মোঃ সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে উপস্থিত শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

অনার্স পার্ট-১ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ২০১৫

অনার্স পার্ট-১ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

বক্তব্য প্রদান করছেন উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম

বক্তব্য প্রদান করছেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক), প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল

বক্তব্য রাখছেন ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম

শিক্ষার্থীদের শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব এস এম আলী আজম

শপথ নিচ্ছে অনার্স পার্ট-১ শ্রেণির শিক্ষার্থীবৃন্দ

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৫

মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো: আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ প্রশাসন প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক মোঃ মোজাহার জামিল ও ক্রীড়া কমিটির আহ্বায়ক ড. মোঃ মিরাজ আলী ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহবায়ক মোঃ সাহজাহান আলী

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৫ এর উদ্বোধন ঘোষণা করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

বক্তব্য প্রদান করছেন উপাধ্যক্ষ প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত), উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক

ক্রীড়া কমিটির আহ্বায়ক এবং সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৫

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ ও উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম

প্রধান অতিথি মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ্‌কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

ছাত্রদের আকর্ষণীয় বস্তা দৌড়

ছাত্রীদের আকর্ষণীয় ভারসাম্য দৌড়

শিক্ষার্থীরা নৃত্য পরিবেশন করছে

লাঠি নৃত্যের একটি দৃশ্য

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৫

শিক্ষকদের দৌড় প্রতিযোগিতা

বিজয় মঞ্চে শিক্ষিকাদের ইভেন্ট বিজয়ী

যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতা উপভোগ করছেন অতিথিবৃন্দ

বিজয়ী শিক্ষার্থীকে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৪

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৪-এ বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি ড. মুনাজ আহমেদ নূর, উপ-উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ও পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক এর কাছ থেকে উপহার নিচ্ছেন সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ, জনাব মোঃ ইব্রাহীম খলিল

পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক এর কাছ থেকে উপহার নিচ্ছেন সহকারী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, বেগম ফারহানা আক্তার সাদিয়া

বিজয়ী প্রতিযোগীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন প্রধান অতিথি

বিজয়ী প্রতিযোগীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন প্রধান অতিথি

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৫

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য, প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য প্রদান করছেন পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিচ্ছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিচ্ছেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম

অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া কমিটির আহ্বায়ক ড. মিরাজ আলী (সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ) বক্তৃতা দিচ্ছেন

সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক মোঃ সাহজাহান আলী (সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ) বক্তৃতা দিচ্ছেন

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৫

প্রধান অতিথির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে একজন বিজয়ী প্রতিযোগী

প্রধান অতিথির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছে একজন বিজয়ী প্রতিযোগী

প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন
প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

প্রধান অতিথির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন জনাব ফরিদা
ইয়াসমিন, প্রভাষক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

নৃত্য পরিবেশন ও নাটকের দৃশ্য

ইলিশ ভ্রমণ ২০১৫

ইলিশ ও বেলুন উড়িয়ে ভ্রমণ উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ ও প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান (জিবি সদস্য), উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) ও শিক্ষকমণ্ডলী

খাবার পর্যবেক্ষণ করছেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত), উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) ও আহবায়ক

মধ্যাহ্ন ভোজে শিক্ষিকাবৃন্দ

খাবার গ্রহণ করছে ছাত্রীরা

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উচ্ছ্বাসিত শিক্ষার্থীবৃন্দ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য

লটারীতে বিজয়ী শিক্ষককে পুরস্কার দিচ্ছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

লটারীতে বিজয়ী ছাত্রকে পুরস্কার দিচ্ছেন প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, সদস্য, পরিচালনা পরিষদ

বার্ষিক ভোজ ২০১৪

বার্ষিক ভোজ ২০১৪ উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন), উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) ও শিক্ষকবৃন্দ

বার্ষিক ভোজে উপস্থিত পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

ছাত্রদের খাবার পর্যবেক্ষণ করছেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত), উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক), আহ্বায়ক ও শিক্ষকবৃন্দ

ছাত্রীদের খাবার পর্যবেক্ষণ করছেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) ও শিক্ষকবৃন্দ

ভোজে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের একাংশ

বার্ষিক ভোজ-২০১৪ অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থী

বার্ষিক ভোজ ২০১৫

বার্ষিক ভোজ ২০১৫ উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

ছাত্রদের খাবার পর্যবেক্ষণ করছেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন), উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক, আহ্বায়ক ও শিক্ষকবৃন্দ

বার্ষিক ভোজে উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

বার্ষিক ভোজে উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

ভোজে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

বার্ষিক ভোজে চলছে রান্নার আয়োজন

বার্ষিক ফলাহার

বার্ষিক ফলাহার উদ্বোধন করছেন পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক এবং উপস্থিত আছেন প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী, পরিচালনা পরিষদের সদস্য, প্রফেসর আবু সালেহ্ এবং অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

ফলাহারে অংশ নিচ্ছেন পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সাথে সদস্যবৃন্দ, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত) এবং উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

ফলাহারে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকবৃন্দ

ইফতার মাহ্‌ফিল

ইফতার মাহ্‌ফিলে দোয়া করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত) ও শিক্ষকবৃন্দ

ইফতার মাহ্‌ফিলে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ

ইফতার মাহ্‌ফিলে অংশগ্রহণকারী শিক্ষিকাবৃন্দ

২১শে ফেব্রুয়ারি: শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত) ও উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বাংলা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

২১শে ফেব্রুয়ারি: শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও
গণিত বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস
ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বিএনসিসি ও কণিকার শিক্ষার্থীরা

বক্তব্য প্রদান করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

২৬ মার্চ: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে সংগীত পরিবেশন করছে সংগীত পরিষদের সদস্যবৃন্দ

মহান বিজয় দিবস ২০১৫

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মেজর জেনারেল (অবঃ) আজিজুর রহমান, বীর উত্তম

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পরিচালনা পরিষদের সদস্য জনাব এ.এফ.এম. সরওয়ার কামাল

শোকাবহ আগষ্ট

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪০তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

বক্তব্য রাখছেন পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

বক্তৃতা রাখছেন পরিচালনা পরিষদের সদস্য জনাব এ. এফ. এম. সরওয়ার কামাল

বক্তৃতা রাখছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

বক্তৃতা রাখছেন বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মোঃ শাজাহান আলী

রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন প্রধান অতিথি

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন অধ্যক্ষ
প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাধ্যক্ষ প্রশাসন
(ভারপ্রাপ্ত), প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন উপদেষ্টা
(অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল

বক্তব্য প্রদান করছেন শিক্ষার্থী উপদেষ্টা ও অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক
প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম

বক্তব্য প্রদান করছেন শিক্ষার্থী উপদেষ্টা
প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী

বক্তব্য প্রদান করছেন শিক্ষার্থী উপদেষ্টা
প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ

বিভাগীয় কার্যক্রম

বাংলা বিভাগ

বিভাগীয় শিক্ষকমণ্ডলী

নতুন শিক্ষক জনাব তাহমীনা তাহেরকে ফুল দিয়ে বরণ করছেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা

নতুন শিক্ষক বেগম এরিনা সুলতানাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা

ইংরেজি বিভাগ

অনার্স পার্ট -১ ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব শামীম আহ্‌সান

ইফতার পার্টিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকবৃন্দ ও প্রাক্তন শিক্ষার্থী

যুক্তরাষ্ট্রের Kent State University-এর গ্রন্থাগারে Travel Through Bangladesh-বইটি উপহার দিচ্ছেন জনাব খায়রুল ইসলাম

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বিভাগের নতুন চেয়ারম্যান জনাব বদিউল আলমকে ফুলেল শুভেচ্ছা

মাস্টার্স শ্রেণির ক্লাশ সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন উপাধ্যক্ষ প্রশাসন প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম

নতুন শিক্ষক যোগদান উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভাগীয় শিক্ষকদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিভাগীয় শিক্ষকমণ্ডলী (০৩.০১.২০১৫)

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

বিভাগের নতুন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখকে ফুলেল শুভেচ্ছা

জনাব তৌহিদুল ইসলামের যুক্তরাষ্ট্রে গমণ উপলক্ষ্যে বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দের আয়োজিত নৈশ ভোজ

জনাব তৌহিদুল ইসলামকে বিভাগের পক্ষ থেকে স্মৃতিস্মারক প্রদান

বিভাগীয় কার্যক্রম

মার্কেটিং বিভাগ

বিদায়ী চেয়ারম্যান জনাব শনজিত সাহাকে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ

বেগম ফারহানা আক্তার সাদিয়া সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ায় বিভাগের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা

অনার্স পার্ট ৩ ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

বিদায়ী চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আকতার হোসেনকে ফুলেল শুভেচ্ছা

শিক্ষা সফরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল, সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

বিভাগীয় কার্যক্রম

অর্থনীতি বিভাগ

বিদায়ী চেয়ারম্যান বেগম সুরাইয়া পারভীনকে বিভাগের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা

অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক জনাব হাফিজা শারমীন পরিচালনা পরিষদের শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ায় বিভাগের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা

অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহর সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ

বিভাগে নতুনভাবে যোগদানকৃত শিক্ষক জনাব হোসাইন শুভ, বেগম নাজমা আক্তার, বেগম সুয়াইবা হক তুরাবী ও জনাব মোঃ তারিকুজ্জামান খান-কে বিভাগের পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা

বিভাগীয় শিক্ষক জনাব মোঃ হোসাইন শুভ-র উচ্চ শিক্ষার্থে আমেরিকা গমণ উপলক্ষ্যে বিভাগ হতে সংবর্ধনা ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয় ৩০শে জুলাই ২০১৫

বিভাগীয় শিক্ষক জনাব মোঃ তারিকুজ্জামান খান এর ক্যাডেট কলেজে গমণ উপলক্ষ্যে বিভাগের পক্ষ হতে বিদায় সংবর্ধনা দেয়া হয়

বিভাগীয় কার্যক্রম

সমাজবিদ্যা বিভাগ

জনাব মাওসুফা ফেরদৌসীর স্বর্ণপদক ও সম্মাননা প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

শিক্ষা সফরে (গাজীপুর) বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে ২৯ আগস্ট ২০১৫ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিবেশ অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বিদায়ী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজরুল ইসলামকে বিভাগীয় ফুলেল শুভেচ্ছা

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অফিস পরিদর্শনকৃত বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

বি এস বি গ্লোবাল নেটওয়ার্কের অফিস পরিদর্শনকৃত বিভাগীয় শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিভাগীয় কার্যক্রম

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন, (ভারপ্রাপ্ত) উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক ও প্রোগ্রাম পরিচালকের সাথে বিবিএর ফাইন্যান্সিয়াল ওয়েভার প্রাপ্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের প্রেজেন্টেশনের একটি মুহূর্ত

মানববন্ধন: প্রতিবাদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা ও ক্লাস সঠিক সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য র‍্যালি

SA টিভিতে সাক্ষাতকার

কলেজ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত SA টিভি ইয়ুথ ভয়েস প্রোগ্রামে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ প্রশাসন, শিক্ষক ও অতিথিবৃন্দ

ক্লাব কার্যক্রম

রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাব

রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাবের নবীণবরণ অনুষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত), শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র আয়োজিত বইপড়া কর্মসূচির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সাথে অতিথিবৃন্দ

আর্টস্ অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব

আর্টস্ অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠান উদ্বোধন করছেন ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বেগম শামা আহমদ-এর সাথে আর্টস্ অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

নাট্য ক্লাব

গাজীপুরে নিস্বর্গ পরবাসী ড্রামা সুটিং

বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মীর মোঃ জহিরুল ইসলাম-এর সাথে নাট্য ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

ক্লাব কার্যক্রম

ডিবেটিং সোসাইটি ক্লাব

জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভিসি'র হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন ঢাকা কমার্স কলেজের বিতর্ক দলের শিক্ষার্থী

কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত আহ্বায়ক বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব আবু নাঈম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব

ফ্রি ডায়বেটিস্ টেস্ট প্রোগ্রামে অধ্যক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ ও রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

বিজয় র‍্যালিতে উপাধ্যক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ ও রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের শিক্ষার্থীবৃন্দ

কণিকা

রক্তদাতা সংবর্ধনা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন ক্রিকেটার জনাব তাসকিন আহমেদ

কণিকার সদস্যবৃন্দ

ক্লাব কার্যক্রম

বিএনসিসি

বিএনসিসি ক্যাডেটবৃন্দ

কারাতি শিক্ষার্থী

নেপাল সফরে কলেজের শরীরচর্চা শিক্ষক
জনাব ফয়েজ আহমদ ও কারাতি দলের শিক্ষার্থী

রাগবি প্রতিযোগী শিক্ষার্থী

রাগবি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীবৃন্দ

কলেজ ক্রিকেট দলের সাফল্য

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড আন্ত: কলেজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ২০১৫, ঢাকা মহানগর চ্যাম্পিয়ন
কলেজের ক্রিকেট দলের সদস্যবৃন্দ, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত) ও শিক্ষকবৃন্দ

ঢাকা কমার্স কলেজের ক্রিকেট দল ও শিক্ষকবৃন্দ

ক্লাব কার্যক্রম

নৃত্য ক্লাব

নৃত্য ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে নৃত্য ক্লাবের সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষক

সংগীত ক্লাব

সংগীত ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

রজত জয়ন্তীতে সংগীত ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের ভ্রমণ

অধ্যক্ষ, শিক্ষক এবং শিক্ষকদের পরিবারের ভারত ভ্রমণ

শিক্ষকদের অর্জন

পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগের প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ স্বর্ণপদক ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন

মার্কেটিং বিভাগের প্রফেসর মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার স্বর্ণপদক ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন

সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর মোঃ আবু তালেব স্বর্ণপদক ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন

অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ ওয়ালী উল্লাহ্ স্বর্ণপদক ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন

সমাজ বিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মাওসুফা ফেরদৌসী স্বর্ণপদক ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন

ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব বদিউল আলম স্বর্ণপদক ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন

বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা স্বর্ণপদক ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন

সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ ইউনুছ হাওলাদার স্বর্ণপদক ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন

শিক্ষকদের অর্জন

ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ নুরুল আলম ভূঁইয়া স্বর্ণপদক ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন

ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব সাদিক মোঃ সেলিম স্বর্ণপদক ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন

বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ হাসানুর রশিদ স্বর্ণপদক ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন

হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম স্বর্ণপদক ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন

পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগের ড. মিরাজ আলী, ব্যবস্থাপনা বিভাগের ড. কাজী ফয়েজ আহমেদ ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের ড. এ এম সওকত ওসমান পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য স্বর্ণপদক ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন

বি ইউ বি টি এর দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এম বি এ পরীক্ষায় উত্তম ফলাফলের জন্য বর্তমান হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি চ্যান্সেলরস্ গোল্ড মেডেল প্রদান করেন

মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন-এর নিকট থেকে দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন

International Leaders in Education Program (ILEP) সমাপন শেষে Washington DC তে সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব খায়রুল ইসলাম

শিক্ষকদের ভ্রমণ

গাজীপুরে কানাইয়ার নিজস্ব বাগানবাড়ীতে কলেজের শিক্ষকদের স্বাগত জানালেন পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক স্যার

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন কলেজের অধ্যক্ষ

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিককে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত)

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক-এর সাথে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত), উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক), শিক্ষক ও অতিথিবৃন্দ

নির্মাণ

কলেজ অডিটোরিয়াম সংলগ্ন মাঠ

অ্যাকাডেমিক ভবন ১ ও অ্যাকাডেমিক ভবন ২

ঢাকা কমার্স কলেজের নতুন সুসজ্জিত ও সুপরিসর নামাজঘর

ঢাকা কমার্স কলেজের অডিটোরিয়াম

ঢাকা কমার্স কলেজ কল্যাণ সংঘ

কল্যাণ সংঘের সাধারণ সভায় সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

কল্যাণ সংঘের সাধারণ সভায় সেক্রেটারী হিসেবে বক্তব্য রাখছেন জনাব এস এম আলী আজম, সহযোগী অধ্যাপক ব্যবস্থাপনা বিভাগ

প্রকাশনা

রজত জয়ন্তী স্মরণিকা ও অ্যালবাম ২০১৪ 'প্রদীপ্তি'-এ মোড়ক উন্মোচন

প্রগতি ২০১৪ এর মোড়ক উন্মোচন করছেন প্রফেসর ড. মুনাজ আহমেদ নূর, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশনা কমিটি ২০১৫

শামীম আহ্সান
সহযোগী অধ্যাপক

দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন
সহযোগী অধ্যাপক

শামা আহমাদ
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ এ. বি. এম. মিজানুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

রেজাউল আহমেদ
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ কায়সার আলী
প্রভাষক

নার্পিস হায়দার
প্রভাষক

মুক্তি রায়
প্রভাষক

মুহাম্মদ আশরাফুল করিম
লাইব্রেরিয়ান

মোঃ নূরুল আলম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

সম্পাদক ও সম্পাদনা সহকারী - প্রগতি ২০১৫

যোসেফ গোমেজ
বিভাগ: ইংরেজি
রোল: ৪১৬

রাসলান
শ্রেণি: একাদশ
রোল: ৩৩২৩৮

আজিজ
বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল
রোল: ৪০৫